আমি কে?

সেই সনাতন প্রশ্নের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উত্তর

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

'আমি কে' এই জিজ্ঞাসা মানুষের চিরন্তন। এটি মানুষের আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। চার পাঁচ দশক আগেও সমাজ বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য যার যার সমাজের দিকে, কালচারের দিকে তাকাতে বলতেন। তাঁদের মতে মানুষের শুরুটা হয় সাদা খাতার মত শূন্য অবস্থায়, পরে বাইরের এই সমাজ, শিক্ষা, কালচার সব কিছু তাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে, সে তাই হয়েছে। আধুনিক ডিএনএ বিজ্ঞান তার অভাবনীয় অগ্রগতি দিয়ে এই ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছে; বিশেষ করে অতি সম্প্রতি মানুষের সম্পূর্ণ ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করতে পারার পর। এখন স্পষ্ট হয়েছে যে আত্মপরিচয়ের অনেকখানিই নির্ভর করছে নিজের ডিএনএ'র ওপর যা আমরা পূর্বসূরীদের বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি বছরের ধারাবাহিকতায় বাবা-মা থেকে জন্মলগ্নেই পেয়ে যাই। আমার চিন্তা-চেতনা-আচরণের মৌলিক ভিত্তিটি ঠিক করে দিচ্ছে মস্তিষ্কের মাধ্যমে এই ডিএনএ। সেই সঙ্গে আমার সুস্থতা, ব্যক্তিত্ব, কালচার, আবেগ ইত্যাদির বিশেষ প্রবণতার মধ্যেও ডিএনএ'র হস্তক্ষেপ বেশ স্পষ্ট। তার ওপর শৈশব-পরিবেশের ও নিজের জীবন-যাপন ভঙ্গির যেটুকু প্রভাবে ওই প্রবণতাগুলো বাড়েকমে তাও ঘটে ওগুলোর সঙ্গে বিক্রিয়ায় ডিএনএ'র প্রকাশে তারতম্যের জন্য। তাই সাদা খাতার শূন্যতা নিয়ে নয় বরং ভরা বইয়ের ভিত্তি নিয়েই আমার শুরু। শিক্ষা, চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে সেগুলোকে বিকশিত করেই আমি পূর্ণাঙ্গতা পাই।

এখন দেখছি প্রত্যেক মানুষের ডিএনএ একান্তই তার নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও গড়পড়তায় মানুষে মানুষে ডিএনএ'র তফাৎ খুবই নগণ্য– সেটি ভিন্ মহাদেশের ভিন্ গোষ্ঠির দুই মানুষের মধ্যে হলেও। তাই যে স্বাভাবিক সক্ষমতা নিয়ে প্রত্যেকের জন্ম তা দুনিয়ার সব মানুষের মধ্যে গড়পড়তায় প্রায় একই রকম। আবার ডিএনএ'র সাদৃশ্য দেখলে পুরো জীবজগতের সঙ্গেও মানুষের ঐক্য অবাক হবার মত। ডিএনএ'র নিরবিচ্ছিন্নতা আমাকে নিজের সীমাবদ্ধ অস্থিত্ব ও কালচারকে ছাড়িয়ে স্থানে ও কালে বিশাল বিস্তৃতি দিয়েছে– দীর্ঘ বিবর্তন-ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে; তেমনি ব্যতিক্রমী মননশীলতার মাধ্যমে কিছু অনন্য ক্ষমতাও দিয়েছে। এই সবের সমন্বয়ে প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীন আত্মপরিচয় পেতে আধুনিকতম বিজ্ঞান যে অবিশ্বাস্য রকম সহায়তা দিচ্ছে সে কাহিনী নিয়েই এই বই।

আমি কে?

সেই সনাতন প্রশ্নের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক উত্তর

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

স্কুল জীবন থেকে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু বুরহান সিদ্দিকী ও মনজুরুল ইসলামকে–

সেই তখন থেকে বুরহান তার গলার অসামান্য সুর দিয়ে আর মনজু তার অসামান্য বন্ধু-বাৎসল্য দিয়ে আমাদের সদা সঙ্গে থাকাকে মধুর করে রেখেছে। অথচ বাইরের জগতে অধিকাংশের কাছে বুরহান ছিল জাঁদরেল আমলা আর মন্‌জু জাঁদরেল শৈল্য চিকিৎসক।

ভূমিকা

'আমি কে' এই জিজ্ঞাসা মানুষের চিরন্তন। এটি প্রত্যেক মানুষের আত্ম-পরিচয়ের প্রশ্ন। যুগে যুগে দার্শনিকরা নিজ নিজ ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেক মানুষও হয়তো নিজের মত করে এর এক রকম একটি উত্তর গড়ে নেন। তবে কারো জন্যই প্রশ্নটি সহজ নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এসে এ নিয়ে তত্ত্ব দিয়েছেন প্রধানত সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা। অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানীরা এর উত্তরের জন্য তাকাতে বলতেন যার যার সমাজের দিকে, কাল্চারের দিকে। এর কারণ তাঁরা মনে করতেন মানুষের শুরুটি হয় একটি পরিস্কার স্লেট বা সাদা খাতার মত শূন্য অবস্থায়; পরে বাইরের শিক্ষা, সমাজ, কালচার ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে এই সাদা খাতার ওপর লিখে লিখে আজকের 'আমি'কে তৈরি করেছে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীরাও দেখতে চাইতেন বাইরের নানা উত্তেজনায় এক এক জন কী ভাবে সাড়া দিচ্ছে, আচরণ করছে, সেখান থেকেই মিলবে তার আত্ম-পরিচয়। তাঁদের কাছেও মন জিনিসটা ছিল সাদা খাতার মতই একটি নিরপেক্ষ জিনিস যাকে ইচ্ছেমত গড়া যায়। তাঁরা ভাবতেন মনের কাজের কলকব্জা মস্তিষ্কের মধ্যে আছে বটে, তবে মন নিজে মস্তিষ্কের সঙ্গে আটকে নেই। সে স্বাধীন-ইচ্ছায় চলে, দেহের বাধ্যবাধকতায় থাকেনা। কাজেই এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই 'আমি কে' এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমাকে শুধু বাইরের দিকে তাকাতে হবে। সমাজ-শিক্ষা-পরিবেশ আমাকে যে ভাবে প্রভাবিত করেছে আমি তাই।

কিন্তু গত পাঁচ-ছয় দশকের মধ্যে এই ধারণাগুলোর আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞান– সেটি প্রধানত করেছে জীববিজ্ঞানের আধুনিকতম শাখা যাকে চলতি কথায় বলতে পারি ডিএনএ বিজ্ঞান। এক সময় জীববিজ্ঞানের পক্ষে প্রাণীর দেহ সম্পর্কে গবেষণা করাটাই অতীব সাহসিকতার কাজ ছিল–

কারণ প্রাণ জিনিসটি ধরা-ছোঁয়ার বাইরের বিষয় বলে তাকে বিজ্ঞানের অগম্য মনে করা হতো। সেদিন বহু আগেই গত হয়েছে। বিজ্ঞানের সামনে এ নিয়ে শেষ দুর্ভেদ্য দুর্গটি ছিল মানুষের মন এবং আচরণ। প্রধানত ডিএনএ বিজ্ঞানের এবং মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের অকল্পনীয় অগ্রগতির ফলে এটিও আর দুর্ভেদ্য থাকেনি। বিশেষ করে অতি সম্প্রতি মানুষের সম্পূর্ণ ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করতে পারার পর এখন স্পষ্ট হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষের আত্ম-পরিচয়ের অনেকখানিই নির্ভর করছে নিজের ডিএনএ'র ওপর যা আমরা পূর্বসূরিদের বিবর্তনের মাধ্যমে কোটি বছরের ধারাবাহিকতায় বাবা-মা থেকে জন্ম লগ্নেই পেয়ে যাই। শুধু আমার দৈহিক গড়ন নয়, আমার চিন্তা-চেতনা-আচরণের মৌলিক ভিত্তিটি তৈরি করে দিচ্ছে এই ডিএনএ। সেই সঙ্গে আমার সুস্থতা, ব্যক্তিত্ব, আবেগ, কালচার ইত্যাদির বিশেষ প্রবণতাগুলোর মধ্যেও ডিএনএ'র হস্তক্ষেপ বেশ স্পষ্ট। এদিক থেকে মানুষ মাত্রই জন্মলগ্নেই সাদা খাতার মত শূন্য হবার পরিবর্তে বরং ওই সব কিছুর ডিএনএ বার্তা দিয়ে একটি ভরা বইয়ের মতই পূর্ণতায় থাকে।

ডিএনএ নিজের বার্তাগুলোর দ্বারা চিন্তা-চেতনা-আবেগের মত মানসিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে প্রত্যেকের মস্তিষ্ক গড়ার মাধ্যমে। ওই মস্তিষ্কের কাজের মধ্যেই রয়েছে আমার মন অর্থাৎ 'আমি'– এর বাইরে কোথাও নয়। কাজেই আধুনিকতম বিজ্ঞান অনুযায়ী আত্ম-পরিচয়ের জন্য শুধু বাইরের দিকে তাকানো নয়, বরং তাকাতে হবে নিজের দিকে বিবর্তনের সৃষ্ট এই ডিএনএ-সমগ্রের মধ্যে, এবং মস্তিষ্কের কাজের মধ্যে। মস্তিষ্ক কাজ করে কম্পিউটারের মত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিতে– আর সেই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক প্রোগ্রামটিই দেয়া আছে জন্মগতভাবে পাওয়া সেই ডিএনএ'র মধ্যে। তথ্য বাইরে থেকে আসতে পারে, কিন্তু চিন্তার ও আচরণের মৌলিক প্রক্রিয়া ওই প্রোগ্রামের মধ্যেই রয়েছে।

ডিএনএ'র বার্তাগুলোর কতখানি প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হবে তার আবার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে– ওই ডিএনএ'র মধ্যেই। পরিবেশের যে সব বিষয় আচরণ, সুস্থতা, ব্যক্তিত্ব, কালচার ইত্যাদিতে প্রত্যেকের জন্মগত প্রবণতাগুলো বাড়াকমাকে প্রভাবিত করে, তাও কাজ করে ডিএনএ'র ওই

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। ওই পরিবেশের মধ্যে সব চেয়ে বেশি নেতিবাচক গুরুত্ব পায় মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় মায়ের ওপর ব্যতিক্রমী দৈহিক ও মানসিক চাপ, শৈশবে একটি সময় পর্যন্ত নিজের ওপর পারিবেশিক চাপ, এবং কিছুটা পরবর্তীতে নিজের ভুল জীবনযাপন অভ্যাস। ডিএনএ'তে থাকা প্রবণতাগুলোর ভিত্তিভূমির সঙ্গে পরিবেশের ভাল-মন্দের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ধরনটির উদ্ঘাটন আধুনিকতম বিজ্ঞানের সব চেয়ে দুর্দান্ত সাফল্যগুলোর অন্যতম। এটিই অনেকটা বলে দিচ্ছে আমার ডিএনএ রচিত ভিত্তিভূমিতে যে সব সহজাত ক্ষমতা ও প্রবণতা নিয়ে আমার শুরু, পরে শিক্ষা, চর্চা ইত্যাদি তাকে কীভাবে বিকশিত করার মাধ্যমে আমাকে একটি পূর্ণাঙ্গ 'আমিতে' পরিণত করে।

সমগ্র মানব ডিএনএ'র পাঠোদ্ধারের পর ওই ভরা বইটি এখন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক একটি খোলা বইও বটে। এর মাধ্যমে এখন দেখছি প্রত্যেক মানুষের ডিএনএ একান্তই তার নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও গড়পড়তা মানুষে মানুষে ডিএনএ'র তফাৎ খুব নগণ্য। একই গোষ্ঠির গড়পড়তা দু'জনের মধ্যে ডিএনএ পার্থক্য যতটুকু, ভিন্ন জাতিসত্ত্বা ভিন্ন গোষ্ঠির দু'জনের মধ্যেও পার্থক্য তার চেয়ে বেশি নয়। এটি প্রমাণ করেছে বাহ্যিক নানা বিবেচনায় মানুষে মানুষে যে জাতিগত বিভাজনগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে তা মৌলিকও নয়, নায্যও নয়। আবার ডিএনএ'র সাদৃশ্য দেখলে পুরো জীবজগতের সঙ্গেও মানুষের ঐক্য অবাক হবার মত। ডিএনএ'র নিরবিচ্ছিন্নতা আমাকে নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব ও কালচারকে ছাড়িয়ে স্থানে ও কালে বিশাল বিস্তৃতি দিয়েছে– দীর্ঘ বিবর্তন-ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে। সেই ডিএনএই আবার মানবধারার মস্তিষ্কে মননশীলতার অনন্য ক্ষমতা দিয়ে প্রত্যেককে নিজের সহজাত আচার আচরণকে পরিশীলিত করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

কয়েক দশকের অল্প সময়ের মধ্যে এই সব দুর্দান্ত আবিষ্কার আত্ম-পরিচয়ের যে বৈজ্ঞানিক দ্বার খুলে দিয়েছে, তাকে নিয়েই আমাদের এই বই। এই যে উন্মোচন তা যে চমকপ্রদ ফলাফলকে তুলে ধরেছে, বইটিকে শুধু তার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং কী রকম গবেষণা, কী রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে তারও কিছু স্বাদ পাঠককে দেয়ার

চেষ্টা করা হয়েছে। পুরো কাহিনীতে একটি যৌক্তিক ধারাবাহিকতা যেন খুঁজে পাওয়া যায় সে জন্য এতে দুটি দিকের ওপর সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একদিকে আত্ম-পরিচয়ের সনাতন প্রশ্নটির উত্তর পেতে আধুনিকতম বিজ্ঞান কীভাবে সহায়তা দিচ্ছে মোটা দাগে তা তুলে ধরা হয়েছে। আবার অন্য দিকে বিবর্তন ও ডিএনএ'র একেবারে অ আ ক খ থেকে শুরু করে আমার ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার আমার নিজেকেও কীভাবে অনেকাংশ প্রকাশিত করেছে তার খুঁটিনাটির কিছু সরল বয়ান এতে রয়েছে। আশা করেছি কৌতুহলী অনেকে নিজেদের উন্মোচনের এই বিস্তারিত প্রক্রিয়াটিকে উপভোগ করবেন।

যে কোন বিজ্ঞান এক লাফে আরাধ্য রহস্যটিকে উদ্ঘাটন করতে পারেনা, তাকে শুরুতে খুব সরল উপাদান নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে এক একটি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করে করেই জটিলতার দিকে এগোতে হয়। মানুষের আত্ম-পরিচয়ের মত জটিল বিষয়ের পেছনে অত্যন্ত জটিল সত্যগুলো খুঁজে পাওয়ার আগে বিজ্ঞানীদেরকে খুবই ধৈর্যশীল সাধনার সঙ্গে মটরশুঁটির কুঁচকানো বীজের বা ফলের মাছির চোখের রঙের মত যেসব সরল বিষয়ের ব্যাখ্যা করেই এগোতে হয়েছে– সেই চমৎকার ধারাবাহিকতা অনুসরণ না করলে এই উদ্ঘাটনের আসল মজাটাই পাওয়া যাবেনা। সেই দিকটার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কাজেই শুধু বিজ্ঞানের স্বাদ নয়, বিজ্ঞানীর সাধনার স্বাদও এতে অল্প বিস্তর পাওয়া যাবে বলে আশা রাখি।

আজকের অগ্রগতিগুলো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা প্রত্যেকে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন-রহস্য নিজের সমগ্র-ডিএনএর তথ্য হিসেবে স্মার্ট কার্ডের মত সঙ্গে রাখবো, এবং আমাদের দৈহিক-মানসিক কল্যাণে সে তথ্য ম্যাজিকের মত ব্যবহার করা হবে। সেই সম্ভাবনার পথে এ মুহূর্তে আমরা কোন্ জায়গায় আছি তার কিছু ধারণা দেয়ার ভবিষ্যৎমুখী প্রয়াসটিও এই বইয়ে রাখার চেষ্টা করেছি।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ফেব্রুয়ারী ২০১৮

সূচি

১. সাদা খাতা নই, ভরা বই - ১০

২. আষাঢ়ে গল্প, গবেষণা, অবশেষে ডিএনএ - ৩৮

৩. বিবর্তন ও ডিএনএ'র সহজ পাঠ - ৬৬

৪. বিবর্তন গড়েছে মস্তিষ্ক - ১০৭

৫. বিস্তারকামী জিন - ১৩৬

৬. লক্ষ বছর ধরে সেই ভয়, সেই সুখ - ১৬৯

৭. ঘর কৈঁলু বাহির বাহির কৈঁলু ঘর -১৯৮

৮. কালচারঃ বিবর্তনের বিলম্বিত রাগ - ২৩০

৯. আমার ডিএনএ এখন খোলা বই - ২৬৪

সাদা খাতা নই, ভরা বই

বাইরের দিকে তাকিয়েই কি নিজেকে বুঝতে হবে?

মাত্র কয়েক দশক আগেও সমাজবিজ্ঞানীরা আর মনোবিজ্ঞানীরা যে ধারণাটিকে মৌলিক মনে করতেন, যা এখনো কেউ কেউ মনে করেন, তা হলো মানুষ সাদা খাতার মতো আসে, নিজের বৈশিষ্ট বলতে কিছু না নিয়েই। সে মত অনুযায়ী 'আমি' আসলে বাইরের সব হস্তক্ষেপের ফল– সমাজের ও কালচারের। অবশ্য তাঁরা যে শব্দটা ব্যবহার করেন সেটি হলো ল্যাটিন ভাষায় 'ট্যাবুলা রাসা' যার মানে 'পরিস্কার স্লেট'; তাকেই এখানে সাদা খাতা বলছি। ওই 'আমি'র মধ্যে গোড়াতে কোন লেখাজোকা, দাগ কাটা ইত্যাদি কিছুই থাকেনা বলেই ওটা পরিস্কার স্লেট। পরে বাইরের পরিবেশ, কালচার, শিক্ষা ইত্যাদিই নানা ছাপ ফেলে একে ভরিয়ে তোলে। তাঁদের মতে 'আমি কে' এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে ওই বাইরের দিকেই তাকাতে হবে – কারণ সমাজই আমাকে গড়ে তোলে।

যদিও এটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালেই খুব বেশি ব্যবহৃত হয়েছে, সাদা খাতার ধারণাটি কিন্তু বেশ পুরানো। সতরো শতকের ইংরেজ দার্শনিক লক এর প্রবক্তা। তিনি মনে করতেন এমনিতে নিজ থেকে মানুষের কোন চরিত্র নেই, কোন প্রবণতা নেই, কোন আইডিয়া নেই। যুক্তি, জ্ঞান ইত্যাদি সব কিছু পরে আসে বাইরের দুনিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে। লক অবশ্য একে সে আমলে একটি প্রগতিবাদী দর্শন হিসেবে খাড়া করতে চেয়েছিলেন। রাজা ও অভিজাতরা তখন দাবী করতেন তাঁরা জন্মগত ভাবেই উচ্চতর সক্ষমতার অধিকারী, তাই স্বয়ংক্রিয় ভাবে অন্য সবার শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের হকদার। অন্যদিকে তাঁরা এমনও দাবী করতেন যে রাজভক্তি সব মানুষ জন্মগত ভাবেই নিয়ে আসে, কাজেই তাদের কাছ থেকে সেটি এমনিতেই আশা করা হবে। এমন দাবী শোষণের হাতিয়ার, প্রতিক্রিয়াশীলদের অস্ত্র। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে লক সাদা খাতার দর্শনটি সঙ্গত মনে করেছেন। কারণ খাতা যদি সাদা

হয় তাতে রাজশক্তিও নেই রাজভক্তিও নেই– ওসব পরে চাপিয়ে দেয়া জিনিস। তবে মুশকিল হলো শক্তিশালী দার্শনিক মতবাদগুলো তাদের নিজের সময়ের গন্ডি ছাড়িয়ে যায় এবং পরে শত শত বছর ধরে অন্যরা নানা ভাবে একে অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহার করে– এমনকি পরস্পর বিপরীতমুখী কার্যক্রমেও। লকের সাদা খাতার ধারণার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা সাদা খাতাকেই স্বতসিদ্ধ ধরে নিয়েছেন। তাঁদের মতে মানুষের স্বভাবের প্রায় সব কিছু সমাজেরই সৃষ্টি, সমাজ তা তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে দিয়েছে। যেই কালচারে সে বড় হচ্ছে সেটি তার সব ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে দিচ্ছে, আবার এর মাধ্যমে সেও সেই কালচারটিকে জোরদার করার কাজে হাত লাগাচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন কালচার মানুষটিকে ভাষা দিচ্ছে, তার কল্পলোক সৃষ্টি করছে, তার পক্ষে কী করণীয়, কী অনুকরণীয়, কী বর্জনীয় সব কিছু সৃষ্টি করে দিচ্ছে।

আবেগের প্রাবল্য, আত্মীয়তার টান, যৌন সম্পর্কের আকর্ষণ-বিকর্ষণ এগুলোকেও এই মতানুসারীরা মানুষটির মধ্যে দেখেননা, বরং এসবকেও কালচারের সৃষ্ট চাপিয়ে দেয়া জিনিস মনে করেন– যেগুলোকে নানা কালচার নানা ভাবে 'উদ্ভাবন' করেছে। এ মতের সপক্ষে তাঁরা দেখিয়ে দেন কোন কালচারে মানুষ যুদ্ধবিগ্রহে ভীষণ নিষ্ঠুর, আবার অন্য কালচারে মানুষ একেবারেই শান্তিপ্রিয়– সেখানে নিষ্ঠুরতা বলে কিছু নেই। কোন কালচারে স্ত্রী-পুরুষের সমান ক্ষমতা, কোনটাতে পুরুষরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, কোনটাতে আবার স্ত্রীরাই তা করে। কোন কালচারে প্রেমাচার নিয়ে কোন ঈর্ষা নেই বা বিরোধ নেই, আবার কোন কালচারে এসব নিয়ে খুনখারাবি নিত্য ব্যাপার। এই পর্যবেক্ষণগুলো কতখানি নির্ভুল তার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেবার চেষ্টা বড় একটা হয়নি।

একই ভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মনোবিজ্ঞানে যে মতবাদের জোয়ার গিয়েছে তাতে মনকে বিচার করা হয় আচরণ দিয়ে (বিহেভিয়রিজম) – শুধু আচরণকেই দেখা যায় ও মাপা যায় এই যুক্তিতে। এই আচরণ আসে

বাইরের সব ট্রেনিং আর কন্ডিশনিং থেকে, মনের মধ্যে মজ্জাগত কিছু থেকে নয়। এই বিহেভিয়রিজম বা আচরণবাদের সঙ্গে সাদা খাতার সম্পর্ক তাই সোনায় সোহাগা। আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে শুধু বাইরের পরিবেশ। পুরো ব্যাপারটিই পর্যবেশিত হয় পরিবেশ কী ভাবে মনকে উত্তেজিত করে, আর মন কী ভাবে তাতে সাড়া দেয় সেটি দেখা। তাঁরা মনে করেন একটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন আর একটি অভিজ্ঞতা মিলিয়ে শিক্ষা লাভ হয়। এক সঙ্গে একাধিক উত্তেজনা দেয়া হলে দুটি উত্তেজনার সম্মিলিত ফলেই সাড়া মেলে। পরে একটি উত্তেজনা প্রত্যাহার করা হলেও কন্ডিশন্‌ড হয়ে যাওয়ায় শুধু বাকিটিতেই আগের মত সাড়া মেলে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী পাভলভ এক পরীক্ষায় কুকুরকে খাবার দেখানো এবং ঘন্টা ধ্বনি করা এই দুই উত্তেজনা এক সঙ্গে দিয়েছেন। প্রত্যেকবার কুকুরের জিহ্বায় লালা এসেছে খাবার খেতে। দেখা গেছে খাবারের সঙ্গে ঘন্টা ধ্বনির উপস্থিতি নিয়ে কন্ডিশন্‌ড হয়ে যাওয়ার ফলে খাবার না দিয়ে শুধু ঘন্টা ধ্বনি করলেই লালা আসে। এই বিখ্যাত নীতিকে মানুষের শিক্ষা দান প্রক্রিয়া সহ আরো নানা জিনিসের ব্যাখ্যায় ব্যবহার করা হয়েছে।

এই মনোবিজ্ঞানের মধ্যে জীববিজ্ঞানের কোন স্থান নেই। রক্তমাংসের মানুষটির, জন্মসূত্রে তার জেনেটিক পরিচয়ের, এমনকি তার মস্তিষ্কের কাজের কোন গুরুত্ব এতে নেই। কারণ তাকাতে হবে শুধু বাইরের উত্তেজনার দিকে আর তাতে সাড়ার দিকে। এটি বুঝতে গিয়ে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা নির্ভর করতেন ল্যাবোরেটরিতে ইঁদুর, কবুতর ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষায়। এগুলোকে খাবারের পুরস্কার অথবা বিদ্যুৎ শকের তিরস্কার দিয়ে নানা কাজ করতে শিক্ষা দিয়ে সেখান থেকেই মানুষের আচরণেরও নানা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতো। মানুষ কেন ইঁদুরের চেয়ে শিক্ষা লাভে বেশি সক্ষম এ প্রশ্নে মনোবিজ্ঞানীদের কারো কারো উত্তর ছিল উত্তেজনা নেবার ও সাড়া দেবার যে ‘চিন্তার আয়না’ রয়েছে, মানুষের ক্ষেত্রে তা অনেক বড় বলে– অর্থাৎ তার সাদা খাতাটি বড় বলে। আর তা ছাড়া ইঁদুরের কালচার নেই, মানুষের আছে। মানুষের দেহের সম্পূর্ণ বাইরে থাকা রক্তমাংসের ‘আমি’ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন এই যে কালচার তা মানুষের সাদা খাতায় অনেক কিছু

‘লিখতে’ সক্ষম। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এভাবে ‘লিখতে পারার’ শক্তির ওপর এত বেশি আস্থাবান ছিলেন যে তাঁরা দাবী করতেন– যে কোন শিশুকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে তাঁরা সে বিষয়ের প্রতিভায় পরিণত করতে পারবেন। তাঁদের মতে কোন প্রবল কালচারের পক্ষে সে সমাজের যে কোন মানুষকে সেই কালচারের ছাঁচে ফেলে প্রয়োজনমত গড়ে নেয়া সম্ভব।

মজার ব্যাপার হলো সাদা খাতার ধারণাকে অনেক সময় একেবারেই পরস্পর-বিরোধী নানা রাজনৈতিক মতবাদের স্বার্থেও ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ উনিশ শতকের উদারনৈতিক রাজনীতির প্রবক্তা উইলিয়াম গডউইন আশা করতেন শিশুরা যেহেতু সাদা খাতার মত তাদেরকে আমরা উদার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আবার বিশ শতকে মাও সে তুং গণ বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজকে একেবারে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর মতে একে ভেঙ্গে ফেলে পূর্ব ধারণা ভুলিয়ে দিয়ে আবার সাদা খাতায় পরিণত করতে হবে। তিনি বলতেন ‘সব চেয়ে সুন্দর কবিতাগুলো সাদা খাতার ওপর লেখা হয়েছে।’

নিষ্পাপ আদিম কোথাও নেই

বিশ শতকের প্রথমার্ধে, এবং তারও আগে আর একটি ধারণা নৃ-বিজ্ঞানে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল, এখনো বেশ শক্তিশালী আছে যার মূল প্রভাব প্রায় সাদা খাতার মতই। এর বক্তব্য হলো অতীতে মানুষ যে আদিম অবস্থায় ছিল, এবং এখনো বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু মানব সমাজ যারা আদিম অবস্থাতেই আছে তাদের স্বভাব একেবারে নিষ্পাপ, সাদা মনের। তাদেরকে তাই নৃতত্ত্ববিদরা বলেছিল ‘মহান আদিম’ (নোবল স্যাভেজ), আমরা এখানে আরো স্পষ্ট বোঝার জন্য বলছি- ‘নিষ্পাপ আদিম’। বাইরের ‘সভ্যতার’ ছোঁয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারলে আমাদের সবাই ওরকম নিষ্পাপ আদিম হতে পারি। কী অর্থে তারা নিষ্পাপ বা মহান? সেটি হলো তারা স্বার্থপরতাহীন, সম্পূর্ণ শান্তিপ্রিয়; নিষ্ঠুরতা, দুশ্চিন্তা, লোভ লালসা, ঈর্ষা, বিনষ্টির বা দূষণের প্রবণতা এগুলো তাদের মধ্যে নেই; এসব থেকে দূরে থেকে তারা প্রকৃতির সন্তান। এই ধারণারও একটি দীর্ঘতর ইতিহাস আছে।

সতরো শতকে ইউরোপীয় অভিযাত্রীরা এবং ঔপনিবেশিকরা যখন আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং পরে অষ্ট্রেলিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলোতে সেখানকার নানা আদিবাসী গোষ্ঠির সংস্পর্শে আসতে শুরু করেছিলো তখন থেকেই এই ধারণার সূত্রপাত। অভিযাত্রীরা ওই আদিবাসীদের সঙ্গে অল্পদিনের দেখাদেখিতে ভাসা ভাসা যে সব বর্ণনা দিয়েছিলো তার ভিত্তিতে রুশোর মত শক্তিশালী কিছু দার্শনিক লেখকের মনে হয়েছে যে এই আদিম অবস্থাতে মানুষ মহান থাকে। পরবর্তীকালে আরো ভাল করে জানার পর প্রায় ক্ষেত্রেই ঔপনেবেশিকদের কাছে এ ভুল ভেঙ্গে গিয়েছিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিষ্পাপ মহান আদিমের ওই রোমান্টিক ধারণাটি দার্শনিকরা ত্যাগ করেননি, বরং যুগে যুগে তা নানা দিক থেকে নানা মতবাদ প্রচারে ব্যবহৃত হয়েছে সাদা খাতার মতই। বিশ শতকের বিখ্যাত কিছু নৃ-বিজ্ঞানীও কোন কোন আদিম সমাজ নিয়ে তাঁদের বর্ণনায় উৎসাহের আতিশয্যে এরকম নিষ্পাপ হবার কথা তুলে ধরেছেন যা তাঁদের লেখার গুণে বেশ জনপ্রিয়তাও পেয়েছে। অথচ পরে দীর্ঘতর ও বিস্তারিত গবেষণায় দেখা গেছে যে আসলে প্রকৃত অবস্থা সেরকম নয়। আমরা পরে এর কিছু কিছু দেখবো। সাদা খাতার সঙ্গে নিষ্পাপ আদিমের ধারণার মিল হচ্ছে এখানেও ধরে নেয়া হয়েছে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের সাদা মন, শুধু বাইরের জটিলতর কালচারের ছাপেই তার ওপর 'পাপের' দাগ লাগে।

নিষ্পাপ আদিমের ধারণা যে পরে নানা রকম প্রভাব রেখেছে তার একটি উদাহরণ হলো পরিবেশবাদীদের একাংশ। উনবিংশ শতক থেকেই পরিবেশবাদীদের অনেকে এই নিষ্পাপ আদিমকে তাঁদের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। তারা মনে করেছেন পরিবেশকে রক্ষা করার সর্বোত্তম পথ হলো যথাসম্ভব ওই আদিমের মতই প্রকৃতির সন্তান হয়ে যাওয়া, জীবন থেকে আধুনিকতাকে, শিল্পজাত বাহুল্যগুলোকে বর্জন করা। সেটার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষতিকর প্রবণতার অবসান হবে। কেউ কেউ নিজের জীবনে তা অনুসরণ করার চেষ্টাও করেছেন। এ জন্যই ও সময়ের আমেরিকান লেখক ও পরিবেশবাদী চিন্তাবিদ হেনরি ডেভিড থ্যুরো ওয়ালডেন হ্রদের পাড়ে বনে ঘেরা জায়গায় একেবারে একা শুধু খাওয়া পরার এবং আপন মনে প্রকৃতিকে

পর্যবেক্ষণ করার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো মেটাবার মত করে একটানা দু'বছর কাটিয়েছিলেন। পরে এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'ওয়ালডেন' বইটি রচনা করেন। শুধু তখন কেন আজো কি পরিবেশ রক্ষায় ব্রতী অনেকের মনে এই নিষ্পাপ আদিমের আদর্শটি জেগে থাকে না? কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা হলো এই নিষ্পাপ আদিমের অস্থিত্ব আসলে কোথাও নেই, কখনো ছিলনা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও আদিমের রোমান্টিসিজমে আপ্লুত হয়ে অথবা কোন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখনো বিশ্বখ্যাত গণমাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিক ভাবে জানা সব তথ্যের বাইরে গিয়ে আমেরিকার আদিবাসীদের সম্বন্ধে লেখা হয়ঃ 'আদিবাসীরা অত্যন্ত সুখেশান্তিতে ছিল, তাদের মধ্যে কোন অপরাধ প্রবণতা ছিলনা, নিজেদের নানা গোষ্ঠির মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধবিগ্রহ যা হতো তা ছিল নেহাত লোক দেখানো- তাতে নিষ্ঠুরতা থাকতোনা। তাদের জীবন ছিল বেশ স্থিতিশীল, তাতে অনিশ্চয়তার কোন জায়গা ছিলনা। তারা আশপাশের প্রকৃতিকে সম্মান করতো, অকারণে কিছু নষ্ট করতোনা, দূষণ সৃষ্টির কথা ভাবতেও পারতো না'। মানুষের অতীত থেকে বর্তমানের মজ্জাগত আচরণের মধ্যে যে অদ্ভুত ধারাবাহিকতা আছে তা এরকম লেখকরা আমলে নেন্‌না।

এ কোন্‌ অশরীরী আমি

আরো একটি পুরানো দার্শনিক তত্ত্ব সাদা খাতার ধারণাকে চালু রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা পরোক্ষ ভাবে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। সেটি হলো নিউটনের প্রায় সম সাময়িক দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ রেনে দেকাতের শরীর থেকে মনকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে দেখা। ওই দর্শন থেকেই মনে করে আসা হয়েছে যে আমাদের যে দেহ-ঘড়ি তা শুধু শরীরকে চালু রাখে, মনকে নয়। অদ্ভুত একটি মায়াবী মন দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে তার ভেতর ঘাপটি মেরে বসে বসে থাকে। এটি এক অশরীরী আত্মার মত। কিন্তু এটিই হলো সেই 'আমি' যার মধ্যে আমি আত্ম-অনুসন্ধান করি। অথচ একে কোন জৈব বা যান্ত্রিক বর্ণনায় ধরা যাবেনা, তাই তার হদিশ ওভাবে পাওয়াও

যাবেনা। এও সেই সাদা খাতার মত, যেখানে নিজস্ব কিছু খুঁজে পাওয়া যায়না শুধু বাইরের কালচার সেখানে রেখাপাত করলে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আধুনিক যুগে এসেও ওই অশরীরী মায়াবী মন সাদা খাতার মতই কখনো কখনো দারুণ প্রভাব রাখছে। আর রাখবেই না বা কেন খাতা যখন সাদা তখন মন সেখান থেকে নিজের অবয়ব গড়ার কিছু না পেয়ে মায়াবীর মত আচরণ করবে এটিই তো স্বাভাবিক।

এই মায়াবী মনের ভরসাতেই বিশ শতকের সমাজবিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিতে পেরেছিলেন যে 'আমরা সমাজকে যতখানি শুদ্ধ করতে চাই, ঠিক ততখানি করতে পারবো, সমাজের যে চরিত্র পরিবর্তন করতে চাই তাই পরিবর্তন করতে সক্ষম হবো'। এই ঘোষণার পেছনে ভরসাটি হলো যেই 'আমরা'র' কথা এখানে বলা হচ্ছে সেটি রক্তমাংসের কোন আমরা নয়, এটি হলো মায়াবী মনের 'স্বাধীন ইচ্ছার' আমরা। রক্তমাংসের আমরা'কে জীববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাগুলোর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। এখানে যে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির কথা বলা হচ্ছে তার অবস্থান শরীরের মধ্যে নয়– বরং মায়াবী মনের মধ্যে, যাকে বিজ্ঞানের অনুশাসন মানতে হয়না। এ অনেকটা বিশ শতকের মনোবিজ্ঞানীদের যে কোন শিশুকে শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভায় পরিণত করার দাবীর মত। এখানেও জীববিজ্ঞানের ইতোমধ্যে জানা সব জ্ঞানকে অগ্রাহ্য করার মনোভাবটিই স্পষ্ট।

বিশ শতকের শেষার্ধে এসে জীববিজ্ঞানের প্রবল অগ্রগতি যদি সাদা খাতা, নিষ্পাপ আদিম অথবা মায়াবী মনের এই ধারণাগুলোকে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানেও অচল দেখিয়ে দিতে না পারতো, তাহলে আত্ম-অনুসন্ধানের 'আমি' থেকে রক্ত মাংসের 'আমিটি' বাদই থেকে যেতো। আমরা এখনো হয়তো মায়াবী মনের এবং বাইরে থেকে তাকে নিয়ন্ত্রণের সব মায়াবী প্রজেক্টের আলোচনায় থেকে যেতাম।

সাদা খাতার মত ধারণাগুলো কেন ভুল

বিজ্ঞান যেখানে পথ দেখাবার কথা, বিজ্ঞান না থাকলে ভুল ব্যাখ্যাই তার জায়গা নেয়। মানুষের অনুভূতি, আচার আচরণ সহ তার চিন্তা প্রক্রিয়া কেমন

করে ঘটে তার ব্যাখ্যায় তখনো বিজ্ঞান তেমন কার্যকর হতে পারেনি বলেই সাদা খাতা, নিষ্পাপ আদিম, এবং মায়াবী মনের মত ধারণাগুলো বিশ শতকের প্রথমার্ধেও এত বড় ভূমিকায় চলে আসতে পেরেছিলো। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিজ্ঞান এক্ষেত্রেও দ্রুত সাফল্য লাভ করায় এর পর এসব ধারণা টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরকম বড় পটপরিবর্তন বিজ্ঞানের ইতিহাসে আগেও বহুবার ঘটেছে। হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানকে মাঝে মাঝে এক একটি সীমায় আটকে থাকতে হয়েছে দীর্ঘকাল, তারপর হঠাৎ সে সীমা অতিক্রম সম্ভব হয়েছে। সর্বশেষ যেটি অতিক্রান্ত হলো সেটি হলো মনোজগতে প্রবেশের বাধা।

সেই ব্যাবিলনের আমল থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক তথ্য বিজ্ঞানীদের জানা ছিল। কিন্তু প্লেটোর মত প্রভাবশালী দার্শনিক-বিজ্ঞানী প্রবর্তিত আইডিয়ালিজম সঠিক তথ্যকে সঠিক তত্ত্বে আসতে বাধ সেধেছে। তাঁর মতানুযায়ী নিখুঁত স্বর্গীয় জ্যেতিষ্ক ধরে নেবার প্রয়োজনে এবং এরিষ্টোটলের ভুল পদার্থবিদ্যার প্রতি বিশ্বস্থ থাকতে গিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দেড় হাজার বছর ধরে পথ হারানো ছিল। পৃথিবী-কেন্দ্রিক এক অতি জটিল তত্ত্বে তারা আটকা পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তারপর কোপারনিকাসের সাহসী পদক্ষেপ আর গ্যালিলিও ও নিউটনের পদার্থবিদ্যা এসে অতিদ্রুত পুরো বিশ্বকে ঘড়ির কলকব্জার মতই সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাযোগ্য করো তুলেছিলো। কিন্তু আলকেমির তুকতাকের সঙ্গে পুরাপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করতে না পারায় এমন সাবলীল ব্যাখ্যায় যেতে রসায়নের আরো কিছুদিন সময় লেগেছে, কিন্তু পরে তাও সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে। জীববিজ্ঞানের অগ্রগতি আটকে ছিল জীবিত জিনিসের জন্য অলৌকিক ‘জৈব শক্তি’ অপরিহার্য বলে ধারণা করার কারণে। এই জৈব শক্তিকে বিজ্ঞানের সক্ষমতার বাইরে বলে মনে করা হয়েছে দীর্ঘদিন। কিন্তু সাহসী বিজ্ঞানীরা এ অলৌকিকতা অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত অগ্রসর রসায়নের সূক্ষ্ম কারুকার্যের নিরিখেই জীবের ব্যাখ্যাকে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। এরকম প্রত্যেকটি বাধা অতিক্রম করতে প্রচুর সময় লেগেছে, যুগে যুগে বিজ্ঞানীদের অনেক সাধনা ও সাহস প্রয়োজন হয়েছে। মনোজগতটিই বিজ্ঞানের জন্য সর্বশেষ দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল, স্বাভাবিক কারণেই। এখন গত

৫০-৬০ বছরে জীববিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য অগ্রগতির ফলে সে দুর্গেরও পতন হয়েছে।

এখন তাই 'আমি কে' এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়ে সেই আমাকে সাদা খাতার রূপ নিতে হয়না, এখন বিজ্ঞান দেখিয়ে দিয়েছে সে বরং একটি 'ভরা বই'। গোড়া থেকেই আত্ম-পরিচয়ের প্রচুর জিনিস তার মধ্যে লেখা শুধু নেই, তা সক্রিয়ও রয়েছে। আসলে প্রশ্নটির অনেকখানি উত্তর ওখানেই খুঁজতে হবে– আপন শরীরের কোষে কোষে থাকা ডিএনএতে এবং আপন মস্তিষ্কের ভাঁজে ভাঁজে। আর এই 'ভরা বইয়ের' কোন কিছু সাতে পাঁচে না থাকা নিরপেক্ষ নয়, নিষ্পাপ আদিমের ধারণার মত সাদামাটাও নয়। বরং বংশানুক্রমে আসা লক্ষ লক্ষ বছরের মানব বিবর্তনের ফলগুলো ওখানে স্পষ্টভাবে আছে। মূলধারায় সবার ক্ষেত্রে এই ফলগুলো এক হলেও, বিস্তারিততে গিয়ে এক এক জনের স্বভাব ও প্রবণতা ওখানে অন্যদের থেকে ভিন্ন ভাবে এসেছে– একেবারে লেখাজোকা হয়ে। কী ভাবে কিসের ভাষায় তা আগে থেকে লেখাজোকা হয়ে এসেছে এই বইয়ে আমরা তা কিছু কিছু দেখবো। যা লেখাজোকা আছে তার প্রকাশে কেন মাঝে মাঝে ভিন্ন ফল হয়, সেখানে যার যার পরিবেশের কী ভূমিকা, তাও এখানে দেখবো।

নানা দিক থেকে নিজেকে বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুরাহা হয়ে গেছে গত কয়েক দশকে; আর তা হয়েছে জীববিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে। এটি বিভিন্ন দিক থেকে হয়েছে যার মধ্যে প্রধান কয়েকটি আমরা এখানে আলোচনা করবো। এগুলো হলো চিন্তার কম্পিউটেশন তত্ত্ব, নিউরোসায়েন্স বা মস্তিষ্ক-বিদ্যা, এবং বিবর্তন ভিত্তিক মনোবিজ্ঞান যার মূল নিয়ামক হলো ডিএনএ। শেষের বিষয়টিকে তো আমরা এই বইয়ের প্রধান অংশ হিসেবে গ্রহণ করে বেশ কিছুটা বিস্তারিত ভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। 'আমি কে' এ প্রশ্নটির উত্তর দিতে আগে আমরা বড়জোর একটি দার্শনিক বিতর্ক তুলতে পারতাম অথবা বাইরের সমাজের প্রভাব থেকে তা আঁচ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন একেবারে আমার মস্তিষ্ক ও ডিএনএ'র মধ্যে খাস করে আমার ভাবগতিক বোঝার রাস্তা খুলে গেছে; বাইরের পরিবেশের সঙ্গে এগুলো কেমন করে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করবে তাও। এগুলো শুধু-আমার রোগ-শোকে

চিকিৎসার প্রয়োজনীয় জ্ঞান নয়; বরং আমার উপলব্ধি, আমার আকাঙ্খা, আমার বিশ্ব-দৃষ্টির মৌলিক উৎস আজ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রোগ্রামগুলো আমার মধ্যেই আছে

যেই কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা কম্পিউটার তৈরি করেছেন, মানুষের চিন্তাকেও তাঁরা সেই একই কার্যপ্রণালীর অনুসারী বলে মনে করছেন। চিন্তার বা মনোজগতের যে তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে তা এই কম্পিউটেশন তত্ত্ব। যে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মত এটি ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষিত ও গৃহীত একটি তত্ত্ব। যে কম্পিউটার চ্যাম্পিয়ান দাবা খেলোয়াড় মানুষের সঙ্গে দাবা খেলতে পারে এবং প্রায়শ জিততেও পারে, সেই মানুষের চিন্তার প্রণালী আর কম্পিউটারের যুক্তি বিস্তারের প্রণালীর মধ্যে মিল থাকাটাই তো স্বাভাবিক। অবশ্য কম্পিউটারের কাজ আর মানুষের চিন্তার ও উপলব্ধির মধ্যে অনেক তফাত। সব চেয়ে বড় তফাত হলো এখনো মানুষের ‘চেতনার’ মতো কোন জিনিস কম্পিউটারে সৃষ্টি করা যায়নি। যদিও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করছেন এমন অনেকে ভবিষ্যতে কার্যত এই ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, আমরা আপাতত সনাতন কম্পিউটার নিয়েই কথা বলছি। তাই কতটা সচেতন ভাবে কম্পিউটার দাবা খেলছে সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিন্তু তাতে ফলাফলে কোন ব্যতিক্রম হবেনা– কারণ পর্দায় ঢাকা থাকলে কোন্ খেলোয়াড়টি মানুষ আর কোন খেলোয়াড়টি কম্পিউটার সেটি কেউ বুঝতেও পারেনা। আরো অনেক তফাত কম্পিউটারের ও মানুষের মধ্যে রয়েছে যেমন কম্পিউটারের স্মৃতি কখনো নষ্ট হয়না, বদলে যায়না; কিন্তু মানুষের তা হয়। এসব সত্ত্বেও উভয়ের কাজের মধ্যে প্রক্রিয়াগত সাদৃশ্যটি কিন্তু খুব মৌলিক। আর তার ভিত্তিতেই এখন আমরা বুঝতে পারছি মানুষের চিন্তার সত্যিকার কার্যক্রমগুলো, একেই বলা হয় চিন্তার কম্পিউটেশন তত্ত্ব।

কম্পিউটার কী ভাবে কাজ করে তা বোঝার জন্য আমাদের সুপরিচিত ডিজিট্যাল কম্পিউটার অর্থাৎ ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ইত্যাদি হওয়ার প্রয়োজন নেই। তার থেকে অনেক সহজ সাদামাটা জিনিসও কম্পিউটার হতে পারে

যদিও সেটি আমার ল্যাপটপটির মত দেখতে হবে না এবং তার মত সর্ব কাজের বিশারদও হবেনা, শুধু কিছু সুনির্দিষ্ট কাজ করতে পারবে। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা বরং এমনি একটি কাল্পনিক সাদামাটা কম্পিউটারকে উদাহরণ হিসেবে বেছে নেব। যে রকম কম্পিউটারই হোক সেটি কিন্তু কাজ করবে একই নিয়মে যাকে বলা হয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ। এতে সে বাইরে থেকে কিছু তথ্য গ্রহণ করে (ইনপুট), তা যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে, এবং ফলাফলটি প্রকাশ করে (আউটপুট)। বিজ্ঞান দেখিয়েছে মানুষের চিন্তাও আসলে একই রকমের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মাত্র।

এখন আমরা সেই সাদামাটা কাল্পনিক কম্পিউটারের উদাহরণটি দিয়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করবো। এই কম্পিউটারকে তৈরি করা হয়েছে আপাতত একটি কাজ করার জন্য– একটি পুরানো গাছের কত বছর বয়স হবার পর একটি কমবয়সী গাছের জন্ম হয়েছিলো সেটি নির্ণয় করা। এটি বের করা হবে গাছ দুটির গুড়ির কর্তিত অংশে দেখা যাওয়া রিংগুলো গুনে গুনে, যা কম্পিউটারটি করবে। যে কোন গাছের প্রতি এক বছর বয়সে এ রকম একটি রিং সৃষ্টি হয়; গুড়ির অন্য অংশের রঙের থেকে রিং এর রঙটি একটু বেশি গাঢ় হয়। যান্ত্রিক ভাবে এমন একটি ব্যবস্থা করা হলো যে একটি আলোক-সংবেদী ফটো-টিউব গুড়ির ওপর দিয়ে নিজকে বুলিয়ে নিতে পারে। প্রত্যেকটি রিঙের ওপর আসা মাত্র গাঢ় রঙের কারণে ফটো-টিউবটি একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল দেবে যার ফলে ১,২,৩ করে গণনা করার মত একটি কাউন্টার এক ঘর এগিয়ে যাবে। অপেক্ষাকৃত পুরোনো বড় গুড়িটাতেই আগে এ কাজ শুরু হবে গুড়ির মাঝখান থেকে। প্রত্যেক রিঙে এক ঘর করে এগিয়ে গিয়ে কিনারার শেষ রিঙে গিয়ে এই গুড়িতে ফটো-টিউবের কাজ শেষ হবে। এরপর কমবয়সী গুড়িটির ওপর ফটো-টিউব বুলিয়ে যাওয়ার কাজ শুরু হবে। কিন্তু তার আগে কাউন্টারটির সুইচ স্বয়ংক্রিয়ভাবে উল্‌টে যাবে যাতে এবার একটি রিঙে এক ঘর এগিয়ে যাওয়ার বদলে কাউন্টার বরং এক ঘর পিছিয়ে যাবে। ফটো-টিউবটি কমবয়সী গুড়িটির মাঝখান থেকে কিনারার দিকে নিজকে বুলিয়ে নিতে থাকে আর প্রত্যেক রিং আসার সঙ্গে সঙ্গে এর বৈদ্যুতিক সিগন্যাল কাউন্টারকে একঘর

পিছিয়ে দিয়ে গোনা সংখ্যাকে কমাতে থাকবে। শেষ রিংটি চলে আসার পর সব কাজ শেষ হয়ে গেল। এবার কাউন্টারটি পড়ে নিলেই আমরা জানতে পারবো আমাদের প্রশ্নের উত্তর। ধরা যাক বড় গুড়িটিতে ৬০টি রিং আছে আর ছোটটিতে আছে ২০টি রিং। তা হলে প্রথম গুড়ির কাজ শেষ হলে কাউন্টারটি এগিয়ে গিয়ে সংখ্যা ৬০ এ গিয়ে ঠেকবে। এরপর কম্পিউটারের সুইচ উল্‌টে দেয়াতে ছোট গুড়ির প্রত্যেক রিংয়ে কাউন্টারটি পিছিয়ে যেতে যেতে মোট ২০ ঘর পিছিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে থাকবে ৪০। এর মানে কম্পিউটারটি তাকে দেয়া কাজের ফলাফল দিয়ে দিলো – বড় গাছের চল্লিশ বছর বয়সে ছোট গাছটির জন্ম হয়েছিলো।

পুরো কাজটিতে ইনপুট তথ্য হলো ফটো-টিউবে পাওয়া রিঙের গাঢ় রঙের কারণে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল। বাকি সব কাজ এই তথ্যের প্রক্রিয়া করণ– ফটো-টিউব একের পর এক গুড়ির ওপর বুলানো, কাউন্টারের সুইচ উল্‌টানো, কাউন্টার এক ঘর করে করে এগুনো ও পরে পেছানো– এই সব। আউটপুটটি হলো কাউন্টারের সর্বশেষ অবস্থান। একের পর এক এই কাজগুলো করার জন্য কম্পিউটার নির্মাতা এর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যে ব্যবস্থা করেছেন তার তালিকাটি হলো কম্পিউটারকে দেয়া এই কাজের ‘প্রোগ্রাম’। এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী একের পর এক কাজ হতে থাকে। সব কম্পিউটারেই এক একটি সম্পূর্ণ কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রোগ্রাম তার মধ্যে দিয়ে দিতে হয়, সেই প্রোগ্রাম মত যেন কাজ হয় সেই ব্যবস্থাও থাকতে হয়।

এখন যদি ওই একই প্রশ্নের উত্তর বের করার দায়িত্বটি কম্পিউটারকে না দিয়ে একজন মানুষকে দেয়া হয় সে কী করবে? সে প্রথম গুড়ির রিংগুলো একে একে দেখে গুনে ফেলবে। দেখার সময় রিং থেকে যে আলো তার চোখে যাবে, চোখের আলোক-সংবেদী রেটিনায় স্নায়ু সিগন্যালে পরিণত হবে, এবং অবশেষে মস্তিষ্কের পেছনে ‘দর্শন’ অঞ্চলে তা অনুভূত হবে– সেটিই ‘ইনপুট’ তথ্য। এবার সেই তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হবে প্রথমে বড় গাছটির গুড়ির রিংগুলো গুনে এবং তারপর কমবয়সী গাছের রিংগুলো গুনে এবং প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করে। প্রত্যেকটি কাজ মস্তিষ্কের নানা উপযুক্ত অংশে হবে। সব শেষে সে ফলাফলটি জানবে– মুখে বলে জানাবে

অথবা লিখেও জানাতে পারে। সেটিই আউটপুট– যা মুখে বল্‌লে মস্তিষ্কের বাচন অংশ ব্যবহৃত হবে, আর লিখে জানালে হাতের ও আঙ্গুলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মস্তিষ্কের মোটর অংশ ব্যবহৃত হবে। কম্পিউটারের কাজ আর মানুষের চিন্তা করার কাজ এই দুইয়ের প্রক্রিয়াগত ভাবে কি কোন তফাত দেখা গেলো? মোটেই না। এজন্যই চিন্তাকে কম্পিউটেশন তত্ত্বের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের উদাহরণে কম্পিউটারকে কাজের প্রোগ্রামটি দিয়ে দিয়েছিল মানুষ কম্পিউটার নির্মাতা। কিছুটা প্রোগ্রাম হয়তো কম্পিউটারটির ব্যবহারকারী মানুষ নিজেও দিতে পারে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে প্রোগ্রামটি কোথা থেকে আসলো ? এর প্রোগ্রামের মৌলিক অংশগুলো তার মস্তিষ্কেই আছে, জন্মগত ভাবে। এ সব এসেছে বিবর্তনের ফলে বংশানুক্রমে ডিএনএ'র মাধ্যমে। ডিএনএ মানুষটির মস্তিষ্ক সে ভাবেই তৈরি করেছে ওই মৌলিক কাজগুলোর উপযুক্ত করে। তারপর নানা বিশেষ উদ্দেশ্যে সেই মৌলিক প্রোগ্রামগুলো কোন্ অংশের পর কোন্ অংশ হবে তা মস্তিষ্ক নিজেই সাজিয়ে নিতে পারে। এই সাজিয়ে নেয়ার সক্ষমতাও ডিএনএ এনে দিয়েছে মস্তিষ্কে। ওই যে গোনার আর বিয়োগ করার কথা বল্‌লাম তাও কী জন্ম থেকে রয়ে গেছে মস্তিষ্কে? হ্যাঁ, ঠিক তাই, এরও মৌলিক ক্ষমতাটা জন্ম থেকেই দেয়া আছে। অবশ্য পরে সেই ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটাতে হয়েছে চর্চার মাধ্যমে।

একটি ছোট্ট পরীক্ষা করলে নিজেই বুঝতে পারবো অংকের মৌলিক ক্ষমতাটি জন্মগত ভাবে শিশুর মস্তিষ্কে রয়েছে। ছয় মাসের বাচ্চা যে এখনো দুনিয়ার কিছুই শেখেনি তার সামনে কিছু কাজ করতে চাই। এমন শিশুরও চোখ দেখলে বোঝা যায় কখন সে গতানুগতিক জিনিস দেখে একঘেঁয়েমি বোধ করছে, আবার কখন কিছুতে অবাক হয়ে সচকিত হচ্ছে। তার সামনে তাকে দেখিয়ে একই রকম দুটি বড় বড় পুতুল রাখি। তারপর সামনেই একটি পর্দার আড়ালে একটি একটি করে পুতুল দুটি সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটি তুলে ফেলি। সে ওখানে দুটি পুতুল দেখবে। যেহেতু এটিই স্বাভাবিক তাই তার চোখে একঘেয়েমির ভাব থাকবে। যদি পর্দা তুল্‌লে সে দুটির বদলে একটি পুতুল

দেখে গোপনে একটি সরিয়ে ফেলার কারণে, তাহলে তার চোখে অবাক হবার চিহ্ন থাকবে। স্পষ্টত সেও গুনতে পারে, অন্তত দু'তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে– একে একে যে দুই হয় তা সে জানে, না শেখা সত্ত্বেও। এ তার মজ্জাগত।

এই মৌলিক গাণিতিক ক্ষমতা আছে বলেই সে পরে বড় হয়ে জটিলতর অংক শিখতে পারে। এতো প্রোগ্রাম, এতো রকম চিন্তার কাজের রসদ জন্ম থেকে যার মাথায় রয়েছে সে সাদা খাতা হয় কী ভাবে? সে তো রীতিমত ভরা বই। পরে দেখবো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এই ভরা বইয়ে বৈচিত্র আছে– মূল সক্ষমতাগুলো সবার থাকলেও প্রত্যেকের বই একই গীত গায়না।

যে শুরু থেকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের উপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে, তাকে আর যাই হোক সাদা খাতা বলা যায়না, কারণ সাদা খাতা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে পারেনা। ওই যে বলা হতো বাইরের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কালচার ইত্যাদি ধীরে ধীরে সাদা খাতাকে ভরাবে, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে না পারলে ওই শেখা জিনিস বা অভিজ্ঞতার জিনিসগুলোকে ওখানে সাজিয়ে রাখাই সম্ভব নয়। প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থাটি না থাকায় সাদা খাতা ওসবের মধ্যে কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাবেনা, একটির সঙ্গে আরেকটি মিলিয়ে পরবর্তী কিছুই করতে পারবেনা। তাই প্রোগ্রামের মৌলিক অংশগুলো আগে থেকেই সেখানে থাকতে হবে। ডিএনএ যখন বিবর্তনের মাধ্যমে এসে আমাদের মস্তিষ্কে স্নায়ুবর্তনীগুলো গড়ে, তখন তার বয়ে আনা প্রাচীন প্রোগ্রামগুলো প্রক্রিয়াকরণের সক্ষমতাগুলো ওখানে তৈরি করে দেয়। ভাষা মানুষের সবচেয়ে মানবিক বৈশিষ্টগুলোর একটি। ভাষার উদাহরণ নিলে বুঝবো প্রত্যেক 'আমি' কতটা ভরা বই। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকের দিকে ভাষাবিদ নোয়াম চোমস্কি মানুষের ভাষার ক্ষেত্রে একটি সর্বজনীন ব্যাকরণের তত্ত্ব দিয়েছেন, যা ক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে দেখা যায় ভাষার ব্যাকরণটি কীভাবে জন্মগত ভাবেই মস্তিষ্কের স্নায়ুবর্তনীতে গাঁথা আছে– আর তা সব ভাষার জন্য একই ব্যাকরণ। ভাষার ক্ষেত্রে ওটাই মৌলিক প্রোগ্রাম।

ভাষা মানুষের হাজারটি রয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন ব্যাকরণ একটিই। একটি বাক্যের উদাহরণ নিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। যে বাক্যটি আমরা

বাংলায় বলি 'আমি ভাত খাই', সেটিই ইংরেজীতে বলে 'আমি খাই ভাত'। সাজানোর তফাত রয়েছে বটে কিন্তু একেবারে পৃথক এই দুটি ভাষাতেই কর্তা (আমি), ক্রিয়া (খাই) কর্ম (ভাত) ইত্যাদি রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এগুলো শুধু এই দুই ভাষাতেই নয় দুনিয়ার সব ভাষাতেই রয়েছে। ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগে এ ভাবে কর্তা, ক্রিয়া, কর্ম নির্ভরশীলতা না থাকলেও চলতো, এর আরো বহু বিকল্প হতে পারতো– বিভিন্ন কালচারে সে সব বিকল্পের বিভিন্নটি ব্যবহৃত হতে পারতো। কিন্তু কর্তা, ক্রিয়া, কর্মে গড়া ব্যাকরণটি বিবর্তনে টিকে গেছে বলেই সেটি সর্বজনীন রয়েছে। আমি, ভাত, খাওয়া ইত্যাদি বোঝাতে এক এক কালচারে এক এক ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনি ব্যবহার করছি বটে, কোনটি আগে কোনটি পরে যাবে তাও বিভিন্ন ভাষায় আলাদা হতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাকরণের মৌলিক নিয়মটি এক থাকতে হয়েছে। যে শিশুর একেবারে প্রথম মুখ ফুটছে, ভাষার কিছুই যাকে শেখানো হয়নি সেও একেবারে কাছের মানুষের মুখে দু'একটি ধ্বনির সঙ্গে দু'একটি ভাবের মিল লক্ষ্য করে বলে 'মা জুতা'। পরিস্থিতি থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যে তার মনের ভেতর আছে এবং সে চায় তার মা (কর্তা) তাকে জুতা (কর্ম), পরিয়ে দিক (ক্রিয়া)। ওই ব্যাকরণ তার প্রোগ্রামের অংশ, তার ইতোমধ্যে ভরা বইয়ের অংশ।

শুরু থেকেই মাথার মধ্যে সেই ব্যাকরণ না থাকলে ভাষার পরবর্তী ধাপগুলো সে আয়ত্ব করতে পারতোনা– যেমন নিজের পরিবেশে যে ভাষা শুনছে সেই ভাষার শব্দ ভান্ডার ধীরে ধীরে শেখা, এবং শোনার মাধ্যমে সেই ভাষার বিশেষ ভঙ্গি লক্ষ্য করে ক্রিয়া কর্ম কর্তাকে আগে পিছে করে সাজানো ইত্যাদি। একটি তোতা পাখি এবং দেড় বছরের একটি শিশুর সামনে কোন কথা বল্‌লে তোতাটি সেই কথা থেকে কিছু শেখে, শিশুটিও শেখে। কিন্তু দু'জনের শেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত রয়েছে। শিশুটি কথার ধ্বনিগুলো থেকে শব্দকে, সেগুলোর অর্থকে, তাদের যোজনের নিয়মকে, নিংড়ে বের করে আনতে পারে, তোতাটি তা পারেনা– শুধু ধ্বনি অনুকরণ করতে পারে মাত্র। শিশু ওই নিংড়ে আনতে পারছে কারণ তার মস্তিষ্কের

মধ্যে আগে থেকেই সে কাজের জন্য একটি প্রোগ্রাম রয়েছে। মানুষের বিবর্তন তার মাথায় ওই প্রোগ্রাম এনে দিয়েছে, তোতার বিবর্তন তা দেয়নি।

একই ভাবে শৈশব থেকে শুরু করে যে কালচারের মধ্যে মানুষটি আছে ভাষা ছাড়াও তার অন্যান্য নানা অংশও সেই মানুষটি আত্মস্থ করে তার খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট নিংড়ে এনে– একেবারে চিন্তাহীন অনুকরণে নয়। এর জন্যও ওরকম প্রোগ্রাম আগে থেকে থাকতে হয় যাও বিবর্তন আর ডিএনএ'র সৃষ্টি। কাজেই বাইরের কালচার শিশুটির সাদা খাতার ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আর তাতেই মানুষটি ওই কালচারের অংশ হয়ে পড়ছে এ কথা ঠিক নয়। এই পুরো ব্যাপারটিও মস্তিষ্কে কম্পিউটেশন তত্ত্বের প্রক্রিয়াতেই ঘটছে, ওখানে এই সব কার্য প্রণালীর ব্যবস্থা রয়েছে বলেই ঘটছে, প্রোগ্রাম সহ।

মস্তিষ্ক শুধু কন্ট্রোল প্যানেল নয়, নিজেই পাইলট

চিন্তার যাবতীয় কাজ যেখানে ঘটতে দেখলাম সেই মস্তিষ্ক কিন্তু একেবারেই শরীরের অংশ, অশরীরী কিছু নয়। নিউরোসায়েন্স বা মস্তিষ্কবিদ্যার যে চরম অগ্রগতি গত চার পাঁচ দশকে হয়েছে তাতে আরো ভাল ভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে আমাদের চিন্তা, সুখ-দু:খ, আবেগ সব কিছুর কার্যপ্রণালীর ব্যাখ্যা মস্তিষ্কের গঠন ও তার স্নায়ুবর্তনীর কাজের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। চিন্তার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক যে আছে সেটি অবশ্য কোন নতুন আবিষ্কার নয়, প্রাচীন কাল থেকেই অনেকেই সে সম্পর্কের কথা বলেছেন। গত শতাধিক বছর ধরে নিউরোসায়েন্সে একের পর এক দুর্দান্ত সব বিষয় উদ্ঘাটিত হয়েছে– আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় লব্ধ বোধ, ভাষার অনুধাবন আর বাচন, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি, আবেগ ইত্যাদি এক একটির সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন্ অংশের কী রকম সম্পর্ক ইত্যাদি। কিন্তু তারপরও ওই সক্ষমতাগুলো যে মস্তিষ্কের কাজেরই নামান্তর সে কথা স্বীকার করতে নারাজ ছিলেন মূলধারার মনোবিজ্ঞানীরা এবং আরো অনেকে। এর কারণ নিহিত সেই অশরীরী মায়াবী মনের ধারণার মধ্যে। গত দশকগুলোতে নিউরোসায়েন্স এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে সেই ধারণা বজায় রাখা আর সম্ভব হচ্ছেনা।

আগে ওই নারাজদের ভাবখানা ছিল অনেকটা এরকম– হ্যাঁ চিন্তার মধ্যে মস্তিষ্কের একটি ভূমিকা আছে সেটি ঠিক, তবে সেই ভূমিকা হলো চালকের সামনের কন্ট্রোল প্যানেলের ভূমিকা, চালকের ভূমিকা নয়। যেমন বিমানের পাইলটের সামনে একটি কন্ট্রোল প্যানেল থাকে যার মধ্যে নানা রকম মিটার, সুইচ ইত্যাদি থাকে। মিটারগুলো বায়ুচাপ, বায়ুবেগ, অবস্থান ইত্যাদি নানা খবর দেয় আর সুইচগুলো দিয়ে আভ্যন্তরীন নানা কিছু নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়া এখানে থাকা ষ্টিককে সামনে, পেছনে, পাশে নাড়াচাড়া করে বিমানের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু তাঁদের মতে এই কন্ট্রোল প্যানেল যেমন পাইলট নয় মস্তিষ্কও চিন্তার চালক নয়। তা হলে চালকটা কে? অবশ্যই ওই মায়াবী মন, একেবারেই অশরীরী, মোটেই মস্তিষ্কের অংশ নয়। এটি মানলে বলতে হয় ওই মায়াবী জিনিসটিই 'আমি'। কিন্তু এখন সর্বাধুনিক নিউরোসায়েন্স প্রমাণ করে দিচ্ছে 'আমিটাও' আসলে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুবর্তনীগুলোই। এরাই কন্ট্রোল প্যানেল, এরাই চালক। এখানে মায়াবী কিছু নেই– সবই মৌলিক পর্যায়ে নিউরোসায়েন্সের ব্যাখ্যার আওতায়। এর সিংহভাগই হচ্ছে বিবর্তনে সৃষ্ট সেই ভরা বইয়ের অংশ। তাই বিবর্তনের সামান্য বৈচিত্রের কারণে জন্ম থেকেই নানা প্রবণতায়, নানা সক্ষমতায় নানা জনের মধ্যে প্রভেদ থাকে। তবে এ প্রভেদ এক কালচারভুক্ত গোষ্ঠির (জাতির) সঙ্গে অন্য কালচারভুক্ত গোষ্ঠির মধ্যে সংখ্যাতাত্ত্বিক গড়পড়তায় যতটুকু থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশি থাকে একই গোষ্ঠির নানা জনের মধ্যে, এমন কি কখনো একই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে।

মস্তিষ্কের মধ্যে এসব সক্ষমতা ও প্রবণতাগুলোকে চিহ্নিত করার মত দুরূহ কাজটি নিউরোসায়েন্স করলো কী ভাবে? গত শতাধিক বছর ধরে নানা কৌশলে এক এক করে তারা বিজ্ঞানের এই দুর্গম জায়গা উদ্ঘাটন করছে। অন্য প্রাণীর মস্তিষ্কে বা স্নায়ুতন্তুতে কাটাচেরা করে, ইলেকট্রোড বসিয়ে, মাপজোক করে তাঁরা অনেক কিছু বুঝতে পেরেছেন। ওসব প্রাণীর অনেকগুলোর স্নায়ু খুব সরল ও স্থূল হওয়ার কারণে কাজগুলো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে এবং এর থেকেই মানুষের মস্তিষ্কে অনুরূপ ঘটনাগুলোর প্রাথমিক আলামত পাওয়া গেছে। বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে ও স্মৃতির

ব্যবহার করে কেমন করে মস্তিষ্ক শিক্ষণকে সম্ভব করে, অথবা দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির ঠাঁইটি মস্তিষ্কে ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, এসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্ঘাটন এভাবেই ঘটেছে। অতি সরল প্রাণীর ওপর পরীক্ষা থেকে এগুলো প্রথম আঁচ করা গেছে।

মানুষের অসুখের ফলে বা দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে চিন্তা ও অনুধাবন ক্ষমতার ওপর তার প্রভাবগুলোও গবেষণাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। মস্তিষ্কের যে সুনির্দিষ্ট অংশ দৃষ্টির বোধ জন্মায়, যে অংশ ভাষার অনুধাবন সৃষ্টি করে, যে অংশ ভাষার বাচন নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি এভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলো এসেছে সাম্প্রতিক কালে মস্তিষ্কের কয়েকটি ইমেজিং পদ্ধতির মাধ্যমে। এতে পদার্থবিদ্যার আর কম্পিউটার বিজ্ঞানের সৃষ্টি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে চিন্তার সময় মস্তিষ্কের ভেতর কী ঘটে চলেছে, কী ধরনের চিন্তা চলছে মস্তিষ্কের বাইরে থেকেই ছবির মত তার হদিশ পাওয়া যায়। মূলত এগুলো আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ নির্ণয়ে নিত্য ব্যবহৃত ক্যাট স্ক্যান, এম আর আই, পি ই টি ইত্যাদিরই অনুরূপ। কী ভাবছি, কোন উত্তেজনায় কীভাবে সাড়া দিচ্ছি, কী আবেগে কখন আপ্লুত– কখন সুখানুভূতিতে, কখন বিষণ্নতায় ইত্যাদি সবই এতে বোঝা যায়। কী ঘটনা পরম্পরায়ে কোথায় স্নায়ু কী ধরনের প্যাটার্নে আতশবাজির মত জ্বলে ওঠছে তার স্পষ্ট ছবি থেকে মস্তিষ্কের কর্ম প্রণালীর বিভিন্ন পরীক্ষিত তত্ত্ব খাড়া করাও সম্ভব হয়েছে।

যে আবেগগুলোকে আমরা মানুষের একেবারে অন্তরের অন্তস্থলের রহস্যময় বিষয় মনে করতাম তাও এখন মস্তিষ্কের স্নায়ু থেকে স্নায়ুতে সংযোগ স্থলে নিউরোট্রান্সমিটার নামের কিছু রাসায়নিক পদার্থের কারসাজি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন এদের মধ্যে ডোপামাইন কেমন করে সুখানুভূতি সৃষ্টি করে– একই ধারায় নেশায় আসক্তিও, সেরটোনিন কী ভাবে তার আধিক্য বা স্বল্পতার নিরিখে সতর্ক মনোভঙ্গি থেকে শুরু করে তীব্র বিষণ্নতার মত নানা মুড সৃষ্টি করে এগুলো এখন মস্তিষ্কবিদদের আওতার মধ্যে– যে কারণে তাঁরা এর আতিশয্যগুলোর চিকিৎসায়ও পরামর্শ রাখতে পারছেন। এমনকি যাকে আমি ‘আমার’ সিদ্ধান্ত বলি, ‘আমার’ ইচ্ছা বলি ইমেজিঙের মাধ্যমে অতি

সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে সেটি একেবারেই আমার মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত। দেখা গেছে আমি জানার আগে আমার মস্তিষ্কের ইমেজ দেখে সামান্য সময় আগেই পরীক্ষারত বিজ্ঞানী তা জেনে যেতে পারেন। অর্থাৎ আমার মস্তিষ্কই যে আমি এ কথা না মানলে কোনটি মস্তিষ্কের আর কোনটি আমার সিদ্ধান্ত তা নিয়ে বিভ্রান্তি হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি দেখাচ্ছে যে মস্তিষ্কের অগ্রগণ্যতা স্বীকার করতে হবে। কাজেই মায়াবী মন আর সেই কায়াবিহীন মনের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি এখন অতীত ধারণায় পরিণত। মস্তিষ্ক শুধু কনট্রোল প্যানেল নয়– নিজেই পাইলট, অর্থাৎ নিজেই 'আমি' ।

বিবর্তন-লব্ধ অভ্যাস কখনো হারাইনি

এই যে মস্তিষ্ক সে কিন্তু লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের সৃষ্টি। আমরা দেখবো বিবর্তন হলো প্রাকৃতিক সংকটে বাঁচার ও বংশ বিস্তারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার প্রক্রিয়া। স্বভাবের বৈশিষ্টগুলোর মধ্যেও যেগুলো ওভাবে টিকে থাকার সহায়ক হয়েছে সেগুলোই ডিএনএ'র মাধ্যমে বংশানুক্রমে আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। ওই স্বভাবগুলো বাস্তবায়িত করার মত স্নায়বর্তনীগুলো মস্তিষ্কে সৃষ্টির মাধ্যমে এটি ঘটেছে। এটি ঘটার পথে বিবর্তনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অতি ধীরে ওই বৈশিষ্টগুলো সৃষ্টি ও পরিবর্তিত হতে হতে গত ১০-১৫ হাজার বছর থেকে স্থিতি লাভ করেছে- কারণ গুহাবাসী শিকারি জীবনে যাযাবর মানুষ যে সাংঘাতিক পরিবেশ সংকট সমূহ অতিক্রম করেছে কৃষিজীবনে থিতু হয়ে তা আর আর করতে হয়নি– তেমন দীর্ঘ সময়ও এরপর পার হয়নি। সেই সংকটপূর্ণ দীর্ঘ বিবর্তন কালে যেভাবে কাজ করে মস্তিষ্ক আমাদেরকে বিশেষ বিশেষ স্বভাব দিয়েছে তার সব নীল-নক্শা আছে আমাদের ডিএনএ'তে। সে বিজ্ঞানের অসম্ভব অগ্রগতিতে আমরা নিজেদের দেহ, স্বভাব, আচরণ ইত্যাদির এবং সেগুলোতে নানা বৈচিত্র, নানা ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা পাচ্ছি তা জীববিজ্ঞানেরই অংশ যার সকল খুঁটিনাটির সবই উদ্ঘাটিত হচ্ছে ডিএনএ অণুর কারসাজির মধ্যে। এটি আজকের বিজ্ঞানের সব চেয়ে সাহসী, সব চেয়ে অগ্রসরমান ক্ষেত্র। আর এটিই সুযোগ করে দিয়েছে আধুনিকতম মনোবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত– বিবর্তন ভিত্তিক

মনোবিজ্ঞান (এভোল্যুশনারি সাইকোলজি)। এ সম্পর্কে আমরা অনেক বিস্তারিত পরে জানবো, কারণ 'আমি কে' এ প্রশ্নের উত্তর পেতে বিবর্তন ও ডিএনএ'র নিরিখেই মনকে বুঝতে হবে।

এর প্রধান বক্তব্য– বিবর্তন গড়েছে মস্তিষ্ক, আর মস্তিষ্ক গড়েছে প্রত্যেকের আচরণ। মস্তিষ্ক গড়ার কাজটি প্রধানত হয়েছে বহু কাল আগে আদিম সময়ে। সেই প্রাচীন মস্তিষ্কই আমরা পেয়েছি। কাজেই আমাদের মস্তিষ্কের আচরণ-প্রবণতাগুলো মৌলিক অর্থে তখনই ঠিক হয়ে গেছে– বিবর্তনের প্রতিযোগিতায় সেদিন জয়ী হতে গিয়ে যে আচরণগুলো ডিএনএ'র মধ্যে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলো। উদাহরণ স্বরূপ সেদিন মানুষ বাঁচার তাগিদে সাপকে ভয় পেতো। এই সাপের ভয় মস্তিষ্কে আছে বলে আমেরিকার নগরে বাস করা মানুষও যে কখনো সাপ দেখেনি বা এর কথা শোনেনি সাপ দেখলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে ভয় পায়, যদিও সাপের ভয়ের কোন অভিজ্ঞতা তার নেই। নিজের প্রাচীন মস্তিষ্কে এটি সর্বজনীন ভাবে আছে বলে সব মানুষই এ ভয় পায়। বিবর্তনের নিয়মে তাতে নানা জনের মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্র রয়েছে– তখনো ছিল, এখনো আছে। কিন্তু মূল প্রবণতাগুলো আমাদের প্রাচীন পূর্বসূরিদের থেকে আমরা একইভাবে পেয়েছি। ওর মধ্যে ভয়, লোভ, হিংসা, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা, দয়া, বন্ধুত্ব, ভালবাসা সবই ছিল; যা যা টিকে থেকে বাঁচা ও বংশ বিস্তারের কঠিন প্রতিযোগিতায় তাদেরকে সাহায্য করেছিলো তার সবই। সেদিনের আদিম সমাজে যা যা প্রবণতা, আচরণ ছিল আজও সব সমাজে যদি যার যার মত সেগুলো থাকে, তা হলে আজকের বিচ্ছিন্ন কোন আদিম সমাজেও তা না থাকার কোন কারণ নেই। তারা তো বরং এখনো জীবন-জীবিকার দিক থেকে প্রাচীন সমাজগুলোর বেশি কাছাকাছি। কাজেই তথাকথিত 'নিষ্পাপ' আদিমের ধারণা একটি রোমান্টিক ধারণা বই আর কিছু নয়, এটা বিজ্ঞানের ধোপে টেকেনা।

নিষ্পাপ আদিমের বর্ণনায় একেবারে শান্তিপ্রিয়; হিংসাদ্বেষ, লোভ, ঈর্ষা, ইত্যাদি বিবর্জিত; প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নির্লিপ্ত; জীবিকার প্রতিযোগীর প্রতি উদার সাম্যবাদী; প্রকৃতি-পরিবেশের দিকে হাত না বাড়ানো যে মানুষগুলোর কথা বলা হয় তারা আসলে নেই। তাদের পূর্বপুরুষের জন্য ওই গুণগুলো

হতো কঠিন পারিবেশিক সংকটে বিবর্তনের নির্মম প্রতিযোগিতায় নির্ঘাৎ মারা পড়ারই ব্যবস্থাপত্র। তখনকার দিনে ওই নিষ্পাপ গুণের মানুষগুলো টিকে না থাকলে সেই গুণগুলো আজ পর্যন্ত পৌঁছার কথা নয়– আদিম-অনাদিম কোন সমাজেই। আসলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে কোন কোন নৃতত্ত্ববিদের জনপ্রিয় কিছু বইয়ের কারণেই সাম্প্রতিক সময়েও নিষ্পাপ আদিমের ওসব ধারণা তুঙ্গে ওঠেছিল। ওই সমাজগুলোতে অল্প সময় কাটিয়ে ভাসা ভাসা ধারণা থেকেই এই ভুল সৃষ্টি হয়েছিলো। যেমন সুলেখক মার্গারেট মীড ওদের মধ্যে কিছুদিন থেকে নিউগিণির মানুষদের শান্তিপ্রিয় স্বভাব আর সামোয়ার মানুষের মধ্যে যৌন-ঈর্ষার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির কথা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে উভয় সমাজে দীর্ঘসময় ধরে নৃতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে প্রকৃত তথ্য, তা এর ঠিক উল্‌টো। নিউগিণির আদিবাসীদের গোষ্ঠি-যুদ্ধের খুনাখুনির যে চিত্র বরাবর বজায় ছিল, আর বিয়ের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নারীর কুমারীত্ব রক্ষার জন্য সামোয়ানরা হত্যাসহ যেসব চরম নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়, সেগুলো যেভাবে হোক মার্গারেট মীডের মত লেখকের চোখ এড়িয়ে গিয়েছে।

আমরা দেখবো অতীতে বা আদিম সমাজে যতটা নয় বরং আধুনিক কালচারে এসে মানুষ তার বিবর্তন-লব্ধ প্রবণতাগুলোকে কখনো কখনো ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে পারছে। সেটি পারার পেছনে যে কগ্‌নিশন বা মননশীলতা তাও বিবর্তনই মানুষের মস্তিষ্কে দিয়েছে এবং আধুনিক পরিবেশ-পরিস্থিতি মস্তিষ্কের এই সক্ষমতা প্রকাশে বরং অধিকতর সহায়তাই দিচ্ছে। তাই এসব বুঝতে রোমান্টিক ধ্যান ধারণার ওপর নয়, বরং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ওপর নির্ভর করতে হবে।

জীববিজ্ঞান কি 'শিব গড়তে ধানের গীত' গায়?

অনেকে এখনো চিন্তা, স্বভাব, আচরণ ইত্যাদিকে জীববিজ্ঞানের ভাষায় দেখতে রাজি নন। তাঁদের কেউ কেউ এ কাজে আধুনিক জীববিজ্ঞানের সাফল্যগুলোকে অস্বীকার করেননা– কম্পিউটেশন তত্ত্ব, মস্তিষ্কবিদ্যা, ডিএনএ ইত্যাদির সাফল্যকে মেনে নেন। তবুও তাঁরা মনে করেন যদিও বা এগুলো

চিন্তার চিত্র দিতে পারে তবুও সেটি হবে বড় জোর একটি খণ্ডিত চিত্র– ওই কন্ট্রোল প্যানেলের চিত্রের মত, পাইলটের চিত্র পেতে হলে 'উচ্চ মার্গীয়' অন্যান্য বিষয়ের সহায়তা নিতে হবে। এজন্য মস্তিষ্কের রক্তমাংস বাদ দিয়ে 'বিশুদ্ধ' মনোবিজ্ঞানের, অথবা সমাজ-জটিলতার 'উচ্চতর' তত্ত্ব দেবার মত বিশুদ্ধ সমাজবিজ্ঞানের, দেশে দেশে কালচার বিশ্লেষণের 'বিশুদ্ধ' দার্শনিক থিওরির দরকার। এদের আওতায় থাকার উপযুক্ত বিষয়গুলোকে ডিএনএ অণু বা স্নায়ুতন্তুর মত বাস্তব জিনিসে পরিণত করে ফেলা হবে এক রকম অতি 'সরলীকরণের' মত দোষ। আমরা যে বলে থাকি 'ধান ভানতে শিবের গীত', তথাকথিত দোষটি হবে তার ঠিক উল্‌টো– বলা যায় 'শিব গড়তে ধানের গীত'। কিন্তু আসলে কি ব্যাপারটি তাই?

মনকে যাঁরা অশরীরী মায়াবী মনে করতে অভ্যস্ত তাঁদের কাছে মনোজগত হলো কালচার-প্রভাবিত জগত– ওই শিব গড়া যেমন আধ্যাত্মিকতা, শিল্প-বিচার ইত্যাদির এখতিয়ারে রয়েছে মনোজগতও সে ধরনের বিষয়ের অন্তর্গত। তাকে ডিএনএ বা স্নায়ু-বর্তনীর ভাষায় ধারণ করতে যাওয়া হবে শিব গড়া থেকে আধ্যাত্মিকতা, শিল্প-বিচার ইত্যাদি বাদ দিয়ে সেই ধানের গীতে পরিণত করার মতই হবে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটি সেরকম নয়। মানুষের মনোজগতের কোন জটিলতাকে বাদ দিয়ে দেখা অর্থাৎ তার শিল্প-বিচার না করা জীববিজ্ঞান বা কোন বিজ্ঞানেরই উদ্দেশ্য নয়। তবে সব বিজ্ঞানের মতই তাকেও ক্রমাগত সরল থেকে জটিলতার ব্যাখ্যায় যেতে হয়েছে। সেভাবেই প্রত্যেক বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই, প্রত্যেক কিছুকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করে করেই সে মনের ব্যাখ্যায় এখন প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে। এই দুরূহ কাজ এড়িয়ে অন্য কোন ভাবে অগ্রগতি সম্ভব নয়, যত উচ্চবর্গীয় তত্ত্বই দেয়া হোক না কেন।

দুনিয়াজুড়ে কালচারের যে বিশাল বৈচিত্র রয়েছে তার যুক্তিতেই আগের সমাজবিজ্ঞানীরা ও মনোবিজ্ঞানীরা কালচারকে এবং প্রকারান্তে মনোজগতকে বিজ্ঞানের আওতার ঊর্ধ্বে উচ্চ বর্গীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন দুনিয়াজোড়া এ কালচার-বৈচিত্রের এক একটি সৃষ্টি হয়েছে অনেকটা লটারি টেনে টেনে পাওয়ার মত কার্য-কারণ বিহীন ভাবে। এদের বিবেচনাও

তাই করতে হবে প্রত্যেকটির আলাদা পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার মাধ্যমে; এদের সবগুলোকে মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক ঐক্যের কোন অবকাশ ওখানে নেই। তাই মানুষের যে কোন দিকের প্রতি লক্ষ্য করলে তাঁরা তাতে কালচারে কালচারে ব্যাপক প্রভেদ লক্ষ্য করেন।

কালচার মস্তিষ্ক বা ডিএনএ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে, তা মানুষের 'সাদা খাতার' ওপর যথেচ্ছ আঁচড় কাটার জিনিস হলে, হয়তো তাকে লটারি টানার মত খামখেয়ালী ব্যাপার মনে করা যেতো। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারটি হলো দেহ বা মনের মত কালচারের নীল-নক্শা ডিএনএ'তে লেখা থাকেনা সত্য, কিন্তু ডিএনএতে এমন কিছু লেখা থাকে যা যার যার পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে কালচারকে এক এক দিকে ঝোঁকাতে পারে। আমরা পরের একটি অধ্যায়ে তার বিস্তারিত দেখবো। কিন্তু এখানে এইটুকু মনে করিয়ে দিতে চাই যে, যে কোন একটি কালচার সৃষ্টির মূল কারণটি কিন্তু প্রত্যেকের মস্তিষ্কের মধ্যে রয়ে গেছে ডিএনএ'র কল্যাণে। সেটি হলো অন্যকে অনুকরণ করার ও অনুকৃত জিনিসগুলোকে প্যাটার্নভুক্ত করার সক্ষমতা যা আমরা ভাষার ব্যাপারে দেখেছি। কালচার জিনিসটাই তো পরস্পরের দেখাদেখি সবার সম্মিলিত অভ্যাস। আর নানা কালচারে সেটি নানা রকম হবার কারণ হলো পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটিই সুবিধাজনক মনে হওয়া। ডিএনএ বিজ্ঞানের গবেষণা তখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিছে এই পার্থক্যগুলোর গভীরতা খুব বেশি নয়। আসলে এর একটু নিচেই রয়েছে দুনিয়ার সব মানুষের একই রকম অনুভূতি ও চিন্তার প্রবণতাগুলো। বিচ্ছিন্ন নানা কালচারে স্থানীয় সুবিধা অনুযায়ী পরস্পর অনুকরণে ভিন্ন ভিন্ন কিছু অভ্যাস গড়ে ওঠেছে বটে কিন্তু সেগুলোর গভীরে এমন অসংখ্য মৌলিক কালচারগত বিষয় আছে যা দুনিয়ার সব সমাজে একই ভাবে আছে। এগুলো অবাক করার মত। এরকম বহু সমাজের মধ্যে অতীতের কখনো কোন যোগাযোগ না হওয়া সত্ত্বেও এগুলো একই আছে। ভাষার মধ্যে রসবোধ, বক্তৃতার ভাষা, শিশুদের সঙ্গে শিশুতোষ ভাষায় কথা বলা, ভাষার বাইরে ঠিক একই মুখভঙ্গিতে নানা কিছুর অভিব্যক্তি, হাসি-কান্না, আত্মীয়প্রীতি, গল্প বলা ও শোনা, শিশুদের জন্য ঘুম পাড়ানি গান, রূপকথা, সঙ্গীত, নাচ, যৌনতা

সম্পর্কে কথার মধ্যে আড়াল আব্ডাল, লজ্জা প্রকাশ, ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস একেবারেই সর্বজনীন। স্পষ্টত এগুলো একই অতীত মানুষ থেকে দুনিয়ার সব কালচারে গেছে! কেমন করে গেছে তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় বিভিন্নটির বিভিন্ন কারণ ধরা পড়লেও বিবর্তনই এর যে উৎস এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

অনেকে ভয় করেন যে কালচার, সভ্যতা, ইত্যাদির মধ্যে যদি জীববিজ্ঞানের হাত পড়ে তা হলে দেখা যাবে নানা জাতিতে, নানা বর্ণের মানুষের ডিএনএ পার্থক্যর মধ্যে বুদ্ধি, শিক্ষার ক্ষমতা ইত্যাদির পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে এসে জাতিবাদী ধারণাকে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। এটিও ভুল কথা। আমরা পরে দেখবো মানুষে মানুষে ডিএনএ পার্থক্য আছে বটে কিন্তু তা জাতিতে জাতিতে যতটা আছে তার চেয়ে অনেক বেশি আছে জাতির মধ্যেই নানা জনে। বরং এখন স্পষ্ট যে বাস্তবে কোন দিকে এগিয়ে থাকার পিছিয়ে থাকার বিষয়গুলো এসেছে ডিএনএ'র সঙ্গে পরিবেশের ক্রিয়ার কারণে– যার মূলে রয়েছে ভৌগলিক সহ নানা বাস্তব পরিস্থিতি।

একটি সুন্দর উদাহরণ নেয়া যাক যা জীববিজ্ঞানী জারেড ডায়মন্ড চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক অবস্থা থেকে কৃষিজীবী অবস্থায় আসা মানব সভ্যতার একটি বিরাট অগ্রগতি যা মাত্র হাজার দশেক বছর আগে ঘটেছে। ইউরোপ-এশিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে সব জায়গার মধ্যে কৃষি প্রথম উদ্ভাবিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার নিরবিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে সেটি প্রথম হয়েছিলো মেক্সিকোতে। অল্প দু'একটি ফসলকে পোষ মানানোর মধ্য দিয়েই কৃষি শুরু হয়েছিলো। ইউরোপ-এশিয়া পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা, আর আমেরিকা উত্তরে-দক্ষিণে। দেখা গেলো ইউরোপ-এশিয়ায় পূর্বে চীন থেকে পশ্চিমে ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের কৃষি বেশ দ্রুতই পৌঁছে গেল, কিন্তু মেক্সিকোর কৃষি তার বেশি উত্তরে বা দক্ষিণে যেতে অনেকদিন সময় লাগলো। একই ভাবে মধ্য এশিয়ার প্রথম পোষ মানানো ঘোড়াকে দ্রুত পূর্ব পশ্চিমে সর্বত্র কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু পেরুর আন্দিজ এলাকায় প্রথম পোষ মানানো ছোট উট জাতীয় ভারবাহী পশু লামা আর আলপাকা এই এলাকা থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে যেতে পারিনি।

ফলে এর উত্তরের মায়া বা আজটেক সভ্যতা কোন ভারবাহী পশুর সুবিধা পায়নি। এর কারণ কি এশিয়া-ইউরোপের আদি বিভিন্ন জাতিগুলো তাদের শেখার ক্ষমতা বেশি বলে দ্রুত তা শিখেছে, আর আমেরিকার আদি জাতিগুলো সে ভাবে সক্ষম নয় বলেই দ্রুত কৃষি শিখতে পারেনি? ডায়মন্ড দেখালেন ব্যাপারটি মোটেও তা নয়। এর মূলে রয়েছে ভূগোল। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ইউরোপ-এশিয়ায় প্রায় একই রকম জলবায়ু পূর্ব থেকে পশ্চিমে, অক্ষাংশ একই অথবা কাছাকাছি বলে। কাজেই ওই পোষমানা ফসলগুলো আর পশুগুলো সব জায়গায় একই ভাবে আচরণ করেছে। কিন্তু উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত আমেরিকায় উত্তরে বা দক্ষিণে কিছু দূর পর পরই ভিন্ন অক্ষাংশ ভিন্ন জলবায়ু সৃষ্টি করেছে। কাজেই মেক্সিকোর সদ্য পোষমানা ফসল আর পেরুর সদ্য পোষমানা পশু ওখানে উত্তরে বা দক্ষিণে নিয়ে সহজে কার্যকর করা যায়নি। দোষ ভূগোলের, জাতিভেদের নয়। আমরা দেখবো বিবর্তন এবং সর্বাধুনিক জেনেটিক্স বরং মানুষে মানুষে ঐক্যকে সামনে নিয়ে এসেছে, ভেদকে নয়।

একটি অমূলক আশঙ্কা

কালচারের বিষয়, সমাজের বিষয়, মনের বিষয়গুলো যদি জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যাতেই শুধু ধরা পড়ে তা হলে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য মানববিদ্যার প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যাবে? একটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান যখনই নিজেকে আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ফলপ্রসু করতে পারে তখন এরকম অমূলক আশঙ্কার কথা বলা হয়। এমন ঘটনা বিজ্ঞানের ইতিহাসেই বার বার ঘটেছে, প্রত্যেকবার তাতে একটির প্রয়োজন ফুরোবার আশঙ্কা কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন– কিন্তু তা শুধু আশঙ্কাই থেকে গেছে। জ্যোতির্বিদ্যা দেড় হাজার বছর ধরে প্লেটোর ও টলেমীর পৃথিবী-কেন্দ্রিক ভুল বিশ্ব-ছবিতে আটকে ছিল। সত্যিকার অর্থে উদ্ধার পেলো কোপারনিকাসের সাহসী বিকল্পকে গ্যালিলিও-নিউটনের নতুন পদার্থবিদ্যা সমর্থন যোগানোর পর। এই গাণিতিক পদার্থবিদ্যার সক্ষমতা জ্যোতির্বিদ্যার চেহারা পালটিয়ে দিলেও এটি পদার্থবিদ্যা বা গণিত হয়ে যায়নি– জ্যোতির্বিদ্যাই থেকেছে। একেবারে

আধুনিক কালেও বিগ-ব্যাং তত্ত্বের জ্যোতির্বিদ্যা বুঝতে হলে আধুনিকতম পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব আর পরীক্ষণ ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেজন্যও অবশ্য কারো অস্থিত্বের সংকট হয়নি। এমন ঘটনা রসায়নের ক্ষেত্রে ঘটেছে, শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া রসায়নের মৌলিক বিষয়গুলো এক পাও চলতে পারেনা এমন অবস্থা হয়েছে। তাই বলে রসায়ন কিন্তু পদার্থবিদ্যা হয়ে যায়নি। তার আলাদা চরিত্র অক্ষুণ্ন আছে– সেই পর্যায়ে রসায়নকে রসায়ন দিয়েই বুঝতে হয়। রসায়ন নিজেও এর পর এক সময় জীববিজ্ঞানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে তার মধ্যে প্রথমে জৈব রসায়ন, এবং পরে ডিএনএ বিজ্ঞান (মলেক্যুলার বায়োলজি) সৃষ্টি করেছে তখনই জীববিজ্ঞানের সত্যিকার জোয়ার এসেছে। এখন জীববিজ্ঞানের সময় এসেছে মনোবিজ্ঞান আর মানববিদ্যায় জোয়ার আনার; এজন্য কারো বিলুপ্তির প্রশ্ন এখানে ওঠেনা। বরং এতে এক একটি বিষয়ের সীমাবদ্ধতাগুলো দূর হয়।

কেউ যদি বলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ তিনি পদার্থবিদ্যার পরমাণু ও কণিকাবিদ্যার মাধ্যমেই নির্ণয় করবেন– সেটি অসম্ভব কথা হবেনা, তবে অবাস্তব কথা হবে; সুবিবেচক কেউ এ কাজ করতে নামবেন না। অসম্ভব যে নয় তার কারণ হলো মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এখন যত কিছু পাওয়া সম্ভব সব কিছুর সব পরমাণু, কণিকার পুঙ্খানুপুঙ্খ গতিবিধির তথ্য থেকে সাম্রাজ্যের বিস্তারিত ডাইনামিক্স মুহূর্তে পর মুহূর্ত কেমন করে বদলিয়েছে তা তাত্ত্বিক ভাবে পাওয়া সম্ভব। তাত্ত্বিক ভাবে সেখান থেকে আসতে পারে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ। তার মানে এই নয় যে নির্দিষ্ট সময় ও প্রাপ্য সুযোগের মধ্যে ওই তথ্য যোগাড় করা এবং তার অংক কষা বাস্তবসম্মত। এমন কথা যে একেবারে নতুন তাও কিন্তু নয়– নেপোলিয়ানের সমসাময়িক বিখ্যাত ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ এবং গণিতবিদ লাপ্লাস ঠিক একই ধরনের কথা বলেছেন। নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার অসাধারণ ক্ষমতায় মুগ্ধ লাপ্লাস বলেছেন কেউ যদি বিশ্বের প্রতিটি কণার আজকের অবস্থান ও গতি তাঁকে দিয়ে দিতে পারতো তা হলে তিনি অংক কষে বিশ্বের বাকি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। তিনি ঠিকই জানতেন যে ওই সব তথ্য বাস্তবসম্মত ভাবে তিনি পাবেননা বা সেগুলোর অসংখ্য অংক

কষতে পারবেন না, তবে এও জানতেন যে নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার সেই সক্ষমতা আছে– সকল কণিকার বর্তমান অবস্থান ও গতি থেকে বিশ্বের পরবর্তী ডাইনামিক্স বলে দেবার।

এই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আমাদেরকে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির মধ্য দিয়েই জানতে হবে তবে তার প্রত্যেকটিতে বিজ্ঞানের নানা শাখা অসম্ভবকে সম্ভব করার মত যে নতুন সব সুযোগ সৃষ্টি করেছে তাকে অগ্রাহ্য করে কাম্য অগ্রগতি সম্ভব নয়। এভাবে আত্ম-চিন্তা, আত্ম-পরিচয় ও মনের গহীনের সংবাদ যখন আমরা মস্তিষ্কের বিবর্তনের থেকে পাই, ডিএনএ'র পাঠোদ্ধারে জীবনরহস্যের উদ্ঘাটন থেকে পাই, তখনো কিন্তু সব কথা ওখানেই ফুরিয়ে যায়না, শুধু জীববিজ্ঞান দিয়ে তার সব কিছু বোঝার প্রস্তাব কেউ করেনা– একাধিক পর্যায়েই এদের দেখার প্রয়োজন আছে।

আমাদের ইতোমধ্যে দেখা একটি বিষয়ের উদাহরণ এখানে দিতে পারি। চোমস্কির তত্ত্ব অনুযায়ী সব ভাষার সর্বজনীন ব্যাকরণ আমাদের মস্তিষ্কে গাঁথা রয়েছে। এর ভিত্তিতে মস্তিষ্কেই শিশুর বাকি ভাষাজ্ঞান গড়ে ওঠে। তিন-চার বছর বয়স থেকেই মস্তিষ্ক পরিবেশে ব্যবহৃত ভাষায় শব্দভান্ডার গড়া, সেগুলোর অর্থ অনুধাবন, যেই ভাষার ব্যবহৃত রীতি অনুযায়ী বাক্যের মধ্যে শব্দের বিন্যাস ইত্যাদি শিখতে থাকে, প্রয়োজন মত তার (মস্তিষ্কের) স্মৃতির জমিনে জমাও করে। আমার নিজের ভাষাটির কথা বল্‌লে শিশু বয়স থেকে আমার মস্তিষ্কে বাংলা ভাষাতে এই প্রক্রিয়া চলেছে। কিন্তু এই ভাষাটি হাজার বছর ধরে তৈরি হয়েছে, বদলিয়েছে, এখনো বদলাচ্ছে– যার অনেকটাই কিন্তু আমার মস্তিষ্কের বাইরে। সেটি ঘটেছে সেই হাজার বছর আগের চর্যাপদের ভাষা থেকে পূর্ব ভারতের বিশাল স্থান জুড়ে যুগে যুগে অসংখ্য মানুষের মস্তিষ্কে ভাষার কাজের সম্মিলিত ফল হিসেবে। ওর অনেক কিছু আজ আমার মস্তিষ্কে নেই, আজকের কারো মস্তিষ্কেই নেই– আছে তার বাইরে সাহিত্যে, অভিধানে, মহাফেজখানায়। কাজেই আমার বাংলা ভাষাকে আমি শুধু আমার মস্তিষ্কের জিনিস দিয়ে ব্যাখ্যা করলে এর সব ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেনা– বাকিটা

তার বাইরেই খুঁজতে হবে ইতিহাসে, ভূগোলে, ভাষাতত্ত্বে, প্রত্নতত্ত্বে, সংস্কৃতি-বিচারে।

অবশ্য ডিএনএ বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের নানা শাখা ইতোমধ্যেই এর প্রত্যেকটিতে অভাবনীয় ভূমিকা রাখছে; ভবিষ্যতে আরো রাখবে। 'আমি কে' এই প্রশ্নের উত্তরে আমার ভাষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই এ নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রে উপযোগী প্রত্যেকটি বিষয়ের গুরুত্ব বাড়বে বই কমবেনা মোটেই। তবে শেষ পর্যন্ত আমার ভাষা আমার মস্তিষ্কে কীভাবে এসেছে, সেখানে এটি কীভাবে কাজ করছে, আত্ম-পরিচয়ে সেটিই আমার কাছে সব চেয়ে বেশি জরুরী। আধুনিকতম বিজ্ঞান আমাকে সেটিই জানাতে পারছে। এই বিজ্ঞানের আলোকে উপলব্ধি করা সহজ হবে হাজার বছরে কোটি মস্তিষ্কে আমার ভাষার ইতিহাস, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি কীভাবে বিনির্মিত হতে পেরেছে। ভাষা আত্ম-জিজ্ঞাসার একটি উপাদান মাত্র। বাকি সব উপাদানগুলোকেও এই আলোকেই নিতে হবে, তাহলেই উত্তর পাওয়াটি অনেক সম্পূর্ণ হবে।

কাজেই এই বইয়ে আমরা মূল প্রশ্নটির উত্তরের এই মৌলিক দিকটির খোঁজ করেছি। একেবারে আধুনিক কালে ঝড়ের বেগে এগিয়ে ডিএনএ বিজ্ঞান আমাদের জন্য তা সম্ভব করেছ, যা আগে কল্পনাও করা যায়নি। বিবর্তন ও ডিএনএ আত্ম-জিজ্ঞাসার সব দিকের– ব্যক্তিত্বের, আচরণের, আবেগের, সুস্থতার, কালচারের, সুকুমার কলার, নৈতিকতার– সঙ্গে আমার মস্তিষ্কের যোগ কী ভাবে ঘটায় তার কিছুটা পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা আমরা করবো। সে পরিচয়ে যেন বিজ্ঞানের স্বাদ এবং বিজ্ঞানীর চমকপ্রদ সাধনারও একটু স্বাদ নিজেরাও পেতে পারি তার জন্য বিবর্তন ও ডিএনএ'র প্রকৃত ভেতরটিতেও সামান্য ঢুকে দেখতে চাই।

আষাঢ়ে গল্প, গবেষণা, অবশেষে ডিএনএ

যেমন খুশি তেমন তত্ত্ব

নবজাতক শিশুটি বাবার মত দেখতে হলো, না মা'র মত হলো, নাকি আর কোন নিকট আত্মীয়ের মত হলো এ নিয়ে আমাদের কৌতুহলের সীমা থাকে না। এমন কৌতুহল হাজার হাজার বছর আগের মানুষদের মধ্যেও থাকতো। শুধু তাই নয়, বাবার, মা'র, এবং নিকটত্মীয়দের কোন কোন স্বভাব বা আচরণও যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা যায় এটিও মানুষ চিরকাল লক্ষ্য করেছে। এই সঙ্গে আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে যে সন্তান কেন বাবা-মা থেকে চেহারা, স্বভাব এসব পায়? এ প্রশ্ন হাজার বছর আগেও মনে জাগতো– বিশেষ করে চিন্তাশীল দার্শনিক মানুষদের কাছে। যেমন প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার আমলে কোন কোন দার্শনিক নিজের নিজের মত করে এ সম্পর্কে যার যার থিওরি দিয়ে গেছেন। ওখানকার কথা আমরা বেশি জানি কারণ তখনকার অনেক বড় বড় দার্শনিকের থিওরিগুলো বহু কাল ধরে বহুদেশের মানুষ খুব মান্যগণ্য করেছে, এমনকি সেই থিওরি ভুল হলেও। তাই বলে এ নিয়ে অন্য কালে এবং অন্যত্রও থিওরির অভাব হয়নি। তবে এসব থিওরির অধিকাংশই ছিল মনগড়া, এসবে না ছিল কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি, না ছিল কোন স্পষ্ট প্রক্রিয়ার প্রমাণ– অনেকগুলোকে তো নেহাত আষাঢ়ে গল্পের মতই মনে হবে। সে আমলের কিছু কিছু জনপ্রিয় ধারণাও এদের ওপর প্রভাব রাখতো। কোন কোন প্রভাব তো এই সেদিন পর্যন্তও বজায় ছিল, এমনকি বড় বিজ্ঞানীদের মধ্যেও। এখানে এগুলোর কিছু কিছু উল্লেখ করলে আমরা বুঝবো বংশধারার প্রবাহ অর্থাৎ বংশগতি নিয়ে আজকের শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কত রকম বিভ্রান্তির মধ্য থেকে উঠে আসতে হয়েছে।

মানুষ চিরকাল শিকারি-সংগ্রাহক হিসেবে যাযাবর জীবন যাপন করেছে। মাত্র হাজার দশেক আগে থেকে কোন কোন অঞ্চলের মানুষ কৃষি উদ্ভাবন করে

গ্রামে-শহরে কৃষক জীবনে থিতু হয়েছে। এর ফলে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতাগুলোর মধ্যে– যেমন ব্যবিলনে কিংবা মিশরে– আমরা তাদের দেয়ালে খোদাই করা কোন কোন চিত্রে কৃষির দৃশ্য দেখতে পাই। এসব কোন কোন চিত্রে কৃষিতে পোষমানানো ফসলে স্ত্রী-পুরুষ ফুলের পরাগ সংযোগ কিংবা পোষমানানো পশুতে নানা সুবিধাজনক জাত প্রজনন করাবার দৃশ্য দেখা যায়। এগুলো বলে দিচ্ছে যে প্রজননের প্রক্রিয়ার কিছু খুঁটিনাটি তারাও বুঝতো– যেমন পশুর ক্ষেত্রে স্ত্রীর জননরস ও পুরুষের শুক্ররসের মেশার গুরুত্ব, মানুষের ক্ষেত্রেও। কিন্তু যা বোঝা যেতনা ওই দুই রসের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন ভাবে বাবা-মার চেহারা ইত্যাদি সন্তানের কাছে যায় কী ভাবে।

এ নিয়ে তাই নানা কাল্পনিক থিওরি খাড়া হতে থাকলো। আড়াই হাজার বছর আগের গ্রীক দার্শনিক এম্পেডোকল এমনও বল্‌লেন যে সন্তান গর্ভে ধারণের পর মা কোন দেবের বা দেবীর মূর্তি দেখে আবেগে আপ্লুত হলে আর সে মূর্তি মুগ্ধ নয়নে অনেক দিন অনেক্ষণ ধরে দেখলে সন্তানের চেহারা ওই দেব বা দেবীর মত হবে। কী প্রক্রিয়ায় মায়ের মনে ধারণ করা মূর্তির ছবি তার গর্ভস্থ সন্তানের চেহারাকে প্রভাবিত করবে সেই ব্যাখ্যায় অবশ্য তিনি যাননি। ব্যাপারটা সেই যুগে শেষ হলে সমস্যা হতোনা, কিন্তু তার বহু পরে এই পনরো–ষোল শতকের ইউরোপেও এমন ধারণা প্রকাশ করতে কোন কোন জ্ঞানী লোককে দেখা গেছে।

এম্পোডোকলের কিছুদিন পরের অত্যন্ত বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর থিওরিও অবশ্য এর থেকে কম আশ্চর্যজনক ছিলনা। তাঁর মতে সন্তানের দেহ -সৌষ্ঠব এবং স্বভাব-চরিত্র কী রকম হবে সেটি নির্ভর করে স্ত্রী জননরস আর শুক্ররসের মিশ্রণে গর্ভ সঞ্চারের মুহূর্তে বাবা ও মা'র নিজেদের পরিস্থিতির ওপর। সে সময় তাদের দৈহিক সুস্থতা, মুখের কমনীয়তা ইত্যাদি থাকলে সন্তান সেই গুণগুলো পাবে। সে সময় তারা যদি সুচিন্তা করে তা হলে সন্তানের নৈতিক চরিত্র ভাল হবে, কোন কুচিন্তা যদি করে তা হলে সন্তানের কপট চরিত্র হবে।

সব চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী এবং সর্বজনীন ভাবে মেনে নেয়া ভুল তত্ত্বটি অবশ্য দিয়ে গেছেন প্লেটোরই সমসাময়িক তাঁর মতই বিখ্যাত দার্শনিক এরিষ্টোটল। তাঁর তত্ত্বটি অন্যদেরগুলোর তুলনায় বেশ পাকা-পোক্ত ভাবেই দিলেন তিনি। তিনি সামনে নিয়ে এলেন রক্তকে। সে সময় এমনিতেই খুব নামডাকওয়ালা চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সহ অনেকে মনে করতেন মানুষের সকল বৈশিষ্ট এবং তার স্বাস্থ্য শরীরের সর্বত্রগামী রক্তের ওপর নির্ভরশীল। এরিষ্টোটল বল্‌লেন পুরুষের শুক্ররস রক্ত থেকেই তৈরি, এবং স্ত্রী জননরস এবং তার মাসিকের রক্ত একই জিনিস। কাজেই এই দুই রসের মাধ্যমে রক্তে থাকা বাবা ও মা'র গুণাগুন সন্তানের কাছে যায়। তবে সেই সঙ্গে এরিষ্টোটল তাঁর তত্ত্বকে এমন ভাবে বিস্তারিত করলেন যে নারীকে ছোট করার ব্যাপারে তাঁর দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। অবশ্য তাঁর সময়ের এবং এর পরেও কয়েক হাজার বছর ধরে নানা তত্ত্ব-বিচারে পারদর্শী পুরুষদের মধ্যে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্ত্রীর হীনতা প্রমাণের চেষ্টার কোন কমতি ছিলনা। এরিষ্টোটল বল্‌লেন পুরুষের শুক্ররস রক্তের একটি বিশুদ্ধ রূপ। শুক্ররসই তার ক্ষিপ্রতা ইত্যাদি গুণের কারণে ভাল গুণগুলো সন্তানের মধ্যে নিয়ে যেতে পারে বেশি। আর স্ত্রী জননরসের (মাসিকের রক্তের) সঙ্গে দূষণের সম্পর্ক রয়েছে বলে তা ভাল গুণ বেশি তো দিতে পারেইনা বরং পুরুষের দেয়া ভাল গুণের তীব্রতা খানিকটা কমিয়ে দেয়। মনগড়া তত্ত্ব আর কাকে বলে?

রক্তের মাধ্যমে বংশগতির বিস্তারের ধারণাটি কিন্তু সেই প্রাচীন কাল থেকে প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত দুনিয়া জোড়া যে বেশ চালু ছিল তার প্রমাণ এই দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় সব ভাষাতে বংশ অর্থে 'রক্ত' কথাটি চালু থাকা। এখন আধুনিক কালে এসে এটি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের বিশ্বাস থেকে চলে গেছে বটে, কিন্তু অভ্যাসবশত ভাষা থেকে যায়নি। তাই এখনো আমরা বলি 'এটি তোর রক্তের দোষ, তোর বাবাও এমন ছিল'; 'তাঁর শরীরে বাবার জমিদারী রক্ত'; 'ফরাসী মা আর বাঙালী বাবার মিশ্র রক্তের কারণেই মেয়েটি এত গুণী'– এই ধরনের কথাবার্তা। এই সব ক'টি বাক্যে রক্তের উল্লেখটি একেবারেই ভুল।

বংশগতির থিওরি দেবার ব্যাপারে প্রাচীন অন্যান্য সভ্যতাগুলোও পিছিয়ে ছিলনা। এক হাজার সাত'শ বছর আগে ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার বই 'চরক সংহিতার' ভাষ্য অনুযায়ী সন্তানের বংশগতির উপাদান চার রকমের ১) যেগুলো মায়ের জননরস থেকে আসে ২) যেগুলো বাবার শুক্ররস থেকে আসে ৩) যেগুলো গর্ভাবস্থায় মায়ের পথ্য থেকে আসে ৪) যেগুলো ভ্রূণের মধ্যে আত্মা সঞ্চারের সময় আত্মার সঙ্গে আসে। চরক সংহিতার মতে এর সবই বাবা-মার 'কর্মের' ওপর নির্ভর করে– অনেকটা প্লেটো যেভাবে বলতেন।

বিজ্ঞানীরাও বিভ্রান্ত ছিলেন

এ সব প্রাচীন তত্ত্ব দেবার বহুদিন পর বর্তমান বিজ্ঞানের একেবারে শুরুর যুগ সতরো শতকে এসে কী দেখি। যে বিজ্ঞানীরা একেবারে প্রথম যুগের অণুবীক্ষণ ব্যবহারকে তাঁদের কাজের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন তাঁদের কেউ কেউ অণুবীক্ষণে নিজে দেখার দাবী করে অদ্ভুত সব কথা বল্‌লেন। হল্যান্ডের বিজ্ঞানী ল্যাভেনহুক প্রথম ময়লা পানির মধ্যে নানা রকম ক্ষুদ্র জীব দেখে সেগুলোর ছবি এঁকে রাখার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। পুরুষের শুক্ররসে অসংখ্য ক্ষুদ্র শুক্রকোষ তিনি ও অন্যান্যরা আবিষ্কার করেছিলেন। এ কোষগুলো ক্ষুদ্র ব্যাঙাচির মত লেজ নেড়ে নেড়ে দ্রুত সাঁতার কেটে এগোতে পারে। তিনি বল্‌লেন শুক্রকোষকে তিনি অণুবীক্ষণে যেভাবে দেখেছেন তাতে বুঝতে পেরেছেন যে প্রত্যেকটি শুক্রকোষের মূল অংশটি আসলে এর থেকে যে সন্তান জন্ম হবে তার হুবহু প্রতিরূপ– একটি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র শিশুর মত! ইতালীয় বিজ্ঞানী মালপিগি মানুষের রক্তনালী ধমনী ও শিরার সংযোগকারী অতি সূক্ষ্ম কৈশিক নালীগুলো অণুবীক্ষণে দেখে আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দাবী করলেন তিনি বরং স্ত্রী ডিম্বকোষে এরকম ক্ষুদ্র শিশু দেখতে পেয়েছেন অনুবীক্ষণে। তাঁরা বল্‌লেন এই ক্ষুদ্র শিশু বাবা-মার দেহে তৈরি হবার সময় সেই বাবা ও মার সকল বৈশিষ্ট নিজেদের ক্ষুদ্র দেহে ধারণ করেছে; এই শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষ থেকে সন্তান জন্ম হলে ক্ষুদ্র শিশুটাই বড় শিশুতে পরিণত হবে।

ল্যাভেনহুকের আর মালপিগির তত্ত্বের মধ্যে শুধু একটি ব্যাপারেই বড় তফাত– প্রথম জন মনে করেছেন ক্ষুদ্র শিশুটি শুক্রকোষে আছে, তাই সন্তানের প্রধান বৈশিষ্টগুলো বাবা থেকে আসে। দ্বিতীয় জন যেহেতু ক্ষুদ্র শিশুটিকে মায়ের ডিম্বকোষে দেখেছেন বলে দাবী করেছেন তাঁর মতে সন্তানের প্রধান বৈশিষ্টগুলো মায়ের থেকেই আসে। প্রথম জনকে শুক্র-প্রাধান্যবাদী এবং দ্বিতীয় জনকে ডিম্ব-প্রাধান্যবাদী বলা যায়। এই উভয়ক্ষেত্রেই তত্ত্বটিকে বলা হলো 'পূর্ব-গঠন তত্ত্ব'– কারণ সন্তানের গঠনটি বহু আগে শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষে সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে এই তত্ত্বে, সেই ক্ষুদ্র শিশুর আকারে। এ তত্ত্বের অনুসারীর সংখ্যা নেহাৎ কম হলোনা, অনেক দিন বেশ টিকেও রইলো এটি। অনুসারীদেরও একদল শুক্র-প্রাধান্যবাদী হলেন, অন্যরা ডিম্ব-প্রাধান্যবাদী হলেন।

এর একটি রূপে তত্ত্বটি একটি শুক্র বা ডিম্বকোষে একটি মাত্র অনাগত ক্ষুদ্র শিশুতে সীমাবদ্ধ রইলোনা, কল্পনার দৌড় আরো অনেকখানি এগিয়ে গেল। বলা হলো যে এই শিশুটির ভেতরে আছে আরো একটি শিশু যে পরে এই শিশুটির সন্তান হিসেবে জন্ম নেবে। সেই পরের শিশুটির ভেতরে আবার আছে আরো একটি শিশু– এভাবে একের ভেতর এক অসংখ্য ক্ষুদ্র শিশু আছে ভবিষ্যতের সব বংশধরদের সকল বৈশিষ্ট নিয়ে। এর অর্থ হলো একটি মানুষের একটি শুক্র বা ডিম্বকোষের মধ্যে ইতোমধ্যেই 'পূর্ব-গঠিত' হয়ে রয়েছে তার সকল ভবিষ্যৎ বংশধররা। একে চলতি কথায় 'রাশিয়ান ডল্ ' তত্ত্বও বলা হয়। এর কারণ রাশিয়ায় কাঠের তৈরি এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী পুতুল পাওয়া যায় যাতে বাইরে থেকে দেখলে একটি পুতুলই দেখা যায়। কিন্তু একে খুলে ফাঁক করে ফেলা যায়, এবং তা করলে এর ভেতর আর একটি ছোট পুতুল পাওয়া যায়। সেটি ফাঁক করলে আরো ছোট আর একটি– এ ভাবে একের ভেতর এক অনেকগুলো থাকে। অবশেষে অবশ্য অনুবীক্ষণে ভুল নিরীক্ষণ আর তার সঙ্গে ইচ্ছে মত কল্পনা মিশিয়ে তৈরি হওয়া এই সব তত্ত্বের নিরসন হয়েছিলো যখন অনুবীক্ষণেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে জীবের ভ্রূণ কোন ক্ষুদ্র শিশুর অবয়ব থেকে শুরু হয়না, তা শুরু হয় একেবারেই সাদামাটা

একটি কোষ থেকে– শুক্রকোষ আর ডিম্বকোষের সংযোগ থেকে। এই শুক্রকোষ এবং ডিম্বকোষও ক্ষুদ্র শিশুর মত দেখতে কিছু নয়।

শুধু সতরো শতকে বর্তমান ধরনের বিজ্ঞানের শুরুতেই নয়, বরং উনিশ শতকের মত বিজ্ঞানের ভরা জোয়ারের মধ্যেও বংশগতির ভুল তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। এমন কি চার্লস ডারউইনের মত সেরা জীববিজ্ঞানীও বংশগতির ভুল তত্ত্বের একজন সৃষ্টিকার ছিলেন। অথচ তাঁর বিবর্তন তত্ত্বে বংশগতি আছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। ভাগ্যিস ভুল বংশগতি তত্ত্বও ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মূল কথাকে নির্ভুল রাখতে পেরেছিলো। এই শেষের বিভ্রান্তি উৎসও রয়ে গেছে সেই প্রাচীন গ্রীসে। আজ থেকে ২,৪০০ বছর আগের বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটেসের নাম কে না জানে, এখনো দুনিয়ার সব ডাক্তারী ছাত্ররা পাশ করার পর চিকিৎসক জীবন শুরুর আগে যে শপথবাক্য পাঠ করে সেগুলো হিপোক্রেটেসের লেখা– তাই 'হিপোক্রেটেস শপথ' নামে পরিচিত। বংশগতির ব্যাপারে তাঁর তত্ত্ব ছিল বাবা-মা'র শরীরের প্রত্যেক অংশই সন্তানের শরীরের সেই অংশটি তৈরির কাজে অংশ গ্রহণ করে। কোন না কোন প্রক্রিয়ায় প্রতি অঙ্গের বৈশিষ্টগুলো পুরুষ ও স্ত্রী জননরসে পোঁছে বলেই সন্তানে গিয়ে ওই বৈশিষ্টগুলো সঠিক অঙ্গে দেখা দেয়। তত্ত্বটিকে বলা হলো 'প্যানজেনেসিস' যার মানে 'সর্বত্র-ব্যাপ্ত উৎস'। এই উনিশ শতকে এসেও ডারউইন এবং তাঁর সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানী এ তত্ত্বকে প্রায় হুবহুই মেনে নিয়েছিলেন।

ডারউইন একে ব্যাখ্যা করেছিল শরীরের সব অংশে সব কোষে গেম্যুল নামে এক রকম প্রায় অণুসদৃশ ক্ষুদ্র কণা কল্পনা করে। যেই অঙ্গের গেম্যুল সেটি শুধু সেই অঙ্গের বৈশিষ্টগুলো ধারণ করে। কোন এক অজানা প্রক্রিয়ায় গেম্যুলগুলো সারা শরীর থেকে এসে শুক্রকোষে অথবা ডিম্বকোষে একত্রিত হয় এবং সেখান থেকে সন্তানের কাছে যায়। ওখানে গেম্যুলগুলো শুধু যার যার প্রাসঙ্গিক অঙ্গগুলো তৈরিতে কাজ করে– যেমন বাবা-মার আঙ্গুল থেকে আসা গেম্যুল সন্তানের আঙ্গুল তৈরি করে দেয়। থিওরিতে যে অনেক ফাঁক ও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল তা নিয়ে তখনকার বিজ্ঞানীরা বিচলিত হননি, কারণ তখনো বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে খুব গভীরে যাওয়া সম্ভব নয় বলে মনে

করতেন। তখনো বিজ্ঞানীরা সন্তান জন্মের বিস্তৃত প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের অগম্য একটি রহস্য মনে করতেন।

এই ভুল বংশগতি তত্ত্বের জন্য ডারউইনকে বেশ খেসারতও দিতে হয়েছে। তাঁর খুবই শক্তিশালী বিবর্তন তত্ত্ব এর কারণে গুরুতর কিছু প্রশ্নের সম্মূখীন হয়েছিলো প্যানজেনেসিসের ভিত্তিতে তিনি এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না। যেমন উদাহরণস্বরূপ ক্ষুদ্র গেম্যুল বাবার আঙ্গুল থেকে গিয়ে ও মা'র আঙ্গুল থেকে গিয়ে পরস্পর মিশে সন্তানের আঙ্গুলটি কিছুটা বাবার ও কিছুটা মায়ের মত মিশ্র আদলে তৈরি করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়না, সন্তান হয় বাবার আঙ্গুল পায়, নইলে মার আঙ্গুল পায়– মিশ্র আঙ্গুল পায়না। যদি পেতো তা হলে বিবর্তন ব্যাখ্যায় সমস্যা হতো। আধুনিক বংশগতি তত্ত্ব এসে পরে ডারউইনের তত্ত্বকে এ সমস্যা থেকে রক্ষা করেছে। একই ভাবে প্যানজেনেসিস তত্ত্ব বাবা-মা তাঁদের জীবদ্দশায় যা নতুন অর্জন করেছে তাও সন্তানের মধ্যে যেতে দেয়। অর্থাৎ তাঁরা যদি ব্যায়াম করে নিজেদের ছোট বেলা থেকে পাওয়া দুর্বল বাহুকে সবল ও মাংসপেশী সমৃদ্ধ করে তোলেন তা হলে এখান থেকে গেম্যুল গিয়ে জন্মগত ভাবেই সন্তানের বাহুকে সবল ও সমৃদ্ধ করে তোলার কথা। কিন্তু আসলে তা হয়না। বাবা-মা নিজেরা জন্মগত ভাবে যা পায় তাই শুধু জন্মের সময় সন্তানের মধ্যে দিতে পারে, যদি না তাদের শুক্রকোষ বা ডিম্বকোষে নিজেদের জীবদ্দশাতে দুর্ঘটনাবশত কোন পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক বংশগতি তত্ত্ব এসে ডারউইনের তত্ত্বকে এক্ষেত্রেও বিভ্রান্তি মুক্ত করেছে।

বংশগতির এই প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার মোটেই সহজ হয়নি। হাজার বছরের নানা মনগড়া তত্ত্বকে ঝেড়ে ফেলে বিজ্ঞানীরা নিবিষ্ট পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে ধাপে ধাপে এটি সম্ভব করেছেন। এসব পরীক্ষা-নিরিক্ষার কিছু কিছু আমরা এর পর দেখবো। এর ফলে বংশগতির প্রক্রিয়া বিজ্ঞানের অগম্য না থেকে আমাদের অনুধাবন ও সক্ষমতায় আকাশছোঁয়া সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে– বলতে গেলে এর মাধ্যমে জীবনরহস্যের উদ্ঘাটন করেছে। এমন কাজ বিজ্ঞান কী ভাবে করতে পেরেছে সেটি কিছুটা বুঝলে আমাদের আত্মপরিচয়ের এই মৌলিক ভিত্তিটি নিজেদের কাছে স্বচ্ছ হবে।

মটরশুঁটির বংশগতি দেখে মূলনীতি আবিষ্কার

বংশগতির শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল চরিত্রটি ধরতে পেরেছিলেন গ্রেগর মেন্ডেল যা তিনি ১৮৬৫ সালে একটি নিবন্ধে প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরীক্ষা-নিরিক্ষাই ছিল বলতে গেলে বংশগতির ওপর প্রথম সত্যিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা। বিজ্ঞানে যথেষ্ট পড়াশুনা থাকলেও তাঁর আসল পরিচয় ছিল অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের (বর্তমান চেক রিপাবলিকের) ছোট্ট শহর ব্রুনের মঠের পাদরি হিসেবে। বিজ্ঞান ছিল তাঁর সখের কাজ। মূলস্রোতের বিজ্ঞানী না হওয়াতে মফস্বলের ছোট বিজ্ঞান সমিতির পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে অনেকের অজানা ছিল– তারপর পুনরাবিষ্কৃত হয়ে বংশগতি বিজ্ঞানে তুমুল ঝড় তুলেছিলো। ওই পঞ্চাশ বছর অজানা থাকার সুযোগেই ডারউইনের মত প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এ সম্পর্কে ভুল তত্ত্বে পরিচালিত হতে পেরেছিলেন।

মেন্ডেল তাঁর সব গবেষণা করেছেন ওই মঠের বাগানের একাংশে মটরশুঁটি লাগিয়ে সেগুলোর একটির সঙ্গে আর একটির সযত্নে পৃথক প্রজনন ঘটানোর পরীক্ষা নিরিক্ষা করে। এর ফলাফল থেকে তাঁর খুবই মূল্যবান মূল আবিষ্কার হলো বংশগতির যে বার্তা মায়ের থেকে এবং বাবার থেকে সন্তানের কাছে যায় তার প্রত্যেকটি একটি মাত্র বৈশিষ্টের খবর বহন করে; এবং বার্তাটি একেবারেই একক স্বাধীন জিনিস যার একটির সঙ্গে আর একটি মিশে গিয়ে মিশ্রবার্তা সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া এদের একটির দ্বারা অন্যটি প্রভাবিত হবারও কোন সুযোগ নেই। এই বার্তাটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম যতই যেতে থাকে তার এই অবিমিশ্র একক সত্ত্বা অপরিবর্তিত থেকে যায়। তাই এর দেয়া বৈশিষ্টটিও প্রজন্মের পর প্রজন্ম অটুট থাকে, অন্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাঝামাঝি রকমের বৈশিষ্টে পরিণত হতে পারেনা।

মজার ব্যাপার হলো মেন্ডেল এর সব কিছু বুঝতে পেরেছিলেন মটরশুঁটির বংশগতি লক্ষ্য করে; অর্থাৎ বাবা মটরশুঁটির আর মা মটরশুঁটির থেকে সন্তান মটরশুঁটির মধ্যে গিয়ে এক একটি বৈশিষ্ট কী রকম থাকে তা লক্ষ্য করে। মটরশুঁটির যে বৈশিষ্টগুলো নিয়ে মেন্ডেল কাজ করেছেন সেগুলো বেশ সরল

প্রকৃতির– মটরশুঁটি বলে কথা। যেমন একটি বৈশিষ্ট যাকে আমরা উদাহরণ হিসেবে নেবো তা হলো এর বীজ মসৃণ হওয়া অথবা কুঁচকানো হওয়ার বৈশিষ্ট। বাবা ও মা'র কাছ থেকে যে কোন বৈশিষ্টের যে বার্তা সন্তানের কাছে যায় মেন্ডেল তাকে বলেছেন এক একটি 'ফ্যাক্টর'। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীরা একেই বলেছেন 'জিন'। ফ্যাক্টরই বলি বা জিনই বলি এটি ছিল একটি আন্দাজ করা জিনিস, ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য। মসৃণতার বৈশিষ্টের যে বার্তা, ফ্যাক্টর, বা জিন তার দুইটি রূপ বা দুইটি ভিন্ন কপি রয়েছে– একটি কপি যেন নির্দেশ দেয় 'বীজ মসৃণ হও', অন্যটি বলে 'বীজ কুঁচকানো হও'। আমরা প্রথম কপিটিকে মসৃণের কপি আর দ্বিতীয় কপিটিকে কুঁচকানোর কপি বলতে পারি। সন্তান কিন্তু সব সময় যে কোন জিনের দুটি করে কপি পায়– একটি বাবার কাছ থেকে, একটি মায়ের কাছ থেকে। বাবা বা মায়ের প্রত্যেকের কাছে কোন্ দুই কপি আছে সেই সাপেক্ষে এবং লটারির মত দৈব চয়নে সন্তানের কাছে একই রকম দুটি কপিও যেতে পারে, আবার ভিন্ন দুটি কপিও যেতে পারে।

মেন্ডেল প্রজন্মের পর প্রজন্ম মটরশুঁটিকে নিজেদের মধ্যে প্রজনন করিয়ে এবং প্রত্যেক প্রজন্মের পর বাছাই করে করে মটরশুঁটির এমন দুটি পৃথক দল গড়ে তুল্লেন যে শেষ পর্যন্ত একটি দলের নিজেদের মধ্যে প্রজননে সব সময় শুধু মসৃণ বীজের জন্ম হয়। একই ভাবে অন্য দলে শুধু কুঁচকানো বীজের জন্ম হয়। প্রথম দলটিকে বলা যায় বিশুদ্ধ মসৃণ, আর দ্বিতীয় দলটিকে বিশুদ্ধ কুঁচকানো। মেন্ডেল বুঝতে পারলেন বিশুদ্ধ মসৃণ দলে সব মটরশুঁটির গাছে ওই বৈশিষ্ট সংক্রান্ত জিনের দুটি কপিই মসৃণের কপি; আর বিশুদ্ধ কুঁচকানো দলে সবার দুটি কপিই কুঁচকানোর কপি। তা যদি না হতো তা হলে বিশুদ্ধ মসৃণের দলেও কালেভদ্রে সন্তানের মধ্যে মা ও বাবার দুটি কপিই কুঁচকানোর চলে এসে সন্তানটির বীজ কুঁচকানো হতো। কিন্তু কোন বাবা বা মায়ের কাছে কুঁচকানোর কপি না থাকাতেই তা সম্ভব হচ্ছেনা।

এবার মেন্ডেল বিশুদ্ধ মসৃণের দল থেকে বেশ কিছু মটরশুটি নিয়ে বিশুদ্ধ কুঁচকানোর দলের কিছু সংখ্যকের সঙ্গে প্রজনন করালেন। অবাক হয়ে তিনি দেখলেন এর প্রথম প্রজন্মের এই সব সন্তান শুধুই মসৃণ হলো। অথচ এদের

প্রত্যেকের বাবার থেকে যেই কপি পেয়েছে মায়ের থেকে তার বিপরীত কপি পাওয়ার কথা– এবং প্রত্যেকের মধ্যে একটি কপি মসৃণের ও একটি কপি কুঁচকানোর থাকার কথা। স্পষ্ট বোঝা গেল যে এই ক্ষেত্রে মসৃণের কপির জিৎ হয়, কুঁচকানো কপি থাকা সত্ত্বেও সেটি কার্যকর হয়না। মেন্ডেল বল্‌লেন মসৃণের কপির প্রভাব 'মুখ্য' এবং কুঁচকানোর কপির প্রভাব 'গৌণ'– তাই উভয়টি থাকলে মসৃণ হওয়াটাই কার্যকর হবে। কাজেই বীজ মসৃণ হলেই এমন ধারণা করা যাবেনা যে তার মধ্যে কুঁচকানোর কোন কপি নেই; তা থাকতেও পারে, তবে গৌণ বলে সেটি প্রকাশিত হতে পারছেনা।

এই ব্যাপারটি চমৎকার প্রমাণিত হলো যখন মেন্ডেল প্রথম প্রজন্মের ওই সন্তানদের নিজেদের মধ্যে এবার প্রজনন করালেন। এর ফলে যেই দ্বিতীয় প্রজন্ম এলো দেখা গেল তার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ মসৃণ হলেও এক ভাগ কিন্তু কুঁচকানো হলো। এবার কেন এতগুলো কুঁচকানো আসলো? কারণ স্পষ্ট যে সব ক্ষেত্রে সন্তান বাবার থেকেও কুঁচকানোর কপি পেয়েছে, মায়ের থেকেও কুঁচকানোর কপি পেয়েছে সেক্ষেত্রে তার কুঁচকানো না হয়ে উপায় নেই, সেটি গৌণ হওয়া সত্ত্বেও। আর সব বাবার ও সব মায়ের মধ্যে একটি অপ্রকাশিত কুঁচকানোর কপি তো আছেই। হিসেব করে দেখলেও কুঁচকানো হয়ে জন্ম নেয়াদের সংখ্যা চার ভাগের এক ভাগই হওয়ার কথা। দৈব চয়নের সম্ভাবনার কথা ভাবলে চার ভাগের এক ভাগে বাবা ও মা উভয়ের কাছ থেকে মসৃণের কপি পাওয়ার কথা, চার ভাগের এক ভাগে বাবার থেকে মসৃণের ও মায়ের থেকে কুঁচকানের কপি পাওয়ার কথা, আরো চার ভাগের এক ভাগে বাবার থেকে কুঁচকানোর ও মায়ের কাছ থেকে মসৃণের কপি পাওয়ার কথা। এই তিন ভাগের সব কটাতে অন্তত একটি মসৃণের কপি থাকাতে তাদের সবাইকে মসৃণই হতে হয় (সেটি মুখ্য বলে)। কাজেই চার ভাগের ওই তিন ভাগ মসৃণ। বাকি এক ভাগ কুঁচকানো– কারণ বাবার থেকেও কুঁচকানোর এবং মায়ের থেকেও কুঁচকানোর কপি পেয়েছে বলে তাদের দুটি কপিই কুঁচকানোর।

মেন্ডেলের মূল সিদ্ধান্তগুলো যদি ঠিক না হতো তা হলে এর কোনটিই হতে পারতোনা। একটি সিদ্ধান্ত ছিল বীজ মসৃণ বা কুঁচকানো হবার জিন একক ও

অবিমিশ্র– মিশে গিয়ে কোন বীজকে কিছুটা মসৃণ কিছুটা কুঁচকানো করতে পারে না। প্রজন্মের পর প্রজন্মে এই জিন তার স্বকীয়তা বজায় রাখে। আরেকটি সিদ্ধান্ত ছিল জিন মুখ্য বা গৌণ হতে পারে বলে গৌণগুলো কখনো প্রকাশিত ও কখনো অপ্রকাশিত থাকতে পারে।

মেন্ডেল মটরশুঁটির বীজের মসৃণতার বৈশিষ্ট নিয়েই শুধু পরীক্ষা করেননি এই উদ্ভিদটির অন্যান্য কিছু বৈশিষ্টের ওপরও পরীক্ষা চালিয়ে একই রকম ফল পেয়েছেন– সবগুলোই তাঁর বংশগতির মূল নিয়মটিকে প্রমাণ করেছে। এর মধ্যে আছে গাছের উচ্চতা (লম্বা অথবা বেঁটে), ফুলের রঙ (সাদা অথবা লাল) কাঁচা অবস্থায় শুঁটির রঙ (হলুদ অথবা সবুজ)। কিছু পরীক্ষা তিনি করেছেন দুটি বৈশিষ্টের দিকে একই সঙ্গে নজর দিয়ে। যেমন কিছু পরীক্ষায় একই মটরশুঁটিতে বীজের মসৃণতা ও শুঁটির রঙ উভয়েই লক্ষ্য করে পরীক্ষা করলেন। মেন্ডেল ধরে নিলেন যে বীজ মসৃণ হবে কি কুঁচকানো হবে তার সঙ্গে শুঁটির রঙ হলুদ হবে কি সবুজ হবে তার কোন সম্পর্কে নেই। প্রত্যেক জিন স্বাধীন। সেই ক্ষেত্রে আগের মতই প্রত্যেক বৈশিষ্টের প্রত্যেক কপির বিশুদ্ধ দল থেকে বিভিন্ন সম্মিলনে নিয়ে প্রজনন করালেন। তারপর প্রথম প্রজন্মের গুলোর মধ্যে প্রজনন করিয়ে আগের মত দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তান পেলেন। দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের মধ্যে ১৬ ভাগের ৯ ভাগ হবার কথা মসৃণ ও হলুদ, ৩ ভাগ হওয়ার কথা মসৃণ ও সবুজ, ৩ ভাগ হওয়ার কথা কুঁচকানো ও হলুদ, আর শুধু ১ ভাগ হবার কথা কুঁচকানো ও সবুজ। মেন্ডেল ঠিক এই ফলাফল পেলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে তাঁর ধরে নেয়া এক জিনের ওপর অন্য জিন নির্ভর না করা, প্রত্যেক জিন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তার স্বাধীন সত্ত্বা বজায় রাখার ধারণাটি সঠিক।

মেন্ডেলের এই নীতিটি আবিষ্কার না হলে জেনেটিক্সের (বংশগতি বিজ্ঞানের) মৌলিক একটি শর্ত অজানা থাকতো, যার ফলে প্রকৃত সত্যে পৌঁছানো কঠিন হতো। আর এই শর্ত যদি বাস্তবে জীবজগতে না থাকতো তা হলে জীবের বংশগতি যেমন দেখছি সে রকম হতেই পারতোনা। এদিক থেকে মেন্ডেল ভাগ্যবান, এবং আধুনিক জেনেটিক্সের ভাগ্যও ভাল। কারণ মটরশুঁটির মত সরল বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে তাঁর নীতির কোন ব্যতিক্রম ছিলনা বলে তিনি

ব্যতিক্রম দিয়ে বিভ্রান্ত হননি। পরে দেখা গেছে কিছু কিছু জটিলতর ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট একটি মাত্র জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হওয়াতে এবং সোজাসাপটা একটি কপি মুখ্য ও একটি কপি গৌণ না হবার কারণে ওই নীতির ব্যতিক্রম ঘটে। পরবর্তী কয়েকজন অত্যন্ত ফলপ্রসু গবেষক এই ব্যতিক্রমগুলো উদ্ঘাটন করে জেনেটিক্সকে আরো অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছেন, কিন্তু মেন্ডেলের মূল নিয়ম জানা থাকায় ব্যতিক্রমের ভেতর দিয়ে জিনের প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থান আরো বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের দীর্ঘদিনের নিবিষ্ট গবেষণা ও সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস মর্গ্যান যাঁর কর্মকাল ছিল মেন্ডেলের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর বিশ শতকের প্রথম দশকগুলোতে।

মাছির সাদা চোখ জিনের ঠিকানা দিল

মেন্ডেল যেমন কাজ করেছিলেন মটরশুঁটি নিয়ে, মরগ্যান সে রকম করেছেন ড্রসোফিলিয়া নামের এক প্রকার মাছি নিয়ে যাকে ফলের মাছিও বলা হয়। তাঁর ল্যাবোরেটরি তাই অনেক কাচের বোতলে রাখা নানা ভাবে চিহ্নিত করা মাছিতে সব সময় ভর্তি থাকতো। এ মাছির নানা বৈশিষ্ট এবং তাদের পরিবর্তিত রূপ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে গিয়ে কীভাবে প্রকাশিত হয় তাই ছিল মরগ্যানের এবং তাঁর সহকর্মীদের বহু বছরের গবেষণা। মাছি নিয়ে কাজ করার একটি সুবিধা হলো মাছির পূর্ণবয়স্ক হয়ে বাচ্চা দিতে খুব কম সময় লাগে– তাই দ্রুত বহু প্রজন্মের ওপর পরীক্ষা চালানো যায়। তাছাড়া মরগ্যানের একটি লক্ষ্য ছিল বাবা মাছি ও মা মাছির ওপর এক্সরে, তেজষ্ক্রিয় রশ্মি, এসিড বাষ্প ইত্যাদি প্রয়োগ করে তাদের কোন কোন জিনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা যা তিনি তাদের সন্তানদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট-পরিবর্তনের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন। মাছির ওপর এই ব্যাপারটি ঘটানো অপেক্ষাকৃত সহজতর।

বংশগতির গবেষণায় ওভাবে জিন পরিবর্তন হওয়াকে বলে মিউট্যাশন এবং তার ফলে সন্তানের কোন বৈশিষ্ট যদি লক্ষ্যণীয় ভাবে বদলে যায় তখন সেই

সন্তানকে বলা হয় একটি মিউট্যান্ট। মরগ্যান গবেষণার স্বার্থে কৃত্রিম ভাবে মিউট্যাশন সৃষ্টি করছিলেন বটে, তবে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু মিউট্যাশন নানা জীবে সৃষ্টি হয়। মরগ্যান দীর্ঘ সময় ধরে বহু মাছির ওপর ওই ক্ষতিকর জিনিসগুলো প্রয়োগ করে পরের প্রজন্মে তাদের হাজার হাজার সন্তান মাছির প্রত্যেকটিকে তার নানা বৈশিষ্টের জন্য লক্ষ্য করলেন– কোথাও এমন কোন বৈশিষ্ট দেখা দিয়েছে কিনা যা তার বাবা-মার মধ্যে নেই। দীর্ঘ দিন ধরে অনেকবার এই একই অত্যন্ত ধৈর্য ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করার পরও তেমন কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ছিলনা। অবশেষে প্রথম যে মিউট্যান্ট তিনি পেলেন তা হলো একটি পুরুষ সন্তান যার চোখের রঙ সাদা। সাধারণত ফলের মাছির সবার চোখের রঙ লাল হয়ে থাকে। এই সবে ধন নীল মণি সাদা চোখ মাছিটিকে তিনি শিগ্‌গির গবেষণায় কাজে লাগালেন– এই পুরুষ মাছিটির সঙ্গে সাধারণ লাল চোখের একটি স্ত্রী মাছির প্রজনন ঘটালেন। এর ফলে যে হাজার খানেক সন্তানের জন্ম হলো দেখলেন তাদের প্রায় সবারই চোখ লাল। কিন্তু এই হাজার মাছির নিজেদের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে যে দ্বিতীয় প্রজন্ম পেলেন তাদের অনেকের সাদা চোখ– চার ভাগের এক ভাগ মাছিরই। অবাক হয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে এই সাদা চোখ মাছির সবাই পুরুষ। তার মানে সাদা চোখ হওয়ার বৈশিষ্টের সঙ্গে পুরুষ হবার বৈশিষ্টের একটি ধরাবাঁধা সম্পর্ক এখানে দেখা যাচ্ছে– মেন্ডেলের স্বাধীন বৈশিষ্টের নিয়মানুযায়ী যা হবার কথা নয়। কেন চার ভাগের এক ভাগ সাদা চোখ হলো, কেন মেন্ডেলের নিয়মের এই ব্যতিক্রম হলো, এসব বুঝতে গিয়ে মরগ্যানকে জীবকোষের ভেতরে তখন সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত একটি জিনিসের প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবে ব্যবহার করতে হলো। এই জিনিসটি হলো ক্রোমোজোম।

বিজ্ঞানীরা তখন আবিষ্কার করেছেন যে ব্যাকটেরিয়ার মত কিছু ব্যতিক্রম বাদে প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস নামের এর একটি যে ঝিল্লিঘেরা কেন্দ্রীয় অংশ থাকে সেখানে ক্ষুদ্র নমনীয় কাঠির মত কিছু জিনিস জোড়ায় জোড়ায় থাকে– এদেরকেই বলা হলো ক্রোমোজোম। এক এক জীবে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট সংখ্যায় এই ক্রোমোজোম-জোড়া থাকে। ফলের মাছির মধ্যে থাকে

চার জোড়া ক্রোমোজোম। প্রত্যেক জোড়ার দুটি সদস্য মোটামুটি একই প্রকৃতির, যদিও গঠনের ভিন্নতা আছে। কিন্তু বিভিন্ন জোড়ার আকার আকৃতি কিছু ভিন্ন এবং এদের প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে চিহ্নিত। ফলের মাছিতে চার জোড়া থাকাতে মোট আটটি ক্রোমোজোম রয়েছে। দেখা গেলো যে এই ক্রোমোজোমের সঙ্গে প্রজনন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক জোড়ার একটি ক্রোমোজোমকে সন্তান পায় বাবার কাছ থেকে এবং অন্যটি পায় মায়ের কাছ থকে। বাবার দেহে শুক্রকোষ তৈরির সময় এবং মায়ের দেহে ডিম্বকোষ তৈরির সময় বাবার বা মায়ের সাধারণ কোষে ক্রোমোজোম-জোড়ার দুই সদস্য আলাদা হয়ে যায়, ওদের মধ্যে কিছু ভাঙ্গাগড়া দেয়া-নেয়া ঘটে (যার বিস্তারিত আমরা পরে দেখবো), তারপর এর মধ্যে শুধু একটি সদস্য বাবার ক্ষেত্রে শুক্রকোষে এবং মায়ের ক্ষেত্রে ডিম্বকোষে যায়। এর মানে ফলের মাছিতে সাধারণ কোষে মোট আটটি ক্রোমোজোম থাকলেও এর শুক্রকোষে বা ডিম্বকোষে থাকে মাত্র চারটি ক্রোমোজোম। পরে যখন শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ মিলে সন্তানের কোষ তৈরি হয় সেখানে প্রত্যেক জোড়ায় শুক্র থেকে এক সদস্য আর ডিম্ব থেকে এক সদস্য কাছে এসে আবার স্বাভাবিক কোষের মতই আটটি ক্রোমোজোম হয়ে যায়, চার জোড়ায়।

প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম-জোড়াগুলোর একটি চিহ্নিত থাকে সেক্স ক্রোমোজোম বা লিঙ্গ নির্ধারণী ক্রোমোজোম-জোড়া হিসেবে। এই জোড়ার সদস্যগুলো দুই রকমে থাকতে পারে – এক রকমকে নাম দেয়া হয়েছে X এবং অন্য রকমকে Y। জোড়ায় দুটি X থাকতে পারে, অথবা একটি X এবং অন্যটি Y থাকতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে জোড়াটি হবে XX, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে XY। দেখা গেছে XX থাকলে তা অবশ্যই স্ত্রী হয়, এবং XY থাকলে তা অবশ্যই পুরুষ হয়। এ জন্যই এটি লিঙ্গ-নির্ধারণী ক্রোমোজোম-জোড়া। স্পষ্টত এটিও বোঝা গেল বাবা মা'র মধ্যে শুধু বাবারই Y থাকে বলে কোন সন্তান পুরুষ হবে না কি স্ত্রী হবে তা নির্ভর করে শুধু বাবার ওপর – তাঁর থেকে সন্তানের সেক্স ক্রোমোজোমে Y গেল নাকি X গেল, তার ওপর নির্ভর করে (মানুষের ক্ষেত্রে সহ)।

ক্রোমোজোম সম্পর্কে এই সব সদ্য পাওয়া জ্ঞান মরগ্যান ও অন্যান্য কিছু জেনেটিক্স বিজ্ঞানীর হাতে যেন আকাশের চাঁদ এনে দিল। জিনের আচরণ সম্পর্কে তাঁরা তখন অনেক কিছু জানেন; কিন্তু জিনটি যে কী তা জানেন না, জিন যে ঠিক কোথায় থাকে তাও জানেন না। কিন্তু এবার মনে হলো জিনের একটি ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে– সেটি ক্রোমোজোমের মধ্যে। অন্তত স্ত্রী বা পুরুষ হবার বৈশিষ্টটি ক্রোমোজোমের দ্বারা নির্ধারিত হতে দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ এই বৈশিষ্টের জিনটি সেখানে আছে। মরগ্যান সাদা বা লাল চোখ মাছি নিয়ে তাঁর পরীক্ষায় ফলাফলগুলো ব্যাখ্যা করার সময় ভাবলেন চোখের রঙের জিনটি খুব সম্ভব সেক্স ক্রোমোজোমে আছে, নইলে ব্যতিক্রমী সাদা চোখের মাছিগুলোর সবই পুরুষ কেন। তিনি আপাতত ধরে নিলেন যে চোখের রঙের জিনটিও ওই লিঙ্গ-নির্ণয়কারী ক্রোমোজোম-জোড়ার X ক্রোমোজোমটির মধ্যে থাকে। তিনি এও ধরে নিলেন যে মাছির মধ্যে লাল চোখ হওয়াটাই মুখ্য বৈশিষ্ট, সাদা চোখ হওয়া গৌণ। মরগ্যানের পরীক্ষায় মিউট্যান্ট সাদা চোখ পুরুষ মাছিটি এবং সাধারণ স্ত্রী মাছির প্রজননে সন্তানদের সবাই লাল চোখ পেয়েছে কারণ স্ত্রী সন্তানরা লিঙ্গ-নির্ধারণী ক্রোমোজোম-জোড়ায় মায়ের থেকে X পেয়েছে তাতে লাল চোখের জিন-কপি; আর বাবার থেকে যে X পেয়েছে তাতে সাদা চোখের জিন-কপি আছে বটে, কিন্তু তা গৌণ। কাজেই স্ত্রী সন্তান সবারই লাল চোখ। আর পুরুষ সন্তানরা বাবার থেকে তো X (সাদা চোখের জিন সহ) পায়ইনি কাজেই সেখানেও (XY) সবারই লাল চোখ।

দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটি ভিন্ন। সেক্ষেত্রে সব মা'দের XX এর মধ্যে একটি এসেছিল তাদের মিউট্যান্ট বাবা থেকে সাদা চোখের জিন কপি নিয়ে। সেই মা'য়েরা যখন দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদেরকে X দেবে তার মধ্য অর্ধেক হবে ওই সাদা চোখের X, বাকি অর্ধেক ওদের মায়ের থেকে পাওয়া লাল চোখের X দেবে। মায়ের লাল চোখের X পাওয়া সব সন্তানের চোখ লাল হবে। সাদা চোখের X পাওয়া অর্ধেক সন্তানদের মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক হবে স্ত্রী যার অন্য X টি এসেছে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাবা থেকে যেখানে সাদা চোখের কোন X ছিলনা। এটির কারণে এবং লালই মুখ্য কপি হওয়াতে

এদের চোখ লাল। বাকি অর্ধেক যারা পুরুষ তারা বাবা থেকে Y পেয়েছে, কাজেই মায়ের সাদা চোখের X টিই তাদের এক মাত্র X। সেটি সাদা চোখ হিসেবে প্রকাশিত হবে। এভাবে শুধু এই অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ সন্তান সাদা চোখের হবে এবং তারা সবাই পুরুষ হবে। মরগ্যান ঠিক তাই পেয়েছিলেন। কাজেই মরগ্যান যে ধরে নিয়েছেন চোখের রঙের জিন X ক্রোমোজোমে থাকে এবং এতে চোখের লাল রঙ হওয়াটাই মুখ্য– তা একেবারে সঠিক বলে প্রমাণিত হলো। অর্থাৎ কিনা শুধু লিঙ্গের বৈশিষ্ট নয়, চোখের রঙের বৈশিষ্টের জিনও পাওয়া যাচ্ছে ক্রোমোজোমে। অন্য বৈশিষ্টের ওপরও একই রকম আরো পরীক্ষার মধ্যে মরগ্যান ও তাঁর সহকর্মীরা নিশ্চিত হলেন যে জিনের অবস্থান হলো ক্রোমোজোমে। জিন কী তা এখনো জানা না গেলেও, জিন কোথায় আছে তা এভাবে জেনে গিয়ে বংশগতির বাকি রহস্য উদ্ভাবনের কাজটি অনেক বেশি সম্ভব হয়ে এলো।

বিভিন্ন বৈশিষ্টের ওপর ওই নানা পরীক্ষা সম্ভব হলো মাছির নানা মিউট্যান্ট নিয়ে কাজ করতে পারার সুবাদে। ইতোমধ্যে সাদা চোখ মিউট্যান্ট পাওয়া ছাড়াও স্বাভাবিক সোজা ডানার বদলে বাঁকা ডানা, স্বাভাবিক আকারের ডানার বদলে ক্ষুদ্র ডানা, স্বাভাবিক খয়েরি রঙের দেহের বদলে হলুদ দেহ, ইত্যাদি মিউট্যান্ট সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিলো। এদের কোন কোন দুটি বা তিনটি মিউট্যান্ট বৈশিষ্ট একই সঙ্গে একই মাছির মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে যেমন একই মাছি সাদা চোখ, ক্ষুদ্র ডানা আর হলুদ দেহ বিশিষ্ট হওয়া। এ ধরনের ব্যাপার কিন্তু মেন্ডেলের স্বাধীন জিনের ব্যতিক্রমটাই তুলে ধরে। যেমন সাদা চোখ হওয়া আর পুরুষ হওয়ার দুটি বৈশিষ্ট পরস্পর নির্ভরশীল হতে আমরা দেখেছি, এখানেও একই ধরনের ব্যতিক্রম। প্রথম ক্ষেত্রে মরগ্যান যেমন ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন যে পুরুষ হওয়ার জিন আর চোখের রঙের জিন একই ক্রোমোজোম-জোড়ায় (লিঙ্গ-নির্ধারণী ক্রোমোজোম) থাকার কারণে এদুটি এক সঙ্গে যায়, বাকিগুলোও সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। দেখা গেল একই মাছিতে কয়েকটি বৈশিষ্ট এক সঙ্গে যাচ্ছে এগুলোর জিন শুধু একই ক্রোমোজোম জোড়ায় থাকার কারণে নয়, সেখানে পরস্পরের কাছাকাছি

থাকার জন্য। বিশেষ বিশেষ জিনের অবস্থান তিনি আরো ভাল ভাবে জেনে গেলেন।

নানা জিনের মানচিত্র

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা কোন জীবের দুটি বৈশিষ্টকে যখন এক সঙ্গে বিবেচনা করি, তখন এদের জিন হয়তো ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোম জোড়ায় থাকে, অথবা একটায় থাকলেও পরস্পর এত দূরে থাকে যে ক্রোমোজোমের ভাঙ্গাগড়ায় (যা একটু পরেই দেখছি) একসঙ্গে যায় না। ফলে ওদের ক্ষেত্রে একই সন্তানের ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট একই ভাবে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। মেন্ডেলের 'প্রত্যেক জিন পরস্পর স্বাধীন' ওই মূল নীতিটি এখানে তাই বেশ খেটে যায়। কিন্তু মরগ্যান এর ব্যতিক্রমগুলো দেখাতে পারলেন, কেন এরা ব্যতিক্রম তাও ব্যাখ্যা করতে পারলেন। এই ব্যাখ্যা থেকে তিনি জিনের অবস্থান নিয়ে আরো সুনির্দিষ্ট করে অনেক কিছু জানতে পারলেন।

একটি উপমা দিলে ক্রোমোজোমের ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাবে। মনে করি একটি স্কুলের চারটি ক্লাসের ছাত্ররা মিউজিয়াম দেখতে গেছে– চার ক্লাস চার দলে বিভক্ত হয়ে। প্রত্যেক ক্লাসকে আবার দুই ভাগ করে দুটি সারি করা হয়েছে এক এক জন শিক্ষকের নেতৃত্বে, যদিও একই ক্লাসের দুই সারি সব সময় এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকে। একে মাছির চারটি ক্রোমোজোম-জোড়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। মনে করি মাঝে মাঝে শিক্ষক দু'জন তাঁদের ক্লাসের দুই সারি ছাত্র নিয়ে এক অদ্ভুত কাজ করছেন। দুই সারিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে যার যার সারির মধ্যে ইচ্ছেমত যে কোন একটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছেন এবং সেখানটিতে সারিটিকে ভেঙ্গে ফেলছেন। আবার তাঁরা যার যার ভাঙ্গা সারির এক অংশকে হুবহু ওই ভাবে রেখে অন্য শিক্ষকের সারিতে দিয়ে দিচ্ছেন এবং বিনিময়ে ওই শিক্ষকের সারির ইচ্ছেমত একটি অংশকে নিজের সারিতে নিয়ে আসছেন। এর মানে ভাঙ্গার পর দুই সারির মধ্যে অংশ বিনিময় করা হচ্ছে– যাকে বলা যায় 'ক্রসিং ওভার'। এভাবে বার বার দুই সারিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকবার নতুন

জায়গায় ভাঙ্গা হয় আর অংশ বিনিময় করা হয়। এতে ছাত্রদের কে যে কখন কোন সারিতে কোথায় যাচ্ছে তার কোন হদিশ থাকে না।

তবে কোন সারিতে দুই বন্ধু যদি একদম পাশাপাশি থাকে তা হলে তারা একজন আরেকজনকে অন্য সারিতে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। সে রকম হারানোর ঘটনা ঘটবে একমাত্র যদি দুই বন্ধুর ঠিক মাঝখানটাতে সারি ভাঙ্গা হয়, অন্য যে কোন জায়গায় ভাঙ্গলে তারা একত্রে থাকবে। কিন্তু যেই দুই বন্ধু সারিতে পরস্পর থেকে কিছুটা দূরে আছে তাহলে তাদের দুজনের মাঝখানে সারি ভাঙ্গার সম্ভাবনা বেশি, তাই বন্ধুকে হারাবার সম্ভাবনাও বেশি। যদি দুই বন্ধুর এক জন সারির এই প্রান্তে আর অন্য জন আরেক প্রান্তে থাকে, তা হলে যেখানেই সারি ভাঙ্গুক বন্ধু দু'জন বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনা শতভাগ। অর্থাৎ ভাঙ্গার ও বিনিময়ের পরও দু'জনের এক সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা নির্ভর করে তারা সারিতে পরস্পর থেকে কত দূরে আছে তার ওপর।

শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ তৈরির সময় ক্রোমোজোমে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটে– যাকে বলা মেইয়োসিস। যে সাধারণ কোষ থেকে শুক্র ও ডিম্ব তৈরি হয় তাতে প্রত্যেক ক্রোমোজোম-জোড়ার দুই সদস্য পরস্পর মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে প্রত্যেকটি একেবারে লটারির মত ইতস্ততভাবে এক জায়গায় ভেঙ্গে যায় এবং ভাঙ্গা অংশের পরস্পর বিনিময় ঘটে। এটিকে বলা হয় ক্রোমোজোমের ক্রসিং ওভার। এটি বারবার হতে থাকে। ফলে মরগ্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী ক্রোমোজোমে যদি জিনগুলো থাকে (ওই সারির ছাত্রদের মত), সেগুলো তাসের বান্ডিল থেকে তাস শাফল করে বন্টন করার মত দুই ক্রোমোজোমে ইতস্তত ভাগ হয়ে যায়। লটারির মত বন্টন বলে এক এক শুক্রকোষে বন্টন এক এক রকম হয়। আবার জোড়ার দুই ক্রোমোজোমের একটিই শুধু দৈবচয়নে এই শুক্রকোষ বা ওই শুক্রকোষে যে কোনটিতে যায়। এভাবে বাবার একটি শুক্রকোষের একটি ক্রোমোজোমে যেই জিনের যেই কপি যাচ্ছে, অন্য শুক্রকোষে সেখানে ঠিক সেগুলো যাচ্ছেনা, অন্যগুলো যাচ্ছে। একই ঘটনা মায়ের বিভিন্ন ডিম্বকোষে ঘটছে। কাজেই সব সন্তান

বাবা-মার সব বৈশিষ্ট এক ভাবে পাচ্ছেনা; প্রত্যেক প্রজন্মেই নানা বৈচিত্র সৃষ্টি হচ্ছে।

তবে সেই স্কুলের ছাত্রদের সারির দুই বন্ধুর মত ক্রোমোজোমে দুটি জিন যদি একেবারে পাশাপাশি থাকে তা হলে এত ভাঙ্গা-গড়ার পরও তা একই সন্তানে এক সঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি, অর্থাৎ ওই দুই জিনের সৃষ্ট বৈশিষ্টগুলো ওই সন্তানের মধ্যে এক সঙ্গে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। জিন দুটি ক্রোমোজোমের মধ্যে পরস্পর যত দূরে থাকবে এক সঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনা ততই কমে যাবে। কাজেই মাছির ক্ষেত্রে হাজারো সন্তানের মধ্যে যে দুটি বৈশিষ্ট আমরা সব চেয়ে বেশি সংখ্যক সন্তানে এক সঙ্গে দেখবো বলতে পারি ক্রোমোজোমে এদের জিন পাশাপাশি আছে। তার চেয়ে একটু কম সংখ্যক সন্তানের মধ্যে যে দুটি এক সঙ্গে পাব বুঝবো তাদের জিন পরস্পরের সামান্য দূরে থাকবে। এমনি করে আরো কমগুলো আরো একটু দূরে। এই ভাবে মরগ্যান জানা সবগুলো বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে একটি ক্রম তৈরি করে ফেল্‌লেন; কোন্‌গুলো একসঙ্গে কতজনের মধ্যে দেখা গেছে তার ক্রম অনুযায়ী। এবার তিনি ক্রোমোজোমের নক্‌শার ওপর বৈশিষ্টগুলোর জিনকে ঠিক এই ক্রমে চিহ্নিত করে নিলেন– যেই বৈশিষ্ট এক সঙ্গে সব চেয়ে বেশি দেখা যায় তাদেরকে পাশাপাশি রেখে এবং অন্যগুলোকে ওই অনুপাতে দূরে রেখে। এই ভাবে মরগ্যান ও সহকর্মীরা মাছির নানা জিনের একটি ম্যাপই এঁকে ফেলতে পারলেন। এই ম্যাপে ক্রোমোজোমের ছবি যেন একটি পুঁতির মালার মত একের পর এক গাঁথা, প্রত্যেকটি পুঁতি হলো এক একটি জিন। কোন্‌ ক্রোমোজোমে জিনগুলো কার পর কে থাকে অন্তত তা ম্যাপ থেকে জানা গেল। এভাবে মরগ্যান ও সহকর্মীরা মাছির ক্ষেত্রে যা করলেন অন্যরা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে তা করে জিনের ঠিকানা ও আচরণ সম্পর্কে অনেক কিছু উদ্ঘাটন করতে পারলেন। কিন্তু তারপরও জিন যে আসলে কী তাই জানা গেলনা। সেটিই রয়ে গেল সবচেয়ে বড় রহস্য।

বোঝা গেল ডিএনএই সেই জিন

জিন যদি ক্রোমোজোমে থাকে তা হলে ক্রোমোজোমে পাওয়া যায় এমন জিনিসকেই জিন হতে হবে। ইতোমধ্যে জৈব-রসায়নবিদরা আবিষ্কার করেছেন যে ক্রোমোজোমে প্রোটিন, ডিএনএ, এবং আরএনএ এই তিন রকমের রাসায়নিক পদার্থ আছে। কাজেই এই তিনটির একটিরই জিন হবার কথা। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল এটি প্রোটিন হবার সম্ভাবনাই বেশি। প্রোটিনের অণু অপেক্ষাকৃত অনেক বড়; এর গঠন ও আকৃতির জটিলতা বেশি। বিশ রকমের এমাইনো এসিডের কোন কোনটি নিয়ে নানা সংখ্যায় ও নানা ক্রমে এর মৌলিক গঠন। এসব কারণে এর অসংখ্য রূপ হতে পারে এবং তাই অসংখ্য রকম বৈশিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করার মত বৈচিত্র এতে আছে– যতটা ডিএনএ বা আরএনএ'র নেই। কিন্তু চল্লিশের দশকে যুক্তরাষ্ট্রের রকফেলার ইনষ্টিটিউটে গবেষণারত বিজ্ঞানী অসওয়াল্ড অ্যাভেরি ও তাঁর সহকর্মীরা এই ব্যাপারে মন খোলা রাখলেন, পরীক্ষণের মাধ্যমেই নিষ্পত্তি করতে চেষ্টা করলেন জিন আসলে কী।

অ্যাভেরি কাজ করছিলেন ব্যাকটেরিয়া নিয়ে– যে রকম মেন্ডেল করেছিলেন মটরশুঁটি নিয়ে এবং মরগ্যান ফলের মাছি নিয়ে। এক প্রজন্মের থেকে আর একটি নতুন প্রজন্ম পেতে মাছির ক্ষেত্রে যেখানে দশ দিন সময় লাগে, সেখানে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বিশ মিনিটে তা পাওয়া যায়। তাই মরগ্যানের নীতি অনুসারে এক একটি ব্যাকটেরিয়ার স্পষ্ট কিছু বৈশিষ্টের জিনের ম্যাপ তৈরির কাজ অনেক বেশি দ্রুত সম্ভব হচ্ছিল। ১৯৪৪ সালে অ্যাভেরি নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টির ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করছিলেন। এই ব্যাকটেরিয়ার দুটি ভিন্ন রূপ তিনি দেখতে পেলেন। এর মধ্যে একটি রূপ দেখতে বেশ মসৃণদেহী। ল্যাবোরেটরিতে ইঁদুরের দেহে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দিলে ইঁদুরটি আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ধারণা করা হলো এক ধরনের 'সুগারের' আবরণ এর গা মসৃণ করে রাখে এবং ইঁদুরের দেহের প্রতিরক্ষাকে এড়িয়ে ওটিকে আক্রান্ত করতে সাহায্য করে। তাই এই মসৃণ রূপটিকে বলা যায় 'মারাত্মক রূপ'। অন্য রূপটির গা খসখসে, এটি ইঁদুরের দেহে ঢোকালে ইঁদুরের কোন ক্ষতি হয়না– একে বলা যায় 'নিরীহ রূপ'। অ্যাভেরি মারাত্মক

রূপের কিছু ব্যাকটেরিয়াকে অধিক উত্তাপের মধ্যে রেখে মেরে ফেল্‌লেন, তারপর এই মৃত ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেখলেন ইঁদুরের কোন ক্ষতি হয়না। পরের বার তিনি ওই মৃত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া এবং জীবিত নিরীহ ব্যাকটেরিয়া এক সঙ্গে মিশিয়ে ইঁদুরের দেহে ঢোকালে দেখা গেল ইঁদুর মরে যাচ্ছে। এসময় এই ইঁদুরগুলোর রক্ত নিয়ে তাতে জীবিত মসৃণ মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গেল। এটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। মৃত ব্যাকটেরিয়া তো আবার জীবিত হতে পারেনা। অ্যাভেরির সিদ্ধান্ত হলো কোন এক ভাবে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়ার মৃতদেহ থেকে কোন জিনিস গিয়ে সঙ্গের নিরীহ খসখসে ব্যাকটেরিয়াকেই মসৃণ মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াতে পরিণত করেছে। কিন্তু কী সেই জিনিস যা একটি ব্যাকটেরিয়ার বৈশিষ্ট বদলে দিতে পারে। সেটিই তো মৃত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়ার দেহের মারাত্মক হবার জিন, যেই জিনটি নিরীহ ব্যাকটেরিয়াকে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াতে পরিণত করতে পারে। মৃত ব্যাকটেরিয়ার কোন্‌ অংশ গিয়ে এই কাজ করতে পেরেছে তা জানতে পারলেই ধরা পড়বে জিন কী।

কিন্তু তার আগে অ্যাভেরি আর একটি সন্দেহ নিরসন করলেন। মৃত ব্যাকটেরিয়ার গায়ের সুগার আবরণটি খসখসে ব্যাকটেরিয়ার গায়ে লেগে গিয়ে তাকে মারাত্মকে পরিণত করেনি তো? তাই তিনি মৃত মারাত্মককে নিরীহের সঙ্গে ইঁদুরের দেহে ঢুকাবার আগে সেই মৃত মারাত্মকের সঙ্গে সুগার ধ্বংসকারী একটি এনজাইম মিশিয়ে সুগার আবরণকে দূর করলেন। কিন্তু ঘটনা আগের মতই ঘটলো। বোঝা গেল সুগারের কারণে ব্যাকটেরিয়া রূপ বদলায়নি।

পরের বার অ্যাভেরি আগে মৃত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াকে প্রোটিন ভেঙ্গে ফেলার এনজাইমের সঙ্গে মিশিয়ে এর সমস্ত প্রোটিন নষ্ট করে ফেল্‌লেন। তারপরেই তা নিরীহ ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে ইঁদুরের দেহে দিলেন। এবারও ফলাফল অপরিবর্তিত, আগের মতই নিরীহ ব্যাকটেরিয়া হয়ে গেল মারাত্মক, ইঁদুর যথারীতি মরে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল যা নিরীহ ব্যাকটেরিয়াকে নতুন বৈশিষ্ট দিয়েছে তা প্রোটিন নয়, অতএব জিন জিনিসটি প্রোটিন নয়, অন্য কিছু। সেই অন্য কিছু তাহলে হতে পারে ডিএনএ অথবা আরএনএ, যে দুটির

গঠনে অনেক মিল, থাকেও কাছাকাছি। তাই অ্যাভেরি প্রথমে মৃত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়ার দেহ থেকে এলকোহলের সাহায্যে ডিএনএ এবং আরএনএ'কে বের করে আনলেন। এর মধ্য থেকে আরএনএ ধ্বংসকারী এনজাইম দিয়ে আরএনএকে সম্পূর্ণ দূর করলেন। যা রইলো তা শুধুই ওই মৃত ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ। এবার এই ডিএনএ এবং জীবিত নিরীহ ব্যাকটেরিয়া ইঁদুরের দেহে ঢুকিয়ে দেখলেন ফলাফল আগের মতই রইলো, যা সব সময় হয়েছে তাই হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়া বদলে যাচ্ছে, ইঁদুর মরছে। তা হলে আরএনএ জিন নয়।

একদম শেষে ওই মৃত ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ - আরএনএ মিশ্রণ থেকে এবার ডিএনএ ধ্বংসকারী এনজাইম দিয়ে ডিএনএ সম্পূর্ণ নষ্ট করে শুধু বাকি থাকা আরএনএ জীবিত নিরীহের সঙ্গে ইঁদুরে দেহে ঢোকানো হলো। এবার ফলাফল বদলে গেল। ইঁদুর মরলোনা, তার রক্তে কোন জীবিত মারাত্মক ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পাওয়া গেলনা– কোন নিরীহই মারাত্মকে পরিণত হয়নি। এর মানে ডিএনএ যায়নি বলে বৈশিষ্ট পরিবর্তনের সেই জিনিস ওখানে যায়নি, কাজেই বৈশিষ্ট পরিবর্তন হয়নি। স্পষ্ট বোঝা গেল অন্য কিছু নয়, ডিএনএই জিন। মেন্ডেলের পরীক্ষার মাধ্যমে জিনের অস্থিত্ব বুঝতে পারার প্রায় আশি বছর পর অধরা জিন শেষ পর্যন্ত ধরা দিল ডিএনএ রূপে। এর কয়েক বছরের মধ্যে আরো সরাসরি পরীক্ষায় অ্যাভেরির এই বিরাট আবিষ্কারের যথার্থতা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়ে গেল। ডিএনএই জীবের সব বৈশিষ্টকে কোন এক উপায়ে তার মধ্যে ধারণ করছে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই ডিএনএ'কে ভাল করে জানতে হবে।

ডিএনএ'র গঠন ও কাজের ধারা উদ্ঘাটন

জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকা ডিএনএ ও আরএনএ এই দুই জিনিস ১৮৬৯ সাল থেকেই রসায়নবিদদের কাছে পরিচিত। এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট এসিডধর্মী হওয়াতে এবং নিউক্লিয়াসে থাকার কারণে এই দুইটিকে তাঁরা বলেন নিউক্লিক এসিড। খুব কাছাকাছি রাসায়নিক গুণ সম্পন্ন ওই দুইয়ের তাঁরা পুরো নাম দিয়েছেন ডি-অক্সিরিবো নিউক্লিক এসিড বা আদ্যাক্ষরে ডিএনএ; এবং রিবো নিউক্লিক এসিড বা আদ্যাক্ষরে আরএনএ। রিবোজ

নামের সুগার ডিএনএ এবং আরএনএ'র মধ্যে দুই রাসায়নিক গঠনে আছে বলেই এই নাম। সেই ১৮৬৯ থেকে ১৯৪০ এর দশক পর্যন্ত বহু রসায়নবিদের বিস্তর গবেষণার ফলে ডিএনএ'র রাসায়নিক গঠন মোটামুটি উদ্ঘাটিত হয়েই ছিল। বোঝা গেছে এর নিউক্লিয়োটিড নামে ছোট ছোট একক অংশগুলোর পরস্পর সংযোগে এটি একটি খুবই দীর্ঘ অণু। অণুর যে মূল অংশ তাতে ওই সুগারের সঙ্গে ফসফরাস মিশে তা সুগার ফসফেট হিসেবে থাকে– প্রত্যেক নিউক্লিয়োটিডে। আর তার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে একটি অন্য রকম অংশ যা চার বিভিন্ন রকমের থেকে যে কোন একটি হতে পারে প্রতি নিউক্লিয়োটিডে। এগুলোকে বলা হয় বেইস। চার রকমের বেইসের পুরো নাম হলো অ্যাডেনিন, থায়ামিন, সাইটোসিন ও গুয়ানিন। কিন্তু এরা এদের যার যার আদ্যাক্ষর হিসেবেই বেশি পরিচিত A,T,C এবং G । এরপর থেকে আমরা এদেরকে তাদের এই সংক্ষিপ্ত নামেই ডাকবো।

একটি নিউক্লিয়োটিডের সঙ্গে আরেকটি রাসায়নিক ভাবে সংযুক্ত হয়ে কীভাবে দীর্ঘ ডিএনএ অণু গড়ে ওঠে সেই বিষয়টিও সমাধান হলো ১৯৫২ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার টড ও ড্যান ব্রাউনের আবিষ্কারে। দেখা গেলো নিউক্লিয়োটিডের সুগার ফসফেট অংশটি বার বার পুনরাবৃত্ত হয়ে পুরো অণুর একটি মেরুদন্ডের মতো গঠিত হয়। আর বেইস অংশটি প্রতি নিউক্লিয়েটিডে এক এক করে ওই মেরুদন্ড থেকে ঝুলতে থাকে। পুরো অণুতে তাই এরকম নানা বেইস একে পর এক থাকে– চার রকমের যে কোনটি। প্রায় এই সময় অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী এরউইন শ্রাগ্রাফ আরো একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেন। তা হলো যে কোন জীবের যে কোন ডিএনএতে A এর পরিমাণ T এর ঠিক সমান হয়, এবং C এর পরিমাণ G ঠিক ঠিক সমান হয়। শ্রাগ্রাফ নীতি নামে পরিচিত এই বিষয়টি পরে ডিএনএ'র ত্রিমাত্রিক গঠন আবিষ্কারে অত্যন্ত মূল ভূমিকা পালন করেছে।

অনেক রাসায়নিক পদার্থের অণুর প্রকৃত গঠন এবং তার কাজ বুঝতে শুধু এর রাসায়নিক পরিস্থিতি জানা যথেষ্ট নয়। এতে শুধু পরমাণুতে পরমাণুতে বন্ধনে কীভাবে অণুটি গড়ে ওঠেছে তা জানা যায়, এর রাসায়নিক চরিত্র বোঝা যায়। কিন্তু স্থানের তিন মাত্রায়– সামনাসামনি, পাশাপাশি, ওপরে-নিচে –অণুটি

কেমন আকৃতি নিয়ে দাঁড়ায় সেটি না জানা পর্যন্ত অণুটির আসল গঠনও বোঝা যায় না, কাজও বোঝা যায়না। বিশেষ করে বড় বড় জৈব অণুর ক্ষেত্রে কথাটি খুবই সত্য, যেমন প্রোটিনের ক্ষেত্রে। ডিএনএ'র এই প্রকৃত ত্রিমাত্রিক গঠন আবিষ্কারটিই এখন সব চেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়ালো, কারণ তা হলেই হয়তো বোঝা যাবে ডিএনএ জিন হিসেবে কীভাবে কাজ করে। প্রাপ্ত রাসায়নিক চরিত্র বজায় রেখেই ডিএনএ'র অসংখ্য রকমের ত্রিমাত্রিক গঠন সম্ভব হতে পারে; এর মধ্য থেকে আসলটি উদ্ঘাটন করা অত্যন্ত দুরূহ একটি কাজ। এ ধরনের কাজের প্রধান সহায়টি আসে পদার্থবিদ্যা থেকে। কৃষ্টাল অর্থাৎ কেলাসিত অবস্থায় এর গঠনের নানা পরমাণু-স্তর থেকে এক্সরে বিক্ষিপ্ত হয়ে এবং বিক্ষিপ্ত এক্সরে রশ্মি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে যে 'ছবি' তৈরি করে সেই ছবির সূক্ষ্ম গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে অণুটির মূল গঠনটি আন্দাজ করা যায়– এ পদ্ধতিকে বলা হয় এক্সরে ড্রিফ্যাকশন পদ্ধতি। আর উদ্ঘাটনের বাকিটুকু আসতে পারে এর মধ্যে রসায়নের ও পদার্থবিদ্যার নানা খুঁটিনাটি পরিমাপ, সিদ্ধান্ত ও আন্দাজ থেকে এবং কিছুটা ভাগ্যের জোরেও বটে।

সেই অত্যন্ত কঠিন কাজটি সম্পাদন করে ডিএনএ'র গঠনটি ১৯৫৩ সালে উদ্ঘাটন করেছেন প্রধানত দু'জন বিজ্ঞানী ক্যাম্ব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবোরেটরিতে এক সঙ্গে কাজ করে। তাঁদের একজন একবারে তরুণ আমেরিকান জীববিজ্ঞানী জেমস ওয়াটসন, কিছুদিন আগেও যিনি ছাত্র ছিলেন। অন্যজন কিছুটা বয়োজৈষ্ঠ কিন্তু এখনো ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করছেন এমন পদার্থবিদ ফ্রান্সিস ক্রিক। তাঁরা অবশ্য অন্য বেশ ক'জন বিজ্ঞানীর থেকে এমন সব তথ্য ও পরামর্শ পেয়েছিলেন যা এ কাজে খুবই সহায়ক হয়েছে। যেমন তাঁরা ডিএনএ'র যে এক্সরে ডিফ্র্যাকশন ছবি দেখে এবং ওগুলোর বিশ্লেষণের ফলাফলের কথা শুনে গঠনটি অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন সেগুলো ছিল এ কাজের অত্যন্ত পারদর্শী একজন পদার্থবিদ লন্ডনে কিংস কলেজের মহিলা বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্কলিন রোজালিন্ডের। ওদিকে একজন অত্যন্ত বিখ্যাত ও প্রবীণ আমেরিকান রসায়নবিদ লিনাস পলিঙ ডিএনএ'র গঠন আবিষ্কারের চেষ্টা এসময় করছিলেন। প্রোটিনের গঠন

আবিষ্কারে তাঁর অবদান পলিঙের কীর্তিগুলোর অন্যতম। এক্ষেত্রে তিনি ওয়াটসন ও ক্রিকের আগেই ডিএনএর একটি গঠন প্রস্তাব করেছিলেন, পরে সেটি ভুল প্রমাণিত হওয়াটিও শেষোক্তদের জন্য বিকল্প খোঁজায় কিছু সহায়ক হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত দৈবাৎ নিজেদের হাতে আসা রোজালিন্ডের এক্সরে ডিফ্রাকশন ছবি থেকে ইঙ্গিত, অত্যন্ত লাগসই আন্দাজ, স্বয়ং শ্রাগ্রাফ এসে শ্রাগ্রাফের নীতির দিকে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ, ইত্যাদি বেশ কাজে এসেছে। তাঁদের একটি মজার কৌশল– কার্ডবোর্ড এবং ধাতব পাত ইত্যাদি কেটে কেটে ত্রিমাত্রিক মডেল বানিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছু তথ্যের সঙ্গে ফিট না করে ততক্ষণ সেই মডেলের পরিবর্তন করে যাওয়া – সেটিও খুব বড় ভূমিকা রেখেছে। তাঁরা সেই অসাধ্য সাধন করেছিলেন, ডিএনএ'র শুদ্ধ গঠন উদ্ঘাটন করেছিলেন। জিন হিসেবে কাজ করার মাধ্যমে সব জীবের জীবনরহস্য ধারণের ব্যাখ্যা এই গঠন উদ্ঘাটন ছাড়া পাওয়া সম্ভব ছিলনা। তাই একে শতাব্দীর একটি সেরা আবিষ্কার বলে গণ্য করা হয়। অথচ এটি সম্ভব করেছেন দু'জন খুবই প্রতিভাবান কিন্তু কম অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী, খুবই অপ্রচলিত ভঙ্গিতে কাজ করে।

এভাবে উদ্ঘাটিত ডিএনএ'র গঠনটিকে দেখা যাক। মূলত এটি হলো দুইটি সুগার ফসফেট মেরুদণ্ডের পরস্পরকে ঘিরে প্যাঁচানো দুটি হেলিক্স আকৃতির মূল কাঠামো– যেজন্য একে ডাবল হেলিক্স বলা হয়। হেলিক্স মানেই হলো সর্পিল আকৃতির জিনিস– খাতার স্পাইরাল বাইন্ডিঙে অথবা প্যাঁচানো সিড়িতে আমরা যা দেখি। এই ডাবল হেলিক্স দুটি পৃথক সূত্র সর্পিল ভাবে পাশাপাশি থেকে ক্রমাগত বিস্তৃত হয়েছে খুবই লম্বা এক অণুতে। সূত্র দুটির প্রান্ত দুটি অবশ্য পরস্পর বিপরীত দিকে। প্রত্যেক সূত্রের প্রত্যেক এককে অর্থাৎ প্রত্যেক নিউক্লিয়োটিডে রিবোজ অংশের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে একটি বেইস– ওই A,T,C, G এর যে কোন একটি। এর প্রত্যেকটি পার্শ্ববর্তী অন্য সূত্রে নিউক্লিয়োটিডে সংলগ্ন বেইসটির সঙ্গে দুর্বল বন্ধনে হালকা ভাবে সংযুক্ত থাকে। এই যে বেইস-জোড়া এদের অবস্থান ওই প্যাঁচানো দুই সূত্রের ভেতরের দিকে উভয়ের মাঝে যেটুকু খালি জায়গা আছে তার মধ্যে। দেখা

যায় A ও T এর প্রস্থ যোগ করলে যেটুকু জায়গা লাগে তাতে A ও T জোড়া বাঁধলে জোড়াটি ওই জায়গাটুকুর মধ্যে ঠিক সঙ্কুলান হয়ে যায়। অন্যদিকে C ও G জোড়া বাঁধলে তাও সঙ্কুলান হয়ে যায়। অন্য কোন ভাবে জোড় বাঁধলে ওভাবে সঙ্কুলান হবেনা। কাজেই এক সূত্রে বেইস যেখানে A অন্য সূত্রে বেইস সেখানে অবশ্যই T, উল্‌টো করে প্রথমটিতে T হলে দ্বিতীয়টিতে A। বলা যায় A ও T পরস্পর সম্পূরক। ফলে পুরো ডিএনএ তে A এর পরিমাণ যত হবে T এর পরিমাণ ততই হবে – একই ভাবে C এর পরিমাণ যত G এর পরিমাণও তত হবে। শাগ্রাফের এই নীতি তাই এই গঠনে পৌঁছতে খুব সাহায্য করেছে– কারণ শাগ্রাফ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন। ঠিক একই ভাবে C ও G পরস্পর সম্পূরক – একদিকে C বলে হলে অব্যদিকে G অথবা G হলে অপর দিকে C। প্রত্যেক জোড়ার মাঝখানের বন্ধন শিথিল বলে বিশেষ এনজাইমের কাজের মাধ্যমে এই বন্ধন ছিড়ে গিয়ে দুটি সূত্র আলাদা হয়ে যেতে পারে; আবার অন্য এনজাইমের সহায়তায় দুটি সূত্র জোড়া লেগে পূর্ণাঙ্গ ডিএনএ হয়ে যেতে পারে। পরে দেখবো এগুলো হতে পারা কত জরুরী।

ডিএনএর এই গঠনটা দেখা মাত্র সহজে স্পষ্ট হয় যে এটি কীভাবে জিন হিসেবে কাজ করে, অর্থাৎ জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করে। আমরা যদি আপাতত একটি সূত্রের দিকে মনোযোগ দিই আর তার শুরুর প্রান্ত থেকে শেষের প্রান্তের দিকে যাই বেইসগুলোকে প্রত্যেক নিউক্লিয়োটিডে একটি করে পর পর ক্রমান্বয়ে পাব। এর প্রত্যেকটি A,T,C, G এর যে কোনটি হতে পারে, যে কোনটির পর যে কোনটি আসতে পারে, কোনটি নিজেই পর পর একাধিকবার থাকতে পারে। বেইসগুলোর এই ক্রমটির মধ্যেই রয়েছে জিনের সেই বার্তা, ধরা রয়েছে জীবের জীবনরহস্য। প্রত্যেকের সব কোষে একই ডিএনএ থাকে। তাই বাবার শুক্রকোষের ডিএনএ এবং মায়ের ডিম্বকোষের ডিএনএ সন্তান পায়। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ডিএনএ’র একই রকম বার্তাগুলো সঞ্চারিত হয়, মাঝে মাঝে তাতে মিউট্যাশন বা পরিবর্তনও ঘটে।

পর পর কয়েকটি বেইস মিলে হয় একটি জিন অর্থাৎ একটি বৈশিষ্টের কোড বা প্রতিনিধি। এ যেন বেইসের ভাষায় বৈশিষ্টটি সৃষ্টির বার্তা লেখা। অন্য যে কোন ভাষার শব্দের মত এখানেও অক্ষরের ক্রমটিই বার্তাটি দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে অবশ্য মোট অক্ষরই মাত্র চারটি– A,T,C, G । বাংলায় ক, ম, ল এই তিনটি অক্ষর পর পর যদি 'কলম' এই ক্রমে বসাই তাতে যেই বার্তা যায়, ক্রম বদলিয়ে 'কমল' করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন বার্তা যায়– এও সেই রকম। ডিএনএর' ক্ষেত্রে এই বার্তার বিস্তারিত অর্থ কী, সেই অনুযায়ী কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হয়, বৈশিষ্টটি কীভাবে দেখা দেয়, সেগুলো আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। সব রহস্য কিন্তু ওই বেইসগুলোর ক্রমের মধ্যে– কার পরে কে আছে তার মধ্যে। মজার ব্যাপার হলো একটি সূত্রের বেইস-ক্রম জানা থাকলে অন্য সূত্রের বেইস-ক্রমও জানা হয়ে যায় কারণ প্রথমটির বেইসগুলোর সম্পূরক বেইস পর পর বসিয়ে গেলেই হলো। তবে বার্তা দেবার জন্য দুটির একটিকেই বেছে নেয়া হয় ওই প্রক্রিয়ার মধ্যেই, স্বয়ংক্রিয় ভাবে।

মরগ্যান আগেই দেখিয়েছিলেন যে ডিএনএ ক্রোমোজোমে থাকে। আসলে দীর্ঘ সূতা যেমন করে লাটাইয়ে বা বান্ডিলে গুটানো থাকে দীর্ঘ ডিএনএ অণু তেমনি ভাবে এক একটি ক্রোমোজোমে গুটানো থাকে। ক্রোমোজোমের মধ্যেই ডিএনএ'র বিভিন্ন অংশে থাকা বিভিন্ন জিনগুলো চিহ্নিত করা যায়। মরগ্যান তো সেটি যে ডিএনএ তা জানার আগেই ম্যাপিঙের মাধ্যমে কিছুটা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। ওই ম্যাপে তিনি ক্রোমোজোমকে মালা আর তাতে জিনগুলোকে পর পর পুঁতির মত যে কল্পনা করেছিলেন সেটি একটি চমৎকার আন্দাজ ছিল। অণুবীক্ষণে ক্রোমোজোম দেখা যায়, কিন্তু ওর মধ্যে অনেক ভাঁজ হয়ে যে ডিএনএ'র অণুটি থাকে তা যে কোন অণুর মত এত ক্ষুদ্র যে কখনো দেখা সম্ভব নয়। ডিএনএ'র গঠন সম্পর্কে যত কিছু বলা হলো তার কিছুই দেখে জানা সম্ভব নয়, পরোক্ষ ভাবেই তাকে উদ্ঘাটন করতে হয়েছে অন্য যে কোন অণুর মত– যেমন পানির অণুর গঠন। কিন্তু কোন জীবের অসংখ্য কোষ থেকে ডিএনএ নিয়ে তা এক সঙ্গে এক জায়গায়

রাখলে সামগ্রিকভাবে ডিএনএ আমরা এমনিতেই দেখতে পারি– যেমন পানির অণু না দেখলেও পানি দেখি।

এই অর্থে যদি আমি নিজের ডিএনএ দেখতে চাই তা হলে রক্ত অথবা মুখের ভেতরের ঝিল্লিতে তুলা ঘষে নিয়ে, অথবা শরীরের অন্য যে কোন জায়গা থেকে কিছু নমুনা নিতে হবে। ওই সামান্য নমুনাতেও অনেক কোষ পাওয়া যাবে, এগুলোর প্রত্যেকটিতে ডিএনএ রয়েছে কোষের অন্যান্য সব উপাদানের সঙ্গে মিশে। অ্যাভেরি যেমন করে এনজাইম, এলকোহল ইত্যাদি প্রয়োগ করে প্রোটিন ধ্বংস করে, আরএনএ ধ্বংস করে শুধু ডিএনএ আলাদা করে নিয়েছিলেন, আমরাও সেভাবে কোষ দেয়াল থেকে শুরু করে অন্যান্য সব জিনিস রাসায়নিক ভাবে ভেঙ্গে বের করে ফেলে শুধু ডিএনএটুকু টেষ্ট টিউবে নিতে পারি। ওখানে যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে আজকাল সহজে ডিএনএ'র অসংখ্য প্রতিলিপি তৈরি করে নেয়া যায়। তখন টেষ্ট টিউবে রাখা ডিএনএ ঠিক দেখতে পাবো– দেখতে সাদা সাদা দলা বা প্যাজা তুলার মত। ভাবতে অবাক লাগে ওই জিনিসটার মধ্যে লেখা রয়েছে আমার জীবনরহস্য, আমার আত্ম-পরিচয়ের অনেকখানি। শুধু আমার চেহারার বা শরীরের নয়, আমার মনের ও আমার চিন্তার। সেই পরিচিতি উদ্ধারের কাজ এর থেকে কীভাবে হয়, কতখানি পরিচিতি সেখানে রয়েছে, কতখানি তার বাইরে রয়েছে, সেসব খানিকটা বোঝার জন্যই এই বইয়ের আয়োজন।

বিবর্তন ও ডিএনএ'র সহজ পাঠ

জীব-বিবর্তন কীভাবে বোঝা গেল

একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিঃসন্দেহ হতে শুরু করেছিলেন যে পৃথিবীর যাবতীয় জীবগুলোর প্রত্যেকটিকে এখন যেভাবে দেখি অতীতে সব সময় সেটি তা ছিলনা। শুধু তাই নয় সুদূর অতীতে এগুলো ধীরে ধীরে অন্য জীব থেকে রূপান্তরিত হয়ে এই জীবে পরিণত হয়েছে। এরকম চিন্তা কিন্তু তাঁদের জন্য খুব সুখকর ছিলনা। কারণ এর জন্য তাঁদেরকে নিজেদের দীর্ঘকালীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সে বিশ্বাস ছিল প্রত্যেকটি জীব আলাদা ভাবে ওই জীবের মত করেই সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই জীবের সকল বৈশিষ্ট একেবারেই তার নিজস্ব ও চিরন্তন। এই বিশ্বাস পরিবর্তনের পেছনে বহু রকম বৈজ্ঞানিক কারণ ছিল যে সব কারণ বছরের পর বছর জমা হয়ে তাঁদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিলো।

ওই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই প্রধানত সুইডিশ বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াসের চমৎকার কাজের ফলে সকল জীবকে পরস্পর সাদৃশ্যের নিরিখে শ্রেণীবিন্যাসের কাজটি একটি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো। এর ফলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে সদৃশ দলের নানা জীবের মধ্যে অদ্ভুত রকম মিল রয়েছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ স্তন্যপায়ীদেরকে যদি নেয়া হয়– সব স্তন্যপায়ী এমনকি ইঁদুর, বাদুড়, তিমি ও মানুষের মত একেবারেই ভিন্ন জগতের স্তন্যপায়ীদের পারস্পরিক মিল লক্ষ্যণীয়। শুধু গর্ভধারণ ও স্তন্যপানের ক্ষেত্রে নয় মস্তিষ্কের গঠন ও জটিলতা, উষ্ণ রক্ত ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয়ে তাদের অদ্ভুত মিল রয়েছে। আবার শ্রেণীবিন্যাসে যে সব বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দূরত্ব যত বেশি তাদের মধ্যে মিলও তত কম। তাই স্তন্যপায়ীর সঙ্গে সরীসৃপের মিল যত কম, মাছের সঙ্গে মিল তার চেয়েও কম, পতঙ্গের সঙ্গে মিল আরো অনেক কম, উদ্ভিদের

সঙ্গে তো একেবারেই। কিন্তু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে যত দূরেই হোক সব জীবের মধ্যে কিছু অপরিহার্য মিল থেকেই যায়।

শ্রেণীবিন্যাসে যারা একেবারে একই জীব তাদের সবাইকে একই স্পেসিস বা প্রজাতিভুক্ত করা হলো। একই প্রজাতি হবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো ওরা নিজেদের মধ্যে প্রজনন করে সন্তান দিতে পারে এবং সেই সন্তানরাও আবার সন্তান দিতে পারে। তা যদি না হয় তা হলে দুটি জীব অনেক মিল সত্ত্বেও একই স্পেসিস নয়, তবে একই জেনাস হতে পারে যা কিছুটা উচ্চ পর্যায়ের মিল। এভাবে যত কম মিল তত উচ্চ পর্যায়ে যেতে হবে একই গোষ্ঠিভুক্ত হওয়ার জন্য। এভাবে স্পেসিস, জেনাসের পর ক্রমাগত উচ্চ পর্যায়ের ফ্যামিলি, অর্ডার, ক্লাস, ফাইলাম এবং কিংডম। বেড়াল আর বনবিড়াল এক স্পেসিস নয়, তবে এক জেনাস। আবার এরা উভয়ে, বাঘ, সিংহ ও আরো অনেকের সঙ্গে মিলে একই ফ্যামিলি। এভাবে আরো উচ্চ এক পর্যায়ে গিয়ে মানুষও এদের সঙ্গে শামিল হয়ে যায় স্তন্যপায়ী হিসেবে। একেবারে উচ্চতম পর্যায়ে সব প্রাণীরই একই কিংডম, কিন্তু উদ্ভিদের অন্য কিংডম। শ্রেণী বিন্যাস এবং তার সঙ্গে জড়িত মিল-অমিলগুলো দেখে বোঝা যায় জীবে জীবে কী রকম সম্পর্ক। এই মিল-অমিল শুধু দেহের দিক থেকে নয়, স্বভাব ও আচরণের দিক থেকেও বটে।

বাইরের অবয়বের মিল থাকুক বা না থাকুক যদি নানা জীবের অঙ্গ-প্রতঙ্গের অভ্যন্তরের দিকে আমরা তাকাই তাহলে অত্যন্ত অবাক করার মত কিছু মিল খুঁজে পাই। যেমন মাছের পাখনা, ব্যাঙের সামনের পা, পাখির ডানা, ইঁদুরের পা, মানুষের হাত এসব একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠির এ প্রত্যঙ্গগুলোর হাড় লক্ষ্য করি তা হলে তার গঠনে অপ্রত্যাশিত রকম মিল দেখতে পাই। প্রত্যেকটিতে অগ্রভাগে আর ও গোড়ায় দুটি বাহু রয়েছে। গোড়ার বাহুতে একটি হাড়, কিন্তু সামনের বাহুতে সেফটি পিনের মত মাঝখানে স্থান খালি রেখে পরস্পর সংযুক্ত দুটি হাড়। সামনের বাহুর সঙ্গে কব্জি ও তালু সংলগ্ন আঙ্গুল– অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঁচটি। দেখলেই মনে হবে অনেক দূরের দূরের সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়েও এই সব প্রাণীর সদৃশ দেহাংশগুলো একই ছাঁচ থেকে তৈরি হয়েছে। ফলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে

সুদূর অতীতে তাদের একই পূর্বসূরির ছাঁচ থেকে এসব এসেছে, কারণ তারা সবাই ওর থেকেই বিবর্তিত হয়েছে। ওই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রত্যঙ্গটি ভিন্ন ভিন্ন উত্তরসূরি জীবে ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযুক্ত হয়েছে। একই রকমের সিদ্ধান্তে আসতে হয় মাছের, ব্যাঙের, পাখির, ইঁদুরের ও মানুষের মত একেবারেই ভিন্ন প্রাণীদের ডিমে অথবা মাতৃগর্ভে শুরুর ভ্রূণগুলো লক্ষ্য করলে। দেখা যায় যে প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাদের ভ্রূণের মধ্যে কোন পার্থক্যই করা যায়না। তারপর যতই দিন যায় ভ্রূণও যার যার পূর্ণাঙ্গ অবয়ব ধারণ করতে থাকে ধাপে ধাপে। এরকম অনেক কিছুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা জীব-বিবর্তনের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছিলো।

তবে বিবর্তন তত্ত্বকে প্রায় অনিবার্য করে তুলেছিলো অতীতের বিভিন্ন কাল থেকে পাওয়া ফসিলগুলোর বিশ্লেষণ। প্রাচীন জীবের কঙ্কালের প্রস্তরীভূত রূপ অথবা তাদের মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ যা অন্য কোন ভাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে সেগুলোকেই ফসিল বলা হয়। এরকম প্রাচীন ফসিল দৈবাৎ হঠাৎ হঠাৎ আবিস্কার হয়েছে, জীবের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখবার মত ফসিল পাওয়া বেশ বিরল ঘটনা। তারপরও দীর্ঘ দিন ধরে সারা দুনিয়াজুড়ে বিজ্ঞানীরা বহু জীবের ফসিল আবিষ্কার করেছেন যার অনেকগুলোর মধ্যে ধারাবাহিক পরিবর্তনে ক্রমে ভিন্ন প্রজাতির জীবে পরিণত হওয়া লক্ষ্য করা গেছে। প্রাচীন জিনিসের বয়স শুদ্ধ ভাবে নির্ণয় করার পদ্ধতি উন্নত হওয়ার ফলে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন কোন্ ফসিলটি কতদিন আগের। সেক্ষেত্রে বহু কোটি বছর আগের ফসিল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের পর্যন্ত ফসিল পাওয়া গেছে। সেখানে দেখা গেছে যে স্পষ্টত একই বা কাছাকাছি প্রজাতির বহু হাজার বা লক্ষ বছর পর পর সময়ের ফসিল কিছু কিছু পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে, এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন বেড়েছে। এক পর্যায়ে এসে স্পষ্টত তাদের প্রজাতির বা আরো উচ্চতর গোষ্ঠির চিহ্নগুলোই বদলে যাচ্ছে, অর্থাৎ তারা ভিন্ন জীবে পরিণত হচ্ছে– সবই অবশ্য ফসিল থেকে আন্দাজ করা। এসব ফসিলের অনেকগুলোর মত জীব এখন পৃথিবীতে নেই, আবার অনেকগুলো এখনো আছে।

উদাহরণ স্বরূপ প্রায় চল্লিশ কোটি বছর আগে থেকে পাওয়া মাছের ফসিলগুলো ধারাবাহিক ভাবে পরীক্ষা করে বোঝা গেছে কিছু মাছের পাখনা গোলগাল ও বেশ পুষ্ট রকমের ছিল। ওই মাছগুলোর পাখনা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আরো পুষ্ট, দীর্ঘ, ও অনেকটা হাঁটার উপযোগী হয়ে ওঠেছে। আরো দীর্ঘ সময় পরের এদের যে ফসিল পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল ওই পাখনাগুলোই এখন রীতিমত ব্যাঙের পায়ের আকার ধারণ করেছে, শরীরটাও কিছুটা ব্যাঙের আকৃতি নিয়েছে। অবশ্য সব পর্যায়েই স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে যে এগুলো ওই পুষ্ট-পা গোষ্ঠির মাছের উত্তরসূরি। শেষ পর্যন্ত ফসিল থেকেই বোঝাই গেল যে এগুলোই ব্যাঙের মত উভচর পরিণত হয়েছে– ডাঙায় হাঁটা, আর পানিতে সাঁতার কাটা উভয় কাজের উপযুক্ত হয়ে। সবকিছু ঘটেছে লক্ষ বা কোটি বছর ধরে একটু একটু পরিবর্তনে। এর মানে এই নয় যে একটি মাছ তার জীবনের কোন পর্যায়ে কিছুটা হলেও ব্যাঙের মত হয়েছে। মোটেইনা, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে মাছের ও ব্যাঙের একই মাছ পূর্বসূরি থেকে একটি শাখা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বদলে গিয়ে ব্যাঙে পরিণত হয়েছে, অন্য শাখারা মাছই রয়ে গেছে। এভাবে অনেক জীবের ক্ষেত্রেই মোটামুটি ধারাবাহিক ফসিল দেখে মনে হয়েছে যে এদের প্রজাতি পরিবর্তন, এমনকি জেনাস, ফ্যামিলি ইত্যাদি পরিবর্তন হতে হতে প্রায়শ এরা দুই বা ততোধিক শাখায় বিভক্ত হয়েছে। এ ভাবে ফসিল থেকেই বোঝা গেছে যে উভচর নানা শাখা সরীসৃপে বিবর্তিত হয়েছে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে– কোন শাখা হয়েছে কচ্ছপ গোষ্ঠির প্রজাতি, কোন শাখা হয়েছে কুমীর গোষ্ঠির, কোন শাখা স্থলের গিরগিটির, আবার কোন শাখা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অন্য কোন প্রাচীন সরীসৃপের। এই সব সরীসৃপেরই কোন এক শাখা ডাইনোসরে বিবর্তিত হয়েছে, আবার অন্য শাখা স্তন্যপায়ীতে, বাকি অনেকগুলো বর্তমানের নানা সরীসৃপেই কিছু কিছু পরিবর্তিত রূপে। সব ডাইনোসর এক সময় বিলুপ্ত হয়ে গেছে বটে তবে সেই শাখার একটি ছোট ও হালকা প্রশাখা বিবর্তিত হয়েছে পাখিতে।

এভাবে ফসিল গবেষণা, বর্তমান নানা জীবের মধ্যে মিল-অমিল গবেষণা, (এবং একেবারে আধুনিক কালে এসে ডিএনএ গবেষণা) ইত্যাদি থেকে গড়ে

তোলা সম্ভব হয়েছে জীবের একেবারে প্রারম্ভ থেকে আজ অবধি জীব-বিবর্তনের একটি সম্ভাব্য ইতিহাস। এই ইতিহাসকে একটি নক্‌শার আকারে দাঁড় করালে সেটি দেখতে অনেকটা মনে হবে যেন একটি বৃক্ষের আদলে শাখাহীন কান্ড কিছুটা উঠে এসে নানা শাখা বিস্তার করেছে। একটি প্রজাতি বা উচ্চতর একটি জীবগোষ্ঠি যে দুই শাখায় দুটি গোষ্ঠিতে পরিণত হলো এটি তারই নক্‌শা। সেগুলো থেকে আবার নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়ে পুরো নক্‌শাটি একটি ঝাঁকালো বৃক্ষের মত দেখতে হয়েছে– বলা যায় বিবর্তন-বৃক্ষ। এভাবে আদি জীব যে নানা বিচিত্র জীবে বিবর্তিত হয়েছে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মোটামুটি একটি ঐক্যমত্য উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই গড়ে ওঠেছিল। কিন্তু যে বিষয়ে কোন ঐক্যমত্য ছিলনা তা হলো এই বিবর্তন কেন হয়েছে, এবং কী পদ্ধতিতে হয়েছে, সে ব্যাপারে।

বিবর্তনের কারণ ও পদ্ধতি নিয়ে ওই সময় ও তারো কিছু আগে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে নানা তত্ত্ব এসেছে যার মধ্যে কোন কোনটি সাময়িকভাবে হলেও প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে। কিন্তু কোনটিই বেশী দিন গ্রহণযোগ্য থাকেনি, ভুল ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীলতার জন্য। যেমন এগুলোর মধ্যে এক সময় যথেষ্ট আস্থা জন্মাতে পেরেছিলো ফরাসী বিজ্ঞানী জ্যাঁ-ব্যাপটিষ্ট ল্যামার্কের তত্ত্বটি। তাঁর মতে পারিবেশিক পরিস্থিতির কারণে জীব নিজের জীবদ্দশায় বাধ্য হয়ে নিজের চেষ্টায় যে পরিবর্তন আনে তা তার সন্তান জন্মসূত্রেই পেয়ে যায়। ওই পরিবর্তিত রূপ থেকে শুরু করে সন্তানগুলো একই কারণে একই চেষ্টায় পরিবর্তনটি আরো বাড়িয়ে নেয়। ফলে প্রতি প্রজন্মে বেড়ে বেড়ে পরিবর্তনটি বেড়ে যায়। যেমন জিরাফ উঁচু গাছের পাতা খাবার চেষ্টায় গলা বাড়াতো বলে বছরের পর বছর ধরে গলায় টান পড়ায় ওটা কিছু লম্বা হয়েছিলো। এই লম্বা গলা জিরাফের সন্তানের কাছে গিয়ে তার চেষ্টায় আরো লম্বা হয়েছে, এভাবে হতে হতে শেষে জিরাফের অতি লম্বা গলায় বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্ব বেশীদিন ধোপে টেকেনি, কারণ নিজের জীবন কালে অর্জিত বৈশিষ্ট সন্তানের বংশগতিতে যায় এই ভুল ধারণার ওপর তত্ত্বটিকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সঠিক এবং কালজয়ী তত্ত্বটি এসেছে ১৮৫৯ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী চার্লস

ডারউইনের ‘অরিজিন অফ স্পেসিস’ বইটি প্রকাশের মাধ্যমে। এই তত্ত্ব ও এই বই জীববিজ্ঞানের চেহারা চিরতরে বদলে দিয়েছে। ডারউইনের তত্ত্বটি পরিচিত হয়েছে ‘প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন’ এই নামে। আমরা এখন দেখবো তত্ত্বটি কী এবং কেন এই নাম।

সংকটে নির্বাচিত

চার্লস ডারউইনের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া যদিও ছিল চিকিৎসক হবার জন্য, তাঁর আসল মনোযোগ এবং চিন্তাভাবনা কিন্তু ছিল ভূতত্ত্ব ও জীবজগত নিয়ে। শিক্ষাজীবন শেষ করার পরে পরেই তিনি ১৮৩১ সালে এইচ এম এস বীগল’ নামের একটি জরীপ জাহাজে শিক্ষানবীশ প্রকৃতিবিদ হিসেবে ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে বিশ্বজোড়া অনেক সমুদ্র উপকূল, উপকূল থেকে দূরের জায়গা, দ্বীপ ইত্যাদিতে দীর্ঘ সময় কাটান। এভাবে পাঁচ বছর ধরে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় কিছু কিছু দ্বীপপুঞ্জে স্থানীয় শিলা বিন্যাস, পরিবেশ বৈচিত্র, সব রকমের প্রাণী ও উদ্ভিদ, ইত্যাদি পরীক্ষা ও তাদের নমুনা সংগ্রহ এবং ফসিল সংগ্রহ ইত্যাদির ওপর কাজ করে তিনি দেশে ফেরেন। ওই ভ্রমণের সময়েই এ সব নানা বৈচিত্র থেকে তরুণ ডারউনের মনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের প্রাথমিক ধারণা দানা বেঁধেছিলো। তখন থেকে ‘অরিজিন অফ স্পেসিস’ বইটি প্রকাশ অবধি একটানা এতগুলো বছর তিনি অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর কাজ করে এই তত্ত্বকে যথেষ্ট অকাট্য হিসেবে দাঁড় করান। এই বইতে এবং পরের আরো কয়েকটি বইতে তিনি অনেক যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে দেখান কেন এবং কেমন করে পূর্ববর্তী জীবের দেহ-বৈশিষ্ট এবং স্বভাব-আচরণ ইত্যাদি বিবর্তিত হয়ে তা পরবর্তী জীবে এসেছে। মানুষের উদ্ভবের ক্ষেত্রেও এই বিবর্তন কী ভাবে কাজ করেছে তাও তিনি তুলে ধরেন।

ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কতগুলো জিনিস কাজ করে। এর মধ্যে রয়েছে জীবের একটি দলের নানা সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন রকম বৈচিত্র থাকা ও মিউট্যাশনের ফলে দৈবাৎ কিছু কিছু নতুন বৈচিত্র সৃষ্টি। এটি সব জীবের জন্য সব সময় প্রযোজ্য। প্রাকৃতিক নির্বাচনটি ঘটে

যখন ওখানে পরিবেশে প্রতিকূলতা ও সংকট দেখা দেয়। এই সংকটে দলের ভেতর বাঁচার প্রতিযোগিতায় বিচিত্র বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে কোন একটি বিশেষ সুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, ফলে ওই সংকটে অন্যদের তুলনায় ওই বৈশিষ্টধারী সুবিধাপ্রাপ্ত সদস্যদের বেশিদিন বেঁচে থাকার ও বেশি সন্তান দেয়ার সুযোগ ঘটে। যেহেতু সন্তানের মধ্যে ওই বিশেষ বৈশিষ্টটি থাকবে কাজেই পর পর প্রজন্মে ওই বৈশিষ্টধারীদের সংখ্যাই বাড়তে থাকবে ও অন্যরকমগুলো কমতে থাকবে। এক সময় ওই দলের সবাই ওই সুবিধা পাওয়া বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। দলটি যদি অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে তা হলে কালক্রমে এটি একটি ভিন্ন প্রজাতির জীবে পরিণত হবে। একে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলার কারণ হলো প্রতি প্রজন্মে প্রকৃতিই যেন বিভিন্ন বৈশিষ্টধারীদের মধ্য থেকে ওই বিশেষ বৈশিষ্টধারীদেরকে নির্বাচন বা বাছাই করে দিয়েছে তুলনামূলক ভাবে বেশি দিন টিকতে পারা ও বেশি সন্তান দেবার মধ্যেই এই নির্বাচনের প্রকাশ। সংকটের ফলে সৃষ্ট নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পেরেছে বলেই তাদের এই নির্বাচন। এই খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারটি খুব জরুরী। এখানে যা যা বলা হয়েছে সেই স্বাভাবিক ভাবে বৈচিত্র সৃষ্টি হওয়া, পরিবেশের সংকট দেখা দেয়া, এ সব জীবজগতে বরাবর ঘটেছে, তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনও বরাবর ঘটে এসেছে, এখনো ঘটছে।

গল্পের মত করে একটি উদাহরণ নিলে ব্যাপারটি আরো ভাল বোঝা যাবে। ধরা যাক একটি বনে এক ধরনের প্রজাপতির একটি দল বাস করতো প্রচুর সংখ্যায়। মনে করি প্রজাপতির এই প্রজাতির একটি বৈশিষ্ট ছিলো তাদের দেহ ও ডানার রঙ হালকা সবুজ। বনের সবুজ গাছ-পাতার সঙ্গে এ রঙ এমন মিশে যেতো যে বনের যে পাখিগুলোর প্রজাপতি খাওয়ার অভ্যাস তারা সহজে ওগুলোকে চিহ্নিত করে শিকার করতে পারতো না। তাই প্রজাপতিরা মোটের ওপর সুখে শান্তিতে বংশ বৃদ্ধি করে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদের স্বাভাবিক সুখের দিনে ছেদ পড়লো যখন বনের পরিবেশে কিছু বিপর্যয় দেখা দিল। এক ধনী ব্যবসায়ী কাছেই একটি ফ্যাক্টরি করাতে তার চিমনিগুলোর ক্রমাগত ধূসর ধোঁয়ার দূষণে বনের গাছপালা সব কালচে ছাই রঙের হয়ে পড়লো। এর ফল

হলো বনের অধিকাংশ জায়গায় ছাই রঙের বিপরীতে সবুজ প্রজাপতিকে ভাল ভাবে দেখা যাওয়ায় পাখিরা সহজে ওদের শিকার করতে পারছিলো। কিন্তু এর মধ্যেও দৈবাৎ নিজে নিজে ঘটা মিউট্যাশনে বাবা বা মায়ের জিনে ইতস্তত পরিবর্তনের কারণে অন্যান্য রঙের প্রজাপতিও কালেভদ্রে জন্ম নিচ্ছিল। কখনো সেরকম কোন মিউট্যাশনে সবুজের চেয়েও হালকা সাদা রঙের প্রজাপতি যদি জন্ম নেয় তবে তারা আরো তাড়াতাড়ি পাখির পেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন মিউট্যাশনে তাদের কয়েকটি কালচে ছাই রঙের সন্তানের জন্ম হয়েছে, সেগুলো বনের রঙের সঙ্গে মিশে যাওয়াতে অপেক্ষাকৃত বেশি দিন বেঁচে গিয়েছে এবং তাই দীর্ঘতর জীবনে তাদের সন্তানের সংখ্যাও বেশি হয়েছে। এই সন্তানদের রঙও ওই ছাই রঙের হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই পরের প্রজন্মে ছাই রঙের প্রজাপতি আগের থেকে কিছু বেড়েছে। ওদেরও ছাই রঙের কারণে বেশি দিন বাঁচার ও বেশি সন্তান দেবার সুযোগ হয়েছে এবং সংখ্যায় বেশি বলে ওদের সন্তানদের আনুপাতিক সংখ্যা আরো বেশি হয়েছে। একই ভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ছাই রঙের সংখ্যা বাড়বে এবং সবুজ রঙেরগুলো কমবে। শেষ পর্যন্ত ওই বনের প্রায় সব প্রজাপতি ছাই রঙের হয়ে পড়বে, অর্থাৎ সবুজ রঙের প্রজাপতি ছাই রঙের প্রজাপতিতে বিবর্তিত হবে। যথেষ্ট সময় দেয়া হলে কখনো না কখনো দুই একটি ছাই রঙের মিউট্যাশন ঘটা এবং তার ফলে এমন বিবর্তন ঘটা খুবই সম্ভবপর।

এখানে বনের সব প্রজাপতি ছিল এই প্রজাপতিটির একটি দল। পরিবেশ বিপর্যয় এখানে তাদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট গায়ের রঙের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। যে কোন দলে যে কোন বৈশিষ্টে মিউট্যাশন হতে পারে তা আমরা মরগ্যানের লাল চোখ মাছির মধ্যে একটি সাদা চোখ মাছির জন্মের মাধ্যমে দেখেছি। মরগ্যান এই মিউট্যান্ট মাছিটির বাবা-মার প্রজন্মের মাছিদের ওপর রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োগ করে এই মিউট্যান্ট সন্তান সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেও জীবের ডিএনএ প্রতিলিপি হবার সময় কিছু কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার জন্য নেহাৎ দৈবক্রমে এই বৈশিষ্টে বা ওই বৈশিষ্টে মিউট্যাশনের সৃষ্টি হয়েই থাকে। সবুজ রঙের বদলে অন্য রঙের একটি সন্তান হঠাৎ করে এভাবেই জন্ম নেয়। এটিই বিবর্তনের জন্য বৈচিত্র

সৃষ্টি করে। পূর্ব মিউট্যাশনের কারণে কিছু বৈচিত্র সব সময় যে কোন দলের মধ্যে থাকে। এই বৈচিত্র অর্থাৎ এক্ষেত্রে গায়ের রঙের নানা বিকল্পের মধ্য থেকেই ছাই রঙের প্রজাপতি প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে, কারণ এগুলোই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে বেশি বাঁচতে ও সন্তান দিতে পেরেছে। এ ভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটতে পেরেছে।

কতগুলো বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয়। প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এখানে কোন একটি বৈশিষ্টের বিশেষ রূপকে নির্বাচন বা বাছাই করছে। যে বিকল্পগুলো বা বৈচিত্রগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করছে সেগুলো হয় ইতোমধ্যেই দলের সদস্যদের কারো কারো কাছে রয়েছে, অনেকগুলো হয়তো বহু প্রজন্ম ধরেই আছে পূর্বসূরিদের কাছ থেকে পাওয়া– এতদিন এরকম সংকট না থাকায় কোন প্রভাব রাখেনি; আর কোন কোনটি হয়তো সাম্প্রতিক কোন মিউট্যাশনের ফল। প্রকৃতির কাজ এখানে ম্যাগাজিনের সম্পাদকের মত, লেখকের মত নয়; যে লেখাগুলো এসে এসে জমেছে তাদের মধ্য থেকে বাছাই করা; নিজে লেখা নয়। কাকে বাছাই করবে সে প্রশ্নে প্রকৃতির শর্তটি হলো পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নিয়ে অন্যদের চেয়ে বেশি টিকে থাকতে পারবে ও বেশি সন্তান দিতে পারবে তাকে। ওই বৈচিত্র, ওই সংকট, ওই মিউট্যাশন থাকা না থাকা তা সম্পূর্ণ চান্সের ব্যাপার, ইতস্তত ও দৈবাৎ ভাবে সৃষ্ট। কাজেই বিবর্তন জিনিসটিই একটি চান্সের ব্যাপার, কোন পরিকল্পনামত হবার জিনিস নয়। আমাদের উদাহরণের ওই বনে পাখির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুদ্ধি করে কেউ কিছু ছাই রঙের প্রজাপতির জন্ম দেয়নি। সেটি দৈবক্রমে হয়েছে। সব বিবর্তন ঘটে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবেশের চাপে সাড়া দেবার জন্য। সেই সময় পাওয়া যাচ্ছে এমন বিকল্পগুলোর স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে তা ঘটে– তার কোন সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। যেমন মানুষের বিবর্তনে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ধাপে ধাপে মস্তিষ্কের আকার ও জটিলতা বেড়েছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটি ধাপ কাজ করেছে পরিবেশের তখনকার চাপে নিজস্ব প্রয়োজনে, ওভাবে আরো বিবর্তন হয়ে। এই ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে সামগ্রিক ফলাফলটি আমাদের জন্য খুব ভাল হয়েছে। সামগ্রিক ফল খারাপ হবার উদাহরণও প্রচুর রয়েছে।

যেখানেই বিবর্তন শেষ পর্যন্ত জটিল কিছু সৃষ্টি করেছে, সামাগ্রিক ফলাফলটি যেখানে তাক লাগানোর মত, সেখানেই তা হয়েছে ছোট ছোট অনেকগুলো ধাপে, প্রজাপতির মতো এক লাফে ছাই রঙ হবার মত করে নয়। লক্ষ লক্ষ বছরের মত দীর্ঘ সময় ধরে ধাপে ধাপে একটু একটু করে পরিবর্তনের মাধ্যমেই তা হয়েছে– মানুষের মস্তিষ্ক সৃষ্টির মত, বা স্তন্যপায়ীর চোখ সৃষ্টির মত। যেমন চোখের ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয়েছে একেবারে শুরুর সামান্য পরিবর্তনের ধাপটিতেও খাপ খাওয়াবার জন্য সামান্য হলেও কিছু তুলনামূলক সুবিধা পাওয়া গিয়েছিলো বলে– যদিও সেটি সম্পূর্ণ চোখের মত কোন বড় সুবিধা ছিলনা। সুবিধা যত সামান্যই হোক অন্যদের তুলনায় প্রকৃতি যদি তাকে বাছাই করে তা হলে সে বিবর্তন ঘটবে। ওভাবে প্রত্যেক ধাপে সামান্য কিছু সুবিধা বেড়েছে, এবং সেগুলো সব একের সঙ্গে এক যোগ হয়ে পুরো চোখ সৃষ্টি হতে পেরেছে। প্রজাপতির উদাহরণে ছাই রঙের প্রজাপতির টিকে থাকার সম্ভাবনা অন্য রঙের চেয়ে অনেক বেশি ছিল– ছাই রঙ হলে তার বাঁচা, এবং সবুজ রঙ হলে তার মরা– এমনি আকাশপাতাল পার্থক্য। কিন্তু নির্বাচিত হবার জন্য এতটা পার্থক্যের দরকার হয়না। অন্যদের চেয়ে অল্প কিছু সময়ও বেশি বাঁচার সুবিধা হলে এবং সেই সুবাদে দু'একটি সন্তান বেশি দিতে পারলে তখনই সেটি নির্বাচিত হবার একটু সুযোগ এসে যায়। কারণ পরের প্রজন্মে এই বাড়তি সুবিধাটি এই সন্তানরা পেতেই থাকবে এবং অন্যদের তুলনায় তাদের বাঁচার ও সন্তান দেয়ার সম্ভাবনা আরো বাড়বে। কাজেই অন্যদের পরিস্থিতি যখন একই থাকবে বা খারাপ হবে, নির্বাচিত বৈশিষ্টটির বহনকারীদের সংখ্যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাড়তেই থাকবে। ফলে ধাপে ধাপে অনেক দিন ধরে হতে হলেও বিবর্তন ঠিকই কাজ করবে।

ধাপে ধাপে কাজ করে শেষ পর্যন্ত বিবর্তনে বিশাল পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে এমন একটি উদাহরণ দেয়া যাক, যা ফসিল গবেষণা থেকে উদ্ঘাটিত হয়েছে। কুকুরের মত আকার, আকৃতি ও চেহারার ডাঙারে একটি পশু জলীয় পারিবেশিক কারণে কেমন করে ধাপে ধাপে কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনে তিমির মত একেবারে ভিন্ন দেখতে ও ভিন্ন স্বভাবের প্রাণীতে বিবর্তিত হয়েছে তার বেশ কিছু ধাপের ফসিল উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর মধ্যে একেবারে তিমি

হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত প্রায় সব ধাপের প্রাণীগুলো পরে বিলুপ্ত হয়েছে বটে কিন্তু তাদের ফসিল থেকে জানতে পারছি সেই কুকুরসদৃশ পশুটি কেমন করে পরিবর্তিত হয়ে তিমিতে পরিণত হয়েছে। এগুলোকে পরপর দেখলে আমরা বুঝতে পারি কেমন করে ওই পশুর জলীয় পরিবেশের সুবিধা পাওয়ার ফলে পা ক্রমাগত ছোট হয়েছে, মুখ ছুঁচালো হয়েছে, পুরো দেহ ও লেজ সাঁতারের উপযুক্ত হয়েছে– অল্প অল্প এসব পরিবর্তন পর পর ফসিলে দেখা গেছে। অবশেষে এটি সম্পূর্ণ ভাবেই পানির উপযুক্ত হয়েছে অন্তত বাইরের অবয়বে– পাগুলো পাখনায় এবং দেহটি মাছের মত রূপ নিয়ে। একবারে শুরুর ফসিলের সঙ্গে আজকের তিমিকে মেলালে এই পরিবর্তন অসম্ভব মনে হবে। কিন্তু একটি ধাপের সঙ্গে পরবর্তী ধাপের পার্থক্য দেখলে পরিবর্তনটুকু খুব স্বাভাবিক মনে হবে– কারণ ওইটুকু বৈচিত্র স্বাভাবিক দলের মধ্যে মিউট্যাশনে থাকতেই পারে। কোন দলে অনেক স্বাভাবিক লম্বা পায়ের মধ্যে দু'একটি তুলনামূলক বেঁটে পায়ের সদস্য থাকতেই পারে। সেই বেঁটে পাই আপাতত এই ধাপে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়েছে, তার ওইটুকু সামান্য সুবিধার জন্য।

নতুন জীবে বিবর্তন

একটি স্পেসিস (প্রজাতি) বিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্পেসিস কীভাবে হয়ে পড়ে তাও বোঝা দরকার। নতুন স্পেসিস হলে তখনই সত্যিকার অর্থে বলতে পারি নতুন জীব হলো। নির্বাচিত বৈশিষ্টটি নিয়ে কোন নতুন দল যখন গড়ে ওঠে যেমন সবুজ প্রজাপতির মধ্যে ছাই রঙের প্রজাপতি, তখনো দুই দলের সদস্যদের মধ্যে প্রজননের কোন অসুবিধা হয়না, কারণ ওরা এখনো একই স্পেসিস। ধরা যাক এই বনের সবাই ছাই রঙের হয়ে যাওয়ার পরও ওরা কাছের অন্য বনের সবুজ প্রজাপতিদের সঙ্গে মেলামেশা করছিলো মাঝখানের তৃণভূমিতে, এবং উভয়ের মধ্যে প্রজননও চলছিলো। সবুজ ও ছাই রঙের প্রজাপতির মিলিত সন্তানের মধ্যে উভয়ের জিন থাকায় ওরা একই স্পেসিস থেকেছে। কিন্তু পরে ধরা যাক ওই তৃণভূমির মধ্য দিয়ে একটি নতুন বড় মহাসড়ক চলে যাওয়াতে এবং তাকে ঘিরে অনেক বড় বড় দালান গড়ে

ওঠায়, এই বন আর ওই বনের প্রজাপতিদের মধ্যে দেখাসাক্ষাত স্থায়ী ভাবে বন্ধ হয়ে গেল। বহু বহু প্রজন্ম ধরে ওদের মধ্যে আর প্রজনন না হওয়ায় এই বনের ছাই রঙ প্রজাপতির শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষের বিবর্তন যেভাবে হয়েছে, মহাসড়কের বাধার অন্য পাশে ওই বনের সবুজ প্রজাপতিদের শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষের বিবর্তন ঘটেছে তার চেয়ে ভিন্ন ধারায়। এক ধারায় হতে পারেনি কারণ তাদের মিলিত সন্তান বিস্তার সম্ভব হয়নি বিধায় এসবের বৈশিষ্টের জিন একই প্রজাপতিতে গিয়ে একত্র হতে পারেনি। কাজেই শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায় আসবে যখন ওদের এক দলের শুক্র ও ডিম্বকোষ অন্য দলের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্টের হয়ে পড়বে। এর পর কোন এক সময় মহাসড়কের বাধা যদি দূরও হয়ে যায়, ছাই রঙ ও সবুজ রঙের প্রজাপতির মধ্যে যৌন মেলামেশা যদি আবার ঘটেও তাদের ডিম্বকোষে ও শুক্রকোষে পরস্পর সাযুজ্য না থাকায় উভয়ের মধ্যে সন্তানের জন্ম আর সম্ভব হবে না। তখন বলতে হবে ওরা দুটি এখন আলাদা স্পেসিসে পরিণত হয়েছে। ছাই রঙের প্রজাপতি এখন একটি নতুন স্পেসিস হিসেবে দেখা দেবে। ডারউইনের বইটির নাম ‘অরিজিন অফ স্পেসিস’ হয়েছিল এভাবে নতুন নতুন স্পেসিস সৃষ্টির ব্যাখ্যা ওখানে আছে বলেই। আর এভাবেই পৃথিবীতে এমন জীববৈচিত্র দেখা দিয়েছে– এক স্পেসিস থেকে অনেক স্পেসিস, অনেক জেনাস, অনেক ফ্যামিলি ইত্যাদি।

নতুন স্পেসিস সৃষ্টিতে দুটি দলের মধ্যে ওই মহাসড়কের বাধা কী ভাবে কাজ করেছে তা আমরা দেখলাম। এভাবে ভৌগলিক বাধা যখন একটি দলকে অন্য দলের থেকে আলাদা করে ফেলে– পর্বত, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি বাধা– তখনই নতুন দলটির ভিন্ন স্পেসিস হয়ে পড়ার সুযোগ ঘটে। তবে বাধাটি ভৌগলিক হবারও দরকার নেই। অনেক সময় দুটি দল যদি একই জায়গায় থাকে, কিন্তু এর মধ্যে একটি দল এমন ভাবে কোন স্বভাব পরিবর্তন করে যাতে দুই দলের মধ্যে প্রজনন বাধাগ্রস্ত হয়, তা হলেও একই ফলাফল ঘটবে। পরিবর্তিত স্বভাবের দলটি ভিন্ন ধারায় বিবর্তিত হয়ে ভিন্ন স্পেসিসে পরিণত হবে। যেমন আফ্রিকায় আমাদের পূর্বসূরি অন্য স্পেসের মানুষরা যখন খুব ছোট ছোট দলে ঘুরে ঘুরে তাদের শিকার-সংগ্রহের জীবিকায় ছিল

এক পর্যায়ে পরিবেশের সংকটে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছিলো; এমনকি প্রায় বিলুপ্ত হতে বসেছিলো। এটিই তাদেরকে আলাদা আরো বুদ্ধিমান প্রজতি করে তুলেছিলো।

প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া আরো একটি উপায়ে ওপরে বর্ণিত সব ঘটনা ঘটতে পারে। একটি দলে কোন বৈশিষ্টের কয়েকটি রূপ প্রায় সমান ভাবে থাকলেও কখনো নেহাৎ চান্সের কারণে কোন একটি বৈশিষ্ট নিয়ে সন্তান কিছু বেশি জন্মাতে পারে। এ যেন লুডুর দান বার বার ফেল্‌লে এক থেকে ছয় পর্যন্ত সংখ্যা মোটামুটি সমান হারে পড়বে। কিন্তু কখনো কখনো চান্সের কারণে পর পর তিনটি ছক্কা পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটতেই পারে, যদিও তো বেশি হবেনা। এভাবে বৈশিষ্টের একটি রূপ দৈবাৎ বেশি সদস্যের মধ্যে দেখা গেলে পরবর্তী প্রজন্মে ওদের সন্তান সংখ্যা কিছু বেশি হবে এবং ওই বৈশিষ্টটির ধারকের সংখ্যা আরো বাড়বে, পরের প্রজন্মে তাই আরো। এমনি করে মনে হবে যেন দলটির জেনেটিক বৈচিত্র ওই বৈশিষ্টটির দিকে ক্রমে গড়িয়ে যাচ্ছে বা সরে যাচ্ছে। এই ঘটনাটিকে তাই বলা হয় জেনেটিক ড্রিফ্‌ট বা জেনেটিক সরে যাওয়া। এ ভাবেই এক সময় পুরো দলটি ওই বৈশিষ্টে বিবর্তিত হতে পারে– প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াই। যেহেতু দুটি স্থায়ী ভাবে বাধার কারণে বিচ্ছিন্ন দলে ওরকম চান্সের কারণে একই বৈশিষ্টের দিকে একই ভাবে ঝোঁকার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যে কোঠায়– দুটিতে ভিন্ন বৈশিষ্টের দিকেই জেনেটিক ড্রিফট হবার সম্ভাবনা বেশি। আবার ওদিকে ভৌগলিক বাধার কারণে দুই দলে প্রজননের মাধ্যমে মিশ্র সন্তানদের মাধ্যমে একই ধারার ড্রিফটে ফেরার কোন সুযোগ নেই, কাজেই ওদের বিবর্তন ধারা ক্রমশই পৃথক দিকে চলে যাবে। অবশ্য জেনেটিক ড্রিফ্‌টের থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচন অনেক শক্তিশালী ও সচরাচর ঘটা প্রক্রিয়া। তা ছাড়া যেখানেই বিবর্তন ধাপে ধাপে জটিল কিছু সৃষ্টি করেছে যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া অন্য ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবকিছুর পেছনেই যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের হাত রয়েছে যেটি এখন প্রায় নিসন্দেহ– তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা একটু পরেই দেখবো। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জীবের প্রত্যেকটি ব্যাপার সরাসরি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেতে পেরেছিলো বলেই আসতে পেরেছে। বেশ কিছু

জিনিস আছে যেগুলো সরাসরি নয় পরোক্ষভাবে বিবর্তনের ফল। অন্য কোন কিছু বিবর্তিত হয়েছিলো যার একটি উপজাত (বাইপ্রডাক্ট) হিসেবে এটি এসেছে। যেমন ধরা যাক আমরা জানতে চাচ্ছি হাড়ের রঙ সাদা হলো কেন? শরীরের ভেতরের হাড়ের সাদা হওয়াটা কোন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকার জন্য সহায়ক হয়েছিলো এমন কিছু ভাবা যায়না। এদিক থেকে এটি নিরেপক্ষ– সুবিধা-অসুবিধা কোনটিই নেই। সাদা হওয়াটি তাই খাপ খাওয়াবার কারণে বিবর্তিত হয়ে আসেনি। এটি আসলে সরাসরি বিবর্তনের সৃষ্টি নয়, অন্য একটি বিবর্তনের উপজাত মাত্র। হাড়ের প্রধান উপাদান হলো ক্যালসিয়াম, যার রঙ সাদা। হাড় ক্যালসিয়াম দিয়ে গঠিত হওয়াটি কিন্তু বিবর্তনের ফলেই ঘটেছে। বিভিন্ন উপাদানে গড়া হাড় শেষ পর্যন্ত শুধু ক্যালসিয়ামে গড়া হাড়ে বিবর্তিত হয়েছে কারণ দেহকে ভারী করে না ফেলে ক্যালসিয়ামের চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি। এর তৈরি কাঠামো বিশেষ পরিবেশে প্রাণীকে টিকে থাকার সুবিধা দিয়েছিলো। কাজেই অন্য পদার্থের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্যালসিয়ামে গড়া হাড় নির্বাচিত হয়েছে। এরই উপজাত হিসেবে হাড়ের রঙ সাদা।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নানা প্রমাণ

ডারউইনের বিভিন্ন বইয়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ দেয়া হয়েছে যার অধিকাংশ তাঁর সারা জীবনব্যাপী পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে এসেছে। এর শুরুটা ঘটেছে বীগল জাহাজে করে বিশ্ব ভ্রমণের সময়। উদাহরণ স্বরূপ গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের কথা ধরা যাক। দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জে ছোট বড় অনেক দ্বীপ রয়েছে। পরস্পর থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন এখানকার অনেক দ্বীপ বিরল জীববৈচিত্রের জন্য খ্যাত। ডারউইন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন এখানকার বিচিত্র চড়ুই এবং বিশাল কচ্ছপগুলোকে।

জনমানবহীন কিছু বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তিনি দেখলেন প্রত্যেকটিতে ভিন্ন প্রজাতির চড়ুই রয়েছে। স্পষ্টত দেখা যায় এক দ্বীপের চড়ুই থেকে অন্য দ্বীপের চড়ুইয়ের ঠোঁটগুলো ভিন্ন। একটিতে ঠোঁট খুব মোটা, শক্ত, বড়– সেই

দ্বীপটিতে চড়ুইয়ের একমাত্র খাবার যা পাওয়া যায় তা হলো শক্ত বাদাম । আর একদ্বীপ ঠোঁট অতটা বড় শক্ত বা মোটা নয়, এখানকার একমাত্র খাবারও বাদাম, তবে শক্ত বাদাম নয়। এমনি ভাবে দেখা গেছে যে যেখানে ঠোঁট যত ছোট ও সরু, সেখানে একমাত্র খাবার তত নরম ও ছোট– বীজ পোকা ইত্যাদি। একটি দ্বীপে চড়ুইগুলোর খুবই লম্বা সরু ঠোঁট, আর সেই দ্বীপে তাদের খাদ্যের জন্য নির্ভর করতে হয় বিশেষ লম্বা ফুলের মৌয়ের ওপর যা তারা সরু নলের মত লম্বা ঠোঁট দিয়ে শুষে আনে। ডারউইন ব্যাখ্যা করতে পারলেন সুদূর অতীতে এসব চড়ুইয়ের পূর্বসূরি চড়ুই মূল ভূখণ্ড থেকে এসেছিলো এবং তাদের বংশধররা নানা দ্বীপে গিয়ে বসত করেছে। পরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এক এক দ্বীপের চড়ুইয়ের এক এক রকম খাদ্য প্রাধান্য লাভ করলে সেখানে কোন কোন ঠোঁট সুবিধা পেতে শুরু করেছিলো। যেমন যাদের ঠোঁট এমনিতেই একটু শক্ত ছিল তারা শক্ত বাদামের দ্বীপে কিছু সুবিধা পেয়েছে; এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ক্রমে আরো মোটা, আরো শক্ত ঠোঁট প্রাধান্য লাভ করেছে। এ ভাবে চাক্ষুষ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রমাণ হিসেবে চমৎকার।

এরকম গ্যালাপাগোস আরো সব জীব-বৈশিষ্টকে তিনি একই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। বড় বড় কচ্ছপগুলোর গায়ের খোল কোন দ্বীপে গম্বুজের আকৃতির– যেখানে তার তলায় দেহ থেকে গলা নিচের দিকে বাড়িয়ে ভূমির খাবার খেতে সুবিধা; আর খাদ্যও সব এখানে ভূমিতেই। যে দ্বীপে খোল নৌকার আকৃতির সেখানে গলা ওপরের দিকে বাড়িয়ে একটু ওপরে গাছের থেকে খাদ্য খেতে সুবিধা; সেখানে খাবার শুধু ওপরেই পাওয়া যায়। স্পষ্টত একই কচ্ছপ এক দ্বীপে গম্বুজ আকৃতিতে আর অন্য দ্বীপে নৌকার আকৃতিতে বিবর্তিত হয়েছে ভিন্ন পরিবেশের কারণে।

ইংল্যাণ্ডে ফিরে ডারউইন যে গবেষণাগুলো করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল নানা জাতের কুকুর প্রজননকারীদের কাজ গভীরভাবে লক্ষ্য করা। এই প্রজননকারীরা চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন বৈশিষ্টের কুকুরের জাত সৃষ্টি করতেন। ধরা যাক খুব ছোট এবং একেবারে নম্র স্বভাবের কুকুরের চাহিদা সৃষ্টি হলো, অথচ ওরকম কোন জাত নেই। তখন প্রজননকারীরা সাধারণ

কুকুরদের মধ্যে এমনিতেই যে কিছুটা বৈচিত্র রয়েছে তার মধ্য থেকে তুলনামূলক ভাবে ছোট ও নম্র স্বভাবের পুরুষ ও স্ত্রী কুকুর খুঁজে খুঁজে বের করেন। সেগুলোকে এভাবে বেছে নেয়াও এক ধরনের নির্বাচন যদিও এটি মানুষের দ্বারা করা নির্বাচন। এরপর ওরকম একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীর মধ্যে প্রজনন করালে ওদের সন্তানগুলো বাবা-মা উভয়ের থেকে একই গুণ পেয়ে ওরকম কিছুটা ছোট ও নম্র হবে। এই প্রজন্মের সন্তানগুলোর মধ্যে আবার বেছে বেছে সব চেয়ে ছোট ও সব চেয়ে নম্রগুলোর মধ্যে প্রজনন করালে পরের প্রজন্মে আরো ছোট, আরো নম্র কুকুর পাওয়া গেলো। এ ভাবে প্রত্যেক প্রজন্মে সব চেয়ে ছোট, সব চেয়ে নম্রগুলো বাছাই করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রজনন করে গেলে শেষ পর্যন্ত অনেক ছোট ও অনেক নম্র কুকুর পেয়ে যাব যা যা কুকুরের একটি নতুন জাত সৃষ্টি করবে। ডারউইন দেখলেন যে এই পুরো বিষয়ের সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি মিল আছে। যদিও নির্বাচন এখানে প্রকৃতি করছেনা, মানুষ করছে; যদিও নির্বাচনের শর্ত প্রতিযোগিতায় বাঁচা নয়, কাম্য গুণগুলো বেশি থাকা; যদিও এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত কাজগুলো লক্ষ্যহীন ভাবে হচ্ছেনা; তারপরও বাছাইয়ের ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্মে জীব বদলে যাওয়ার ক্ষেত্রে উভয়ের প্রক্রিয়াগত মিলটি খুব স্পষ্ট। কুকুরের কৃত্রিম (মানুষ দ্বারা) নির্বাচনের চাক্ষুষ প্রমাণ পরোক্ষভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে এক ভাবে চোখের সামনে নিয়ে আসছে।

ডারউইন দেখালেন যে জীবজগতের অনেক অদ্ভুত ঘটনাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করা যায়, যা অন্য কোন ভাবে কেউ কোনদিন ব্যাখ্যা করতে পারেনি। ওরকম একটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো কোন কোন উদ্ভিদ বা প্রাণীর পক্ষে অন্য জীবের ছদ্মবেশ ধারণ করা– প্রকৃতিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই। যেমন বেশ কয়েক রকমের পতঙ্গ দেখা যায় যেগুলো নিশ্চল থাকলে একেবারে একটি শুকনা গাছের পাতা অথবা ছোট মরা কাঠির মত দেখায়– সেই পোড়া দাগের খয়েরী রঙ, সেই কুঁচকানো দেহ ইত্যাদি। কোন কোন টিকটিকি বা গিরগিটিকে দেখা যায় নিশ্চল অবস্থায় হুবহু গাছের সবুজ মোটা পাতা বা ডাঁটার মত। এর চেয়েও অদ্ভুত হলো এমন কিছু অর্কিড ফুল দেখা যায় যেগুলো হুবহু একটি মৌমাছির আকার আকৃতি ধারণ করেছে– সেই রঙ,

সেই ডানা, সেই তিন ভাবে বিভক্ত দেহ, গায়ে ডোরা কাটা, সেই চোখ, শুঁড় সব কিছু। এ তো রীতিমত শিল্পীর কাজের মত, স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রকৃতিতে ঘটলো কী ভাবে? ডারউইন লক্ষ্য করলেন যে এদের প্রত্যেকটাতে এমন ছদ্মবেশের ফলে ছদ্মবেশ গ্রহণকারী জীবটির কোন না কোন উপকার হচ্ছে যাতে তার অধিক বেঁচে যাবার ও সন্তান দেয়ার সহায়ক হচ্ছে। যেমন মরা পাতা বা মরা কাঠির মত পড়ে থাকলে ওই পতঙ্গকে যেমন পতঙ্গভুক পাখিরা পটভূমির মরা পাতা থেকে আলাদা করতে পারেনা, তেমনি ওই পতঙ্গ আবার যাদের শিকার করে তারাও পতঙ্গকে চিনতে না পেরে পালিয়ে যায়না। কিন্তু এই সব সুবিধার কথা ভেবে ওরা তো আর নিজের ইচ্ছায় নিজেকে ওভাবে পরিবর্তিত করে নিতে পারেনি। ওদের জন্মই তো ওভাবে হয়েছে। কিন্তু তা হলো কেন? ডারউইন এসব ছদ্মবেশীদের সব ক'টাকে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারলেন।

আমরা এর মধ্যে সব চেয়ে জটিল উদাহরণটির বিস্তৃত ব্যাখ্যাটি দেখার চেষ্টা করি – মৌমাছির মত দেখতে ফুলের। এতে একই সঙ্গে ধাপে ধাপে দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের ফলে অতি জটিল কিছুও যে কেমন করে সৃষ্টি হতে পারে তারো ভাল পরিচয় পাওয়া যাবে। একই অর্কিড ফুলের আকৃতি ও রঙচঙে স্বাভাবিক ভাবেই নানা বৈচিত্র থাকে। ওর মধ্যেই কোনটিতে হয়তো দুপাশে দুই পাপড়ির আকৃতি ও ওর ওপরের রঙ ও দাগগুলোতে এমন কিছু ছিল যাতে খুব সামান্য পরিমাণে মৌমাছির ডানার ভাব আসে। অন্য দিকে মাঝের পাপড়িটি একটু মোটা লম্বাটে ও কালচে হওয়াতে পুরোটাতে মৌমাছির ভাব একটু বেড়েছিলো। মৌমাছির দৃষ্টি শক্তি খুব প্রখর নয় (গবেষণায় প্রমাণিত), তাই কাছে দিয়ে উড়ে যাওয়া কোন কোন মৌমাছির পক্ষে এই ফুলকে একটি মৌমাছি বলে ভুল করা বিচিত্র নয়। অন্য একটি মৌমাছির সঙ্গ লাভের জন্য এরকম বিভ্রান্ত মৌমাছি ওখানে এসে বসবে। ভুল ভাঙ্গার পর উড়ে চলে গেলেও এই ফুলের পরাগ রেণু মৌমাছির পায়ে প্রচুর লাগবে যা পরে অন্যান্য ফুলে মধু সংগ্রহের সময় তাতে পরাগ সংযোগ হবে। এভাবে অন্যান্য ফুলগুলোর তুলনায় মৌমাছির সঙ্গে সামান্য সাদৃশ্যযুক্ত ফুলটির পরাগ সংযোগ বেশি হবে বলে তার সন্তান সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কিছু বেশি হবে। ফলে

এই ফুলের অনেক সন্তানরাও মৌমাছির সঙ্গে ওইটুকু সামান্য সাদৃশ্যযুক্ত হবে।

এই সন্তানদের মধ্যে যেগুলোর মধ্যে মৌমাছির এই সাদৃশ্য কিছুটা বেশি এবং হয়তো বাড়তি মিউট্যাশনে আরো কিছু সাদৃশ্য দৈবক্রমে তাতে যুক্ত হয়েছে যেমন সামনের দিকে চোখের আদলে দুটি কালো বৃত্ত অথবা মাঝে কিছু ডোরার দাগ, সেখানে ওই বাড়তি মৌমাছি আসার সম্ভাবনা ও পরাগ সংযোগ অধিক হবার সম্ভাবনা আরো বাড়বে। এভাবে পর পর ধাপে পরের প্রজন্মের ফুলে মৌমাছির সঙ্গে সাদৃশ্য আরো বাড়বে। এই যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ফুলে মৌমাছির কিছু কিছু বৈশিষ্টগুলো যোগ হলো তা ফুলটিকে ক্রমেই বেশি বেশি করে মৌমাছির অবয়ব দিলো। কেন দৈবক্রমে শুধু মৌমাছির চেহারার বৈশিষ্টগুলোই যোগ হবে তারও একটি ব্যাখ্যা আছে। এলোমেলো অন্য চেহারার বৈশিষ্টও হয়তো কোন কোনটির ক্ষেত্রে ইতস্তত যোগ হচ্ছে, কিন্তু তা ফুলকে মৌমাছির মত মনে হতে বরং বাধার সৃষ্টি করবে, তাই পরাগ সংযোগ অপেক্ষাকৃত কম হয়ে তাদের সংখ্যা পরের প্রজন্মগুলোতে কমে যাবে। আর দীর্ঘ সময়ের সুযোগ নিয়ে ধাপে ধাপে যে সব মৌমাছির চেহারার বৈশিষ্ট দৈবক্রমে মিউট্যাশনে যোগ হবে– দেহের তিন ভাগ, ডানার শিরা রেখা, সামনের শুঁড় ইত্যাদি– যেটি যত দেরীতেই যখনই হোক না কেন– শুধু সেগুলোই কিন্তু থেকে যাবে আর বহু সংখ্যায় ছড়িয়ে যাবে, পরাগ সংযোগের বেশি সুবিধা পাচ্ছে বলে। এ ভাবেই এটি শেষ পর্যন্ত হুবহু মৌমাছির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে ধাপে ধাপে মৌমাছির চেহারার বৈশিষ্ট ফুলের মধ্যে জমা হতে পেরেছে তার কারণ শুরুতে যে অতি সামান্য সাদৃশ্য মৌমাছির সঙ্গে ছিল তাতেই পরাগ সংযোগের সামান্য সুবিধা পেয়েছিলো বলে তা বৃথা যায়নি, তাই পরে আরো কিছু ওর সঙ্গে যোগ হবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে পুরো বৈশিষ্টের জীব সুবিধাটি পেলেও সামান্য পরিবর্তিত বৈশিষ্টের জীব সামান্যভাবেও এই সুবিধা পায়না। যেমন পাখির বিবর্তনে একেবারে শুরুতে কোন এক ছোট হালকা ডাইনোসরে মিউটেশনের ফলে সামান্য একটু পালক যুক্ত ছোট ডানা তার সন্তানের মধ্যে

যেতে পেরেছে। কিন্তু ওড়ার সক্ষমতার মাধ্যমে ডানার যে সুবিধা পাওয়ার কথা এই সামান্য ডানা তা দিতে পারার কথা নয়। কাজেই এর পর ধাপে ধাপে পুরো ডানাসহ পাখি বিবর্তিত হলো কী ভাবে? এখানেও যে ধাপে ধাপে ডানা বাড়াতে পেরেছে তার কারণ শুরুর সেই সামান্য ডানাটি ওড়ার কাজের সুবিধার জন্য নয় বরং উত্তাপ কমাতে শরীরকে বাতাস করার সুবিধার কারণে বিবর্তিত হয়েছিলো। উত্তাপ কমানোই তাকে বাঁচার বাড়তি সুবিধা দিয়েছিলো। এটি নানা সাক্ষ্য প্রমাণে বোঝা গেছে। এরপর ডানা আরো বড় হলে এটি গাছ থেকে এই ডাইনোসরের লাফ দেবার সময় প্যারাসুটের মত গতি কমাতে সুবিধা পেয়েছে। পতনের গতি কমানোও বাঁচার বাড়তি সুবিধা দিয়েছে। ওভাবে ডানা আরো বড় এবং আরো কার্যকর হয়েছে বাতাসে নানা ভাবে চলাফেরা করার সুবিধা পেয়ে। শেষ পর্যন্ত ওড়াটাই হয়েছে বিবর্তনের পথে বড় সুবিধা– ডাইনোসরটিও তখন আর আংশিক নয় পুরাপুরি পাখিতে বিবর্তিত হয়েছে। এভাবে ধাপে ধাপে বিবর্তনে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সুবিধার জন্য বৈশিষ্টটি নির্বাচিত হয়, সব পর্যায়ে একই সুবিধার জন্য নয়।

একই গোষ্ঠির প্রাণী বা উদ্ভিদকে আমরা প্রায়ই কোন বড় ভৌগলিক বাধার এদিকে এবং ওদিকে ভিন্নরূপে, ভিন্ন প্রজাতিরূপে দেখি। যেমন আফ্রিকায় 'আফ্রিকান হাতী', দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় 'ভারতীয় হাতী', এই দুইয়ের সাধারণ চেহারা এক হলেও তফাত অনেক। একই ভাবে আরবে ও ভারতে এক ধরনের উট, হিমালয়ের অন্য পারে চীনে ও মঙ্গোলিয়ায় অন্য রকম উট, দক্ষিণ আমেরিকায় আরো অন্য রকম। এরকম ভূগোল-নির্ভর জীব-পার্থক্যের বিষয়টির ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে এটি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন উটের ব্যাপারটি দেখা যাক। উত্তর আমেরিকাতে এখন উট না থাকলেও সেখানে উটের প্রাচীনতম পূর্বসূরির ফসিল আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বোঝা গেছে যে ওখানেই উটের উৎপত্তি হয়ে প্রাচীন উট সেখান থেকে অন্যান্য মহাদেশে গিয়েছে। কিছু এক সময় সমুদ্রের পানি নেমে যাওয়ায় বেরিং প্রণালীর কাছে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়া অস্থায়ী ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিলো। তখন কিছু উট উত্তর আমেরিকা থেকে উত্তর

এশিয়াতে চলে এসেছিলো। তারই কয়েকটি বংশধর সুবিধাজনক সময়ে কোন গিরিপথ দিয়ে হিমালয় পার হয়ে ভারতে চলে এসেছিলো। অন্যদিকে উত্তর আমেরিকা থেকে কিছু প্রাচীন উট দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বত অঞ্চলে চলে গিয়েছিলো। এরপর এক সময় উত্তর আমেরিকায় বিলুপ্ত হয়ে গেলেও উটের বংশধররা আরবে ও ভারতে বড়, এক কূজী, এবং গরম সহ্য করার উপযুক্ত উটে বিবর্তিত হয়েছে এখানকার পরিবেশের নানা পরিবর্তনে সাড়া দিতে দিতে। হিমালয়ের উত্তরে চীনে ও মঙ্গোলিয়ায় ভিন্ন পরিবেশের সংকটে অন্য ধারায় বিবর্তিত হয়ে বড়, দুই কূজী ও লম্বা লোম বিশিষ্ট শীত সহনশীল উট সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয়ের বাধার কারণে এই দুই দলে কখনো প্রজনন হতে না পারায় এভাবে ভিন্ন ধারায় বিবর্তন হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজে। সেখানে উচ্চ পার্বত্য পরিবেশে অন্য ধারার বিবর্তনে সৃষ্টি হয়েছে বেশ ছোট ভারবাহী, মূল্যবান পশমযুক্ত লামা এবং আলপাকা– উটেরই অন্য দুই রূপ। প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়া এসবের অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

ডারউইন শুধু দেহগত বৈশিষ্টের বিষয়ে নয়, স্বভাবগত বৈশিষ্টের বিষয়েও প্রাকৃতিক নির্বাচনের অনেকগুলো সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন, যার কিছু কিছু আমরা পরে দেখবো। ডারউইনের কালের পর উভয় ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনের আরো বহু অকাট্য প্রমাণ বিজ্ঞানীরা দিতে পেরেছেন। কিন্তু প্রমাণের একটি সীমাবদ্ধতার কথা প্রায়ই বলা হতো যে সব ক্ষেত্রে অতীতের বিবর্তনকেই শুধু ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ভবিষ্যতের বিবর্তনকে এই তত্ত্বের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং তা সত্যি সত্যি যে ঘটেছে তা দেখিয়ে দিয়ে বিজ্ঞানের আরো পাকা পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এসে তাও সম্ভব হয়েছে। যেমন আমাদের সেই প্রজাপতির গল্পের উদাহরণের মত ব্যাপার পঞ্চাশের দশকে বিজ্ঞানীদের চোখের সামনেই ঘটেছে যা তাঁরা আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন।

দীর্ঘদিন আগে থেকে সে সময় পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বড় বড় শহরগুলোর সব দালানকোঠা ও অন্যান্য স্থাপনার রঙ কয়লার ধোঁয়ার আস্তরন পড়ে কালচে ছাই রঙের হয়ে ছিলো। এই শহরাঞ্চলে ঠিক প্রজাপতি না থাকলেও অনুরূপ

আর একটি পতঙ্গ মথ-প্রজাপতি প্রচুর ছিল; আর সেগুলোর রঙ বোধগম্য কারণেই ছিল কালচে ছাই রঙের। সব ভবনের রঙের সঙ্গে নিজের রঙ মিশে যেতো বলে শিকারিদের থেকে তাদের আত্মরক্ষার সুবিধা হতো। ওই ১৯৬০ এর দিকে ইংল্যাণ্ডের শহরগুলোতে ঘর গরম করার জন্য ও অন্যান্য কাজে কয়লার ব্যবহার বন্ধ করে দিলে, কালো ধোঁয়ার পাটটি চুকে যায়, এবং এ সময় সব ভবনগুলো ঘষে ঘষে পরিস্কার করে প্রায় সাদাটে করে তোলা হয়। এতে ছাই রঙের মথ-প্রজাপতিগুলোকে সাদাটে পটভূমিতে তখন বেশ স্পষ্টই সবাই দেখতে পাচ্ছিলো, মথ-খেকো পাখিরাও। তাদের এমন পরিবেশ-সংকট লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ৩০-৩৫ বছরের মধ্যে ছাই রঙের অধিকাংশ মথ হালকা সাদাটে রঙে পরিণত হবে। ওই সময়ের মধ্যেই ঠিক তাই হয়েছিলো।

এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রমাণ এখন অবশ্য কয়েক দশকে নয় কয়েক দিনের মধ্যে নিজেরাই অহরহ পাচ্ছি– অবশ্য চোখে দেখা জীবে নয় ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে। কোন কোন ব্যাকটেরিয়া বা রোগজীবাণু চার ঘন্টার মধ্যে একটি নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে পারে, তাই তাদের বিবর্তনও খুব দ্রুত হতে পারে। এন্টিবায়োটিক জীবাণু ধ্বংস করে। কোন একটি বিশেষ এন্টিবায়েটিকের বিরুদ্ধে নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে এমন জীবাণুই ওই এন্টিবায়েটিকের পরিবেশে টিকে থেকে সন্তান দিতে পারবে। মিউট্যাশনের কারণে জীবাণুগুলোর কোন কোনটির কিছুটা এই প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকতে পারে। তারা টিকে থেকে যে সন্তান দেবে সেগুলোও এন্টিবায়েটিকটির প্রতিরোধী হবে। তাই বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যে ঘন ঘন একই এন্টিবায়োটিক দরকারে বেদরকারে ব্যবহার করলে সাধারণ রোগজীবাণু কিছু প্রজন্মের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রতিরোধী রোগজীবাণুতে বিবর্তিত হয়ে পড়বে এবং শিগ্‌গির এন্টিবায়োটিক আর এই রোগের বিরুদ্ধে কাজ করাবেনা। ঠিক এটিই আমরা ঘটতে দেখছি বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার হয়।

একটি মজার ব্যাপার হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাপারটিকে এখন আমরা চোখের সামনে শুধু জীবের প্রকৃত বাস্তবতায় নয় কম্পিউটারের ভার্চুয়াল

বাস্তবতায়ও দেখতে পাচ্ছি। সেক্ষেত্রে বাইরের পরিবেশের সংকটে জীবের দলের সদস্যরা বাঁচার প্রতিযোগিতা করেনা, বরং কিছু কম্পিউটার প্রোগ্রাম কম্পিউটারে মধ্যেই সমস্যা সমাধানে সব চেয়ে বেশি সফল হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে, এবং সফলটি নিজের কপি তৈরি করে জীবের মতই বংশ বিস্তার করে পরবর্তী প্রতিযোগিতার জন্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) সৃষ্টির গবেষণায় নিজে কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি না করে কম্পিউটারকেই বিজ্ঞানীরা এভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমাগত অধিকতর কার্যকর প্রোগ্রাম সৃষ্টি করতে দিয়েছেন, এবং সে রকম প্রোগ্রাম পাচ্ছেন।

এজন্য তাঁরা কিছু সফ্টওয়্যার তৈরি করেছেন যা কম্পিউটারকে এমন কয়েকটি সরল প্রোগ্রাম একটি সমস্যা সমাধানে তৈরি করতে দেয় যেগুলো একটির থেকে অন্যটি ভিন্ন। কাজের প্রতিযোগিতা হয় এদের মধ্যে– সবই কম্পিউটারের মধ্যে। প্রথম দফায় যেটি সবচেয়ে সফল হয় স্বয়ংক্রিয় ভাবে তার কিছু কপি তৈরি হয়, কিন্তু সেই কপিগুলোতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ইতস্তত কিন্তু পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়া হয়। এই পরিবর্তন জীবের মধ্যে মিউট্যাশন সৃষ্টির মত। ফলে এগুলো আগেরবারের সফলতম হবার সব বৈশিষ্ট বজায় রেখেও পরস্পর থেকে কিছুটা বিভিন্ন রকম হয়ে পড়ে, কিছু কিছু নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এখন এই প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা হয় এবং এদের মধ্যে সফলতমটি বাছাই হয়ে যায়। এই পুরো প্রক্রিয়া চলতেই থাকে অসংখ্যবার। কম্পিউটারের কাজ জীবের চেয়ে দ্রততর বলে এখানে ‘প্রজন্ম’গুলো দ্রুত একের পর এক ঘটে যায়, এবং অবশেষে সন্তোষজনক সেরা প্রোগ্রামটি পেলে প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়। এটি জীবজগতের কিছু নয়, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি হুবহু অনুকরণ যা চোখের সামনেই, অল্প সময়ের মধ্যে চমৎকার ভাবে ঘটতে দেখা যায়। একে বলা যায় জীবজগতের একটি কম্পিউটার সিম্যুলেশন (কম্পিউটারে অনুকরণ)। আজকাল গবেষণাসহ বহু ক্ষেত্রেই বাস্তব ঘটনার পরিবর্তে কম্পিউটার সিম্যুলেশন ব্যবহার করা হয়।

এই বিশেষ সিম্যুলেশনটি ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়’ ব্যবহৃত হয় কেন না এখানে একটি প্রোগ্রাম (সফটওয়্যার) নিজেই অন্য প্রোগ্রাম শুধু সৃষ্টি করছেনা, তাকে ক্রমে উন্নততরও করে তুলছে, নিজের থেকেই। ‘জেনেটিক আলগরাদিম’

নামে পরিচিত এই পদ্ধতিটি একটি জটিল সেতুর ডিজাইন করা, কিংবা ষ্টক মার্কেটে সব চেয়ে লাভজনকভাবে টাকা খাটানো ইত্যাদি বহু রকম বাস্তব সমস্যা সমাধানে আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশ্য মোক্ষম কম্পিউটার ভাইরাস সৃষ্টি করতে এবং তাকে রোগের ভাইরাসের মতই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আরো বেশি বেশি ভয়ঙ্কর করে তোলার কাজেও এই একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে প্রায় হুবহু জীব বিবর্তনের সিম্যুলেশনেও চমৎকার ফল পাওয়া গেছে– যেখানে বিজ্ঞানী একটি কাল্পনিক জীবজগতের বিবর্তন কম্পিউটারে অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। শুরুতে একটি খুব সরল আদি কম্পিউটার-জীব কাজটি শুরু করে যার নানা সদস্যদের মধ্যে কিছু বৈচিত্র থাকে। তারপর সফ্‌টওয়্যার যেই বিভিন্ন রকম ‘পরিবেশ সংকট’ (কম্পিউটারের ভার্চুয়াল জগতের সংকট) সৃষ্টি করে তাতে টিকে থাকার মত সদস্যটি ওই বৈচিত্র থেকে নির্বাচিত হয়, নির্বাচিত ‘জীবটি’ নিজের অনেক কপি করে যার মধ্যে ইতস্তত কিছু কিছু নতুন বৈচিত্র আপনাআপনি সৃষ্টি হয় (মিউট্যাশন)। তখন এগুলোর মধ্যে আবার টিকে থাকার নির্বাচন হয়। প্রত্যেকবার নতুন নতুন বৈশিষ্টের কম্পিউটার-জীব’ পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত এভাবে বহু রকমের অন্য ‘জীব’ পাওয়া যায় যার সঙ্গে মূল সরল জীবের বিস্তর তফাত। বিজ্ঞানী শুধু কম্পিউটারে সামনে বসে দেখেন আরেকটি বিকল্প জীব-জগত কীভাবে কম্পিউটারে সৃষ্টি হচ্ছে, বিবর্তনের ফলে। এটি সত্য যে কম্পিউটার খুব দ্রুত কাজ করে বলে ওখানে এগুলো চোখের সামনে হতে পারছে। বহু জীবে এক এক প্রজন্ম এবং একটু পরিবর্তন হতে দীর্ঘ সময় লাগে, সেখানে এত সব জটিল জিনিস কেমন করে সৃষ্টি হয়? মনে রাখতে হবে সেখানে কাজ হতে কোটি কোটি বছর সময় হাতে ছিল, ওই রকম দীর্ঘ সময় অনেক কিছু দৈব চান্সের ভিত্তিতেই ধীরে ধীরে বিবর্তিত হবার জন্য যথেষ্ট।

যদি সত্যিকার জীবজগতে আবার ফিরে আসি তা হলে বলতে হয় তার নিজের সাক্ষ্যপ্রমাণেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনের বিষয়টি এখন এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে তা জীববিজ্ঞানের মূল নিয়ন্তার ভূমিকায়। আধুনিকতম কালে এসে ফসিল সম্ভারে ও তার বিশ্লেষণে এত উন্নয়ন হয়েছে যে এই

প্রতিষ্ঠার কিছুটা সেখান থেকে এসেছে। তবে এতে ম্যাজিকের মত কাজ করেছে সর্বাধুনিক ডিএনএ বিজ্ঞান। ডারউইনের সময় তাঁর তত্ত্বের যে গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিলনা আজকের ডিএনএ বিজ্ঞান তাই সম্ভব করেছে। সেই গভীরতা থেকেই এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জীব কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, এবং সেই মৌলিক সত্যটি স্পষ্ট ফুটে ওঠেছে যে আজকের সব জীব একই আদি সরল জীব থেকে বিবর্তনের ধারায় এসেছে। তাই তাদের সবার জীবন রহস্য একই ডিএনএ ভাষায় লেখা– একই 'শব্দ', এমনকি একই 'বাক্য' ব্যবহার করে; একটি জীবের ক্ষেত্রে তা 'পড়তে' পারলে আরেকটি জীবের সম্বন্ধেও অনেকটাই জানা যায়; যদিও সে জানার তাৎপর্য এক এক জীবের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্ন রকম হতে পারে।

ডিএনএ'র কাজের মধ্যে বিবর্তনকে দেখা

প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিকে দেখতে গিয়ে আমরা একটি জীবের একটি দলের একটি সদস্যের ক্ষেত্রে দেখেছি সেটি কী ভাবে কার্যকর হচ্ছে। সদস্যটির সঙ্গে অন্যদের কিছু কিছু বৈচিত্র আছে, তাই সে পরিবেশের সঙ্গে অন্যদের থেকে বেশি খাপ খাওয়াতে পারে বলে বেশি টেকে, তার অপেক্ষাকৃত বেশি সন্তান হয়। পরবর্তীতে সন্তানদের প্রজন্মেও একই ঘটনাগুলো ঘটে এবং তাদের মধ্য থেকে নির্বাচন হয়ে বিবর্তন এগিয়ে যায়। বিবর্তনের এই আবশ্যক শর্তগুলোর প্রত্যেকটি ওই সদস্যের ডিএনএ'র সম্পর্কেও সত্য। আসলে তার ডিএনএ এসব শর্ত মানছে বলেই সেও মানছে। অন্যান্য সদস্যের ডিএনএ'র সঙ্গে তার ডিএনএ'র কিছু বৈচিত্র আছে, কারণ তার বৈশিষ্টগুলো আসে ডিএনএ থেকেই আর বৈচিত্র আসে ডিএনএ মিউট্যাশন থেকে। পরিবেশে খাপ খাওয়াবার ব্যাপারটি তার ডিএনএ'র সম্পর্কেও সত্য। ডিএনএ'র কপি হয় এবং তার কপি বিস্তৃত হয় সন্তানদের মধ্যে। আর মিউট্যাশন হচ্ছে ডিএনএ'র বেইস ক্রমে A,T,C,G ইত্যাদির পরিবর্তন। কাজেই আমরা দেখছি বিস্তারিততে গিয়ে বিবর্তনের সব কিছু মূলত ঘটছে ডিএনএ'র পর্যায়ে। ডিএনএ পর্যায় থেকে বৈশিষ্টগুলো

আবার ওই জীবের বৈশিষ্ট রূপে বহিরঙ্গে প্রকাশ পায়। কাজেই এর সব ব্যবস্থা ডিএনএ'র গুণের মধ্যে থাকতে হবে।

প্রথমে আমরা ডিএনএ'র কপি হওয়ার গুণটি দেখি। যখনই দরকার কপি হওয়ার অর্থাৎ নিজের প্রতিলিপি তৈরি করার ক্ষমতা ডিএনএ'র একটি মৌলিক গুণ। এটি এতই মৌলিক যে পৃথিবীর প্রথম জীব কীভাবে আসলো তার একটি তত্ত্বে কিছু পরীক্ষণের মাধ্যমে ধারণা করা হচ্ছে যে ডিএনএ'র মত একটি অণু সাধারণ কিছু উপাদান একত্র হয়ে দৈবাৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। ডিএনএ'র মত হওয়াতেই তার একটি অদ্ভুত গুণ ছিল যে এটা নিজের কপি তৈরি করতে পারতো– সেই গুণেই এটি হয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর প্রথম জীব।

জীবের সব ডিএনএ তার সব কোষে থাকে। প্রত্যেকটি নতুন কোষ সৃষ্টি হবার সময় তাই আগের কোষের ডিএনএ'কে হুবহু কপি হতে হয়। বিশেষ ভাবে তৈরি কপি সন্তানের মধ্যে যায় বলেই জীবের বংশবৃদ্ধি হয়। ডিএনএ কপি কী ভাবে হয় তা ওয়াটসন ও ক্রিকের আবিষ্কৃত ডিএনএ গঠনটি দেখা মাত্রই আন্দাজ করা গেছে। পরে পরীক্ষণের মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটি নিশ্চিত করা গেছে। যখনই কপি হওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে বিশেষ এনজাইম সক্রিয় হয়ে ওই ডাবল হেলিক্স আকৃতির কুণ্ডলীর দুটি সূত্রকে পৃথক করে ফেলে। এর মানে A ও T এবং G ও C এর যেই বেইস জোড়াগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে দুর্বল বন্ধন টুটে গিয়ে প্রত্যেক সূত্রের বেইস ক্রমগুলো উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। কোষের মধ্যে ডিএনএ'র আশে পাশেই ভাসমান রয়েছে A, T, C, G এসব এক একটি বেইসসংলগ্ন প্রচুর বাড়তি নিউক্লিয়োটিড (ডিএনএ'র একক)– এগুলো জীবের খাদ্য থেকে আসা পুষ্টির অংশ। স্বাভাবিক ভাবেই উম্মুক্ত ডিএনএ সূত্রের একটি A তার সম্পূরক একটি T কে ভাসমানগুলোর থেকে টেনে নিজের সঙ্গে সংলগ্ন করে নেবে। এমনি ভাবে T টেনে নেবে A কে, C টেনে নেবে G কে এবং G টেনে নেবে C কে। এর মানে প্রত্যেকটি পুরানো সূত্রের পাশে নিউক্লিয়োটিডের একটি নতুন সারির আকারে নতুন একটি সম্পূরক সূত্র তৈরি হয়ে যাবে।

আরেকটি এনজাইমের কাজের ফলে পুরোনো ও নতুন এই দুই সূত্র যথারীতি জোড়া লেগে কুণ্ডলী পাকিয়ে আবার একটি ডাবল হেলিক্স ডিএনএতে পরিণত হবে। এভাবে মূল ডিএনএ'র দুটি পুরানো সূত্রের সঙ্গে দুটি নতুন সূত্র তৈরি হয়ে দুটি পুরো ডিএনএই পাওয়া গেল– অর্থাৎ একটি ডিএনএ কপি হয়ে দুটি ডিএনএ হলো; যারা হুবহু একই।

কপি যে ঠিক এভাবেই হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল একবার কপি হওয়ার পর প্রত্যেক কপিতে একটি পুরোনো ও একটি নতুন সূত্র খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে। পরীক্ষাটি করা হলো একটি ব্যাকটেরিয়ার ওপর। ব্যাকটেরিয়াকে লালন করা হয় একটি কাচের প্লেটে (পেট্রি ডিশ) কালচার-মাধ্যমের ওপর তাদেরকে রেখে যেখানে তাদের জন্য পুষ্টি দেয়া থাকে। ওই পুষ্টি উপাদানের মধ্যে যে নাইট্রোজেন থাকে সেগুলোকে ভারী নাইট্রোজেন দিয়ে বদলে দেয়া হলো। সাধারণ নাইট্রোজেন বা N^{14} এবং ভারি নাইট্রোজেন N^{15} নাইট্রোজেনের দুটি রূপ, সাধারণত N^{14} কেই আমরা পাই। কোষের মধ্যে ভাসমান নতুন নিউক্লিয়োটিডগুলো ওই পুষ্টি থেকে আসে বলে তাদের সব নাইট্রোজেন হবে ভারি N^{15}। কাজেই এগুলো থেকে সদ্য তৈরি নতুন সূত্রটি পুরানো সূত্রের থেকে অপেক্ষাকৃত ভারি হবে। কোন তরলে রেখে কোন জিনিসকে যদি সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে খুব দ্রুতবেগে ঘোরানো হয় তখন জিনিসটি ভারি হলে তা ঘূর্ণনের কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ কাছের দিকে জমবে আর হালকা হলে একটু দূরে বাইরের দিকে জমবে। যেমন রক্ত থেকে তার ভারি ও হালকা কণিকাগুলোকে আলাদা করার জন্য যে কোন মেডিক্যাল ল্যাবোরেটরিতে এরকম সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই পরীক্ষণে একবার কপি হওয়া ডিএনএর ক্ষেত্রে দেখা গেল এগুলো পুরো হালকা নাইট্রোজেনের তৈরি সাধারণ ডিএনএ যেখানে জমার কথা সেখানে জমলোনা, পুরো ভারি নাইট্রোজেনে তৈরি ডিএনএ যেখানে জমার কথা সেখানেও জমলোনা, জমলো এই দুইয়ের মাঝামাঝি। বোঝা গেল একটি সূত্র পুরানো (হালকা নাইট্রোজেনে তৈরি) এবং একটি সূত্র নতুন (ভারি নাইট্রোজেনে তৈরি) হওয়াতে এমন হয়েছে।

এবার এই ডিএনএ কপিকে যদি দ্বিতীয়বারের মত আবার কপি করা হয় তখন কী হলো দেখা যাক। এবার কালচার মিডিয়ামে সাধারণ হালকা নাইট্রোজেনই দিয়ে দেয়া হলো। দেখা গেল দ্বিতীয়বার কপি হওয়া কপিগুলো সেন্ট্রিফিউজে দুই জায়গায় জমলো। অর্ধেকটা জমলো আগের বারের মত মাঝামাঝি জায়গায়, বাকি অর্ধেক সাধারণ ডিএনএ যেখানে জমার কথা সেই দূরে হালকার জায়গায়। এটি কেন হলো? দ্বিতীয়বার কপি হবার সময় কুন্ডলী খুলে যাওয়া দুটি সূত্রের একটি ছিল মূল পুরানোটি তাই হালকা, অন্যটি ছিল প্রথমবারের নতুন ভারি সূত্র। দ্বিতীয়বার নতুন হিসেবে যে সূত্র এসেছে তা হালকা, পুষ্টি উপাদানে এবার হালকা নাইট্রোজেন দেয়া হয়েছে বলে। আগের ভারি সূত্রের সঙ্গে এই হালকা সূত্র মিলে যে কপি হয়েছে তা মাঝারি ওজনের, তাই মাঝামাঝি জায়গায় জমেছে। আগের হালকা সূত্রের সঙ্গে এই হালকা সূত্র মিলে যে কপি হয়েছে– তা পুরোটা হালকা ওজনের তাই হালকার জায়গায় জমেছে। কাজেই ডিএনএ কপি হওয়ার পুরো প্রক্রিয়াটি আবারো পরীক্ষণে প্রমাণিত হলো।

বিবর্তনে জিনকে কার্যকর হতে হলে একে কপি যেমন হতে হবে তেমনি আরো কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণ তার থাকতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা হলো তাকে জিন হতে হবে, অর্থাৎ জীবের নানা বৈশিষ্টের বার্তা তার মধ্যে থাকতে হবে। সেটি কী ভাবে থাকে তা এখন আমাদের জানতে হবে। শুধু বার্তা থাকলেই হবেনা, জীবদেহে সেই বার্তা তার দেহবৈশিষ্ট বা স্বভাববৈশিষ্ট হিসেবে বাস্তবায়িতও হতে হবে। সেটি কেমন করে হয় তা বোঝাও জরুরী। বার্তাগুলো বংশ পরম্পরায় সঠিক ভাবে বজায় থাকতে হবে বটে কিন্তু এর মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও সৃষ্টি হতে হবে– মিউট্যাশন রূপে। সেটি না হলে বিবর্তন ঘটতোনা, জীব চিরকাল একই থেকে যেত অন্য জীবে পরিণত হতো না– মানুষ সহ এত বৈচিত্র জীবজগতে দেখা দিতনা। কাজেই ডিএনএ'তে মিউট্যাশন ঠিক কেমন করে সৃষ্টি হচ্ছে তা বোঝাটাও খুব দরকার। এগুলো এখন আমরা একে একে দেখবো।

ডিএনএ'র বার্তা

ডিএনএ'র বার্তা থাকতে হয় জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বাস্তবায়নের জন্য। ওই বৈশিষ্ট সৃষ্টির জন্য বার্তাটি একটি নির্দেশিকা। মেন্ডেল যাকে বলেছিলেন ফ্যাক্টর, পরে যাকে বলা হয়েছে জিন, তারই বার্তা; যেমন মেন্ডেলের মটরশুঁটির বীজের জন্য জিনের বার্তা ছিল 'বীজ মসৃণ হও' কিংবা 'বীজ কুঁচকানো হও' ইত্যাদির মতো। তিনি জানতেননা এই বার্তা ওই ফ্যাক্টর বা জিনের মধ্যে কীভাবে লেখা থাকে। কিন্তু এখন আমরা তা জানি, কারণ ডিএনএ'র গঠন আমরা জানি, তা কীভাবে কাজ করে তাও জানি। ডিএনএ'তে বার্তা থাকে তার সূত্রে A, T, C, G এই চারটি বেইসের ক্রমের আকারে। ডিএনএ'র এক একটি অংশের ক্রম দেয় একটি বৈশিষ্টের জন্য বার্তা– একটি জিন। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য একটি বৈশিষ্টের বার্তা দিতে কয়েকটি জিনের দরকার হয়। সমগ্র জীবটি গড়ে তোলার জন্য এই সব জিন এবং তাদের নিয়ন্ত্রণকারী আরো কিছু ডিএনএ অংশ যেন জীব গড়ার একটি নীল-নক্শার কাজ করে, অথবা বলা যায় রান্নার রেসিপির।

তবে এত জটিল সব বৈশিষ্টের সব বার্তা দিতে ডিএনএ'র কাজটিকে যতটি কঠিন মনে হয় আসলে তা কিন্তু এত কঠিন নয়। যে বস্তুগুলোর কারণে জীবদেহে ওই বৈশিষ্ট সত্যি সত্যি দেখা দেয় সেগুলো হলো নানা রকমের প্রোটিন। প্রোটিনই জীবের সব কাজের কাজী– দেহের কোন অংশ কী রকম রূপ নেবে সেটি নির্ধারণ করবে কোন্ কোন্ প্রোটিন দিয়ে এ সব অংশ তৈরি হয়েছে; দেহের কোন্ কাজ কী ভাবে হবে তাও নির্ধারণ করবে কোন্ প্রোটিনগুলো সেই কাজ করবে তা; জীবটির কী রকম স্বভাব আচরণ ইত্যাদি হবে তা নির্ভর করবে কোন্ প্রেটিন কীভাবে তার মস্তিষ্ক, স্নায়ুবর্তনী, হরমোন ইত্যাদি গড়ে দিচ্ছে তার ওপর। তাই শেষ পর্যন্ত বৈশিষ্টের বার্তা দেয়ার অর্থ হলো কোন্ প্রোটিন তৈরি হবে তার বার্তা দেয়া। নানা প্রোটিন তৈরির এই বার্তাই ডিএনএতে থাকতে হয়।

প্রত্যেক রকম প্রোটিন অণু বেশ বড় ও খুবই জটিল। কিন্তু ডিএনএ'কে এই সব জটিলতার বার্তা রাখতে হয়না। প্রোটিন অণুর মূল গঠনটি হলো এমাইনো

এসিড নামক মোট ২০টি সরলতর অণুর মধ্য থেকে কোন কোনটি পর পর সাজিয়ে গড়া একটি শেকল– যা বিভিন্ন দৈর্ঘের হতে পারে। একবার এই শেকলটি গড়া হয়ে গেলে এর তাতে এমাইনো এসিড-ক্রম ও সেগুলোর গুণাগুণ অনুযায়ী শেকলটি সুনির্দিষ্ট ভাবে দলামোচড়া ভাঁজ হয়ে বিশেষ ওই প্রোটিনটি চূড়ান্ত ভাবে গঠন করে। কাজেই শেষ পর্যন্ত ডিএনএতে বার্তা দরকার শেকলটিতে কোন্ এমাইনো এসিডের পর কোন্ এমাইনো এসিড থাকবে শুধু সেটি বলে দেয়ার জন্য। বাকি কাজের প্রথমটুকু শেকলটি করবে পুরো প্রোটিনটিকে আকৃতি দিয়ে, আর বৈশিষ্ট তৈরির কাজটি করবে এই প্রোটিনটি, অথবা এ রকম কয়েকটি প্রোটিন। মটরশুঁটির জিন যখন বার্তা দিচ্ছে ‘বীজ কুঁচকানো হও’, সে আসলে নির্দিষ্ট একটি এমাইনো এসিড শেকল তৈরি হওয়ার বা না হওয়ার বার্তাই দিচ্ছে। এর ফলশ্রুতিই বীজকে কুঁচকানো করে তুলবে। এ জন্যই বার্তার ব্যাপারটি যতটা কঠিন মনে হয় ততটা নয়।

ডিএনএ সূত্রে A,T,C,G এই ৪টি বেইসের সারিতে যেগুলো কী ক্রমে আছে তাই ঠিক করে দেবে প্রোটিন শেকলে এমাইনো এসিডের ক্রম কী হবে। বেইসই এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে দেবে। ধরে নেয়া যায় যে পরপর যত কম সংখ্যক বেইস একটি এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে দিতে পারে ততই ভাল। যদি একটি বেইস একটি এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে তা হলে ৪টি বেইস মাত্র ৪টি এমাইনো এসিডকে এভাবে নির্দিষ্ট করবে। কিন্তু এমাইনো এসিড আছে ২০টি, বাকিগুলোর কী হবে? যদি পর পর দুটি বেইসের একটি গুচ্ছ একটি এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করে দেয় তাহলে ৪টি বেইসকে আমরা দুটি দুটি করে সাজিয়ে মোট ১৬ রকমে সাজাতে পারি যার প্রত্যেকটি একটি করে এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রেও ৪টি এমাইনো এসিড বাদ পড়ে যায়। আর তিনটি করে বেইসের গুচ্ছ মোট ৬৪টি রকম সাজাতে পারি– ২০টি এমাইনো এসিডকে নির্দিষ্ট করেও তার অনেকগুলো বাকি থাকবে। কাজেই তিনটিই যথেষ্ট; একটি এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব করবে পরপর তিনটি বেইসের একটি গুচ্ছ যাকে বলা হলো কোডন (যদিও নিয়ম মতো বল্‌লে বলতে হয় এন্টিকোডন্, আমরা

এখানকার প্রয়োজনে আপাতত কোডনই বলবো)। কোডিং বা প্রতিনিধিত্ব করে বলেই এই নাম।

ডিএনএর একটি কোডন আমাদের সাধারণ ভাষাগুলোর একটি শব্দের মত কাজ করে যা একটি জিনিসকে বোঝায়– এই ক্ষেত্রে একটি এমাইনো এসিডকে। ডিএনএ এবং সাধারণ ভাষার লিখনের সঙ্গে অবশ্য অমিলও যথেষ্ট। একে তো ডিএনএ কোডন হিসেবে 'শব্দ' লিখতে ব্যবহৃত হতে পারে মাত্র চারটি 'অক্ষর' থেকে নিয়ে– A,T,C,G; আবার তার 'শব্দের' মধ্যে 'অক্ষরের' সংখ্যা থাকে সব সময় তিনটি, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া। তাছাড়া ডিএনএতে বেইস সারিতে এই কোডন 'শব্দ'গুলো যেভাবে থাকে তাতে দুটি কোডনের মধ্যে কোন ফাঁক থাকেনা– সাধারণ ভাষার বাক্যে দুটি শব্দের মধ্যে যে ফাঁক থাকে এখানে তা নেই। মাঝখানে কমা, সেমিকোলনের মত কোন যতি চিহ্নও থাকে না। যা থাকে তা হলো একটানা ফাঁকহীন, যতিহীন বেইস সারি। এর থেকে তিনটি তিনটি করে পর পর নিয়ে কোডনগুলো চিনে নিতে হয় ডিএনএ বার্তা 'পড়ার' সময়। সাধারণ ভাষার শব্দ এরকম ফাঁকহীন, যতিহীন হলে পড়তে খুব কষ্ট হতো। তবে ডিএনএ'র ভাষার এইই নিয়ম।

কোডন যে সত্যি সত্যি তিনটি বেইস দিয়ে তৈরি তার প্রমাণ করতে অবশ্য বেইসের এই ফাঁকহীন বিন্যাস সহায়ক হয়েছে। একটি জিনে পর পর কোডনগুলো একটি একটি এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব কাছে। এখন একটি পরীক্ষণে এমন ব্যবস্থা করা হলো যাতে একটি কড়া ক্যামিকালের প্রভাবে জিনটির ঠিক শুরুতে অর্থাৎ প্রথম কোডনটির ঠিক আগে একটি মিউট্যাশন হয়। এতে সেখানে একটি উট্‌কো বাড়তি বেইস গিয়ে যোগ হয়। এই অবস্থায় প্রোটিনের শেকল তৈরি সময় প্রথম থেকে কোডনগুলো 'পড়তে' গিয়ে বাড়তি বেইস থেকে তিনটি তিনটি করে নিয়ে তাদেরকে এক একটি কোডন ভাবলে সব কিছু গুবলেট হয়ে যায়। এতে অন্য রকম তিনটি বেইসকে পর পর কোডন হিসেবে ধরা হবে যেগুলো মোটেই আগের এমাইনো এসিডগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেনা। ভুল এমাইনো এসিডের শেকল হয়তো কোন প্রোটিনই তৈরি করবেনা, বড়জোর ভুল প্রোটিন তৈরি করবে। পরের বার ক্যামিকাল্‌সের মাত্রা বাড়িয়ে শুরুতে দুটি বাড়তি বেইস যোগ

করলেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে– সব কিছু গুবলেট হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি বাড়তি বেইস যোগ করলে সাধারণত তেমন কোন ঘটনাই ঘটেনা, সব কিছু স্বাভাবিক থাকে। তিন বেইসের একটি বাড়তি পুরো কোডন শুরুতে যোগ হয় বটে, তার ফলে একটি বাড়তি এমাইনো এসিড শেকলে আসতে পারে, কিন্তু বাকি কোডনগুলো অবিকল আগের মতই থাকে, পর পর 'পড়ে যাওয়ার' সময়। কিন্তু যেই তিনটির বদলে চারটি বাড়তি বেইস যোগ করলাম আবার সেই গুবলেট হয়ে যায়। তিনটি বেইসে একটি কোডন হলেই শুধু এমনটি হতে পারে।

এর পর জানতে হবে কোন্ কোডন কোন এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব করছে। এগুলো অনেক নানা পরীক্ষণের মাধ্যমে করে করে দেখে উদ্ঘাটন করতে হয়েছে। এ অনেকটা বিদেশী ভাষা শেখার সময় কোন্ শব্দের সঙ্গে কোন মানে জড়িত সেটি বের করার মত। যেমন একটি জিন থেকে মিউট্যাশনের মাধ্যমে একটি কোডনকে বাদ দিলে তার ফলশ্রুতিতে প্রোটিন শেকলে কোন্ এমাইনো এসিডটি বাদ পড়ে সেটি যদি বুঝতে পারি তা হলে বুঝতে পারবো সেই কোডন কোন্ এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব করে। এ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞানীরা সব কোডনের একটি অভিধান তৈরি করে ফেলেছেন– মাত্র ৬৪টি কোডনের অভিধান। এমাইনো এসিডের সংখ্যা মাত্র ২০ বলে বাদবাকি কোন কোন কোডন যে অর্থহীন তা কিন্তু নয়। দেখা গেছে একটি এমাইনো এসিড একাধিক কোডনের যে কোন একটি দিয়ে সুনির্দিষ্ট করা যায়– কখনো এই বিকল্পগুলোর এটি দিয়ে, কখনো ওটি দিয়ে; আমাদের সাধারণ ভাষাতে যে রকম একটি জিনিস বোঝাতে একাধিক শব্দ ব্যবহার করা যায়। সর্বোচ্চ চারটি পর্যন্ত কোডন এভাবে একটি এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব করে। তারপরও যে কয়টি কোডন বাকি থাকে তার কোন কোনটি জিনের শুরু সূচনা করে তাকে বলা যায় 'প্রারম্ভ' কোডন, আর কোন কোনটি জিনের শেষ সূচনা করে তাকে বলা যায় 'সমাপ্তি' কোডন। এভাবে প্রারম্ভ কোডন আর সমাপ্তি কোডন দেখে বোঝা যায় ডিএনএ'তে একটি জিন কোথায় শুরু হয়েছে, কোথায় শেষ হয়েছে। এই ৬৪টি কোডনের বার্তার

নির্দেশে অসংখ্য প্রোটিন গড়া সম্ভব যেগুলো একটি জীবের সব বৈশিষ্ট সৃষ্টি করতে পারে।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। ডিএনএ'র দুটি সূত্রেই বেইস সারি রয়েছে। বার্তা নেবার জন্য একটি সূত্রকে বেছে নেয়া হয়। সেটি কী ভাবে বাছাই করা হয় সেটি এখনো কিছুটা অস্পষ্ট। তাছাড়া বাছাই করা সূত্রকেও সরাসরি'পড়া' হয়না কোডনগুলো বুঝে নেবার জন্য; বরং এর একটি ছাপ থেকে তা পড়া হয়। ছাপটি আসলে একটি আরএনএ অণু যা অনেকটাই একটি ডিএনএ সূত্রের মত, শুধু তাতে T এর পরিবর্তে U (ইউরাসিল) নামের অন্য একটি বেইস থাকে যেটিও T এর মত A এর সম্পূরক। এই আরএনএ ছাপটি ডিএনএ সূত্রের সম্পূরক হওয়াতে অভিধানে কোডনগুলো এই আরএনএ অর্থাৎ এই সম্পূরক থেকেই নেয়া হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী এই আরএনএর তিনটি করে বেইসই কোডন, যদিও তা আসল ডিএনএ বার্তার ছাপ বা সম্পূরক। যেমন উদাহরণ স্বরূপ অভিধানে GAA এবং GAG এই দুটি কোডনের যে কোনটি গ্লুটামিক এসিড নামক এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্ব করে। GUU, GUC, GUA, এবং GUG এই চারটি কোডনের যে কোনটি প্রতিনিধিত্ব করে ভ্যালাইন নামক আর একটি এমাইনো এসিডের। ATG কোডনটি জিনের প্রারম্ভ বোঝায় আর UAA, UAG, এবং UGA এই তিনটি কোডনের যে কোনটি জিনের সমাপ্তি বোঝায়।

এই যে কোডন অভিধান এটি কোন বিশেষ জীবের জন্য নয়, বরং কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকল জীবের জন্য। সব কোডনের অর্থ, তাদের নির্দিষ্ট করা এমাইনো এসিড, সবই প্রায় সকল জীবের জন্য প্রযোজ্য– উদ্ভিদ বা ব্যাকটেরিয়ার জন্য যেমন, মানুষের জন্যও তেমন। অথচ এদের এই অর্থের ওপরেই সব জীবের জীবনরহস্য নির্ভর করে। সকল জীব যে একই পূর্বসূরি থেকে এসেছে, বিবর্তনই যে তাদের মধ্যে আজকের বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে, কোডন অভিধানটি তার সর্বাধুনিক এবং খুবই শক্তিশালী প্রমাণ।

ডিএনএ বার্তা থেকে জীব-বৈশিষ্ট সৃষ্টি

আমরা দেখেছি ডিএনএ বার্তা হলো ভবনের নীল-নক্শা বা খাবারের রেসিপির মত। নীল-নক্শা যেমন ভবন নয় এবং রেসিপি যেমন খাবার নয়, তেমনি ডিএনএ বার্তাও জীবের বৈশিষ্ট নয়। নীল-নক্শা অনুযায়ী ভবনটিকে তৈরি হতে হবে। তেমনি ডিএনএ বার্তা থেকে জীবের বৈশিষ্টগুলো বাস্তবায়িত করার প্রোটিনগুলো তৈরি হতে হবে। এর মধ্যে একটি সুন্দর সারল্য আছে। বার্তায় যা আছে তা হলো ডিএনএ সূত্রে বেইসের সারি, এখন তার নিরিখেই তৈরি হবে সারির মতই এমাইনো এসিডের শেকল। সারির তিন তিনটি করে বেইস একটি কোডন হয়ে শেকলের একটি এমাইনো এসিড নির্দিষ্ট করে দেবে। ব্যাপারটি এইটুকুই।

এই কাজটি কেমন করে সম্পন্ন হয় তা বুঝতে বিজ্ঞানীরা প্রথম জানার চেষ্টা করলেন এই প্রোটিন তৈরিটি দেহ-কোষের কোন জায়গায় ঘটছে। প্রোটিনের উপাদান ওই ২০টি এমাইনো এসিডগুলো প্রধানত খাবার থেকে এসে কোষের মধ্যে সব সময় থাকে। এগুলোর সবগুলোতে কার্বন থাকে। কোন জীবের খাবারে সাধারণ কার্বনের বদলে তেজস্ক্রিয় কার্বন দেয়া থাকলে ওই তেজস্ক্রিয় কার্বন এমাইনো এসিডে যাবে– যা সহজে তেজস্ক্রিয়া ডিটেক্টর যন্ত্রে ধরা পড়বে। দেখা গেল এই জীবের কোষের মধ্যে ডিএনএ'র কাছাকাছি জায়গায় (নিউক্লিয়াসে) যতখানি তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায় নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের মধ্যে থাকা রিবোজোম নামের কিছু অংশের কাছাকাছি। বোঝা গেল প্রোটিন তৈরির 'কারখানাটি' কোষের ডিএনএ থেকে দূরে কোষের রিবোজোমে। এর মানে হলো প্রোটিন তৈরির বার্তাটি কোন ভাবে সেই কারখানায় পৌঁছতে হবে। ডিএনএ'র কাছাকাছি জায়গায় আরএনএ'র অস্থিত্ব আগে থেকে জানা ছিল। আরো জানা ছিল যে ডিএনএ'র একটি কাজ হলো প্রায়শ আরএনএ সৃষ্টি করা। আর একটি পরীক্ষণে দেখা গেলো যে আরএনএ নষ্ট করে দেয় এমন এনজাইম কোষে ঢোকালে প্রোটিন তৈরির কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এসব থেকে বোঝা গেল যে ডিএনএ'র বার্তাটি আরএনএ'র মাধ্যমেই রিবোজোমে চলে আসে। আরএনএ সৃষ্টি হয় ডিএনএ'র একটি সূত্রের প্রতিলিপির মত করে বিশেষ এনজাইমের

কাজের দ্বারা। প্রতিলিপি হবার সময় যেভাবে ডিএনএ'র দুটি সূত্র আলাদা হয়, এখনো তাই হয়। তবে এক্ষেত্রে শুধু একটি সূত্রের বিপরীতে ভাসমান আরএনএ নিউক্লিয়োটিডগুলো সম্পূরকের মত সারিবদ্ধ হয়ে আরএনএ গঠন করে। এই সূত্রটিকে বলা হয় কোডিং সূত্র। এর ফলে ডিএনএ' বার্তার (বেইস-ক্রমের) একটি সম্পূরক ছাপ আরএনএ'তে চলে আসে। বার্তার এই ছাপ নিয়ে আরএনএ রিবোজোমের কাছে চলে যায় বলে একে বলা হয় 'বার্তাবহ আরএনএ' (মেসেঞ্জার আরএনএ) যা কিনা অভিধান অনুযায়ী নানা কোডনেরই সারি।

ডিএনএ থেকে একটি জিনের ছাপ নিয়ে আসা এক একটি বার্তাবহ আরএনএ'কে নিজের সঙ্গে আটকে রাখে রিবোজোম। ওখানে ভাসমান নানা এমাইনো এসিডগুলো আরএনএ'র এই ছাঁচের কাছে এসে হাজির হয়। এর কারণ হলো প্রত্যেকটি এমাইনো এসিডের সঙ্গে এসময় সংলগ্ন থাকে তার এন্টিকোডন। অভিধানমত যেই এমাইনো এসিডের যেই কোডন সেটির উল্টো অর্থাৎ সম্পূরকই হলো তার এন্টিকোডন। যেমন গ্লুটামিক এসিড নামক এমাইনো এসিডের কোডন যেহেতু GAA তার এন্টি কোডন হবে CTT– এটিই গ্লুটামিক এসিডের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে। একটি এন্টিকোডন তার এমাইনো এসিডকে সঙ্গে নিয়ে এখন বার্তাবহ আরএনএ'তে থাকা যার যার কোডনের কাছে আকৃষ্ট হবে। এভাবে বার্তার কোডন অনুযায়ী এমাইনো এসিডগুলো বার্তাবহের পাশে সারিবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত হয়ে যাবে– তাদের শেকল তৈরি করে। সঙ্গের এন্টিকোডনের সারিটি 'স্থানান্তর আরএনএ' (ট্রান্সফার আরএনএ) হিসেবে পরিচিত। পুরো জিনের প্রারম্ভ থেকে সমাপ্তি কোডন অনুযায়ী এমাইনো এসিডের পুরো শেকল তৈরি হয়ে গেলে এটি রিবোজোম থেকে সরে যায় এবং সঠিক ভাবে ভাঁজ হয়ে যথাযথ প্রোটিন গঠন করে। ওখান থেকে এন্টিকোডনগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে আবার যার যার আর এক প্রস্ত এমাইনো এসিডের সাথে সংযুক্ত হয়। সব কাজ আবার নতুন ভাবে হয়ে একই প্রোটিন আর একটি তৈরি হয়। এভাবে যতক্ষণ প্রয়োজন রিবোজোমের কারখানায় বার্তা অনুযায়ী একই প্রোটিন তৈরি হতে থাকবে

একই বার্তাবহ ছাঁচ থেকে। প্রত্যেকটি জিন এভাবে যার যার প্রোটিন তৈরি করার মাধ্যমে নিজ বার্তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে।

একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ নিয়ে দেখি জিন কার্যত কীভাবে তার বার্তাকে বাস্তবায়িত করে। মেন্ডেলের সেই কুঁচকানো মটরশুঁটির একটি জিনের বার্তার নির্দেশটি ছিল ’বীজ কুঁচকানো হও’– অন্তত মেন্ডেল এবং আমরা সেভাবেই ব্যাপারটিকে দেখেছি। আসলে এই জিনের ভেতর বেইস-ক্রমের কাজের ফলশ্রুতি অনুযায়ী নির্দেশনাটি হবে ‘SBE1 প্রোটিনটি উৎপাদনে বাধা দাও’। এটি বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। যে ক’টি প্রোটিন (এনজাইম) মটরশুঁটির বীজের চিনিকে শর্করায় পরিণত করে, SBE1 তার মধ্যে একটি। এই প্রোটিনটি তৈরি করে যেই জিন, কুঁচকানো-বীজ মটরশুঁটিতে সেটির পরিবর্তিত রূপ থাকে। তাই এই ক্ষেত্রে জিনটি SBE1 উৎপাদন করেনা। ফলে চিনি শর্করাতে পরিণত হবার কাজে বাধা পড়ে। এরকম বীজে তাই শর্করা কম, চিনি বেশি থাকে। চিনি ইত্যাদির দ্রবণে একটি ঝিল্লির এক পাশে দ্রবণের পাতলা অংশ ও অন্য পাশে ঘন অংশ থাকলে ঘন দিক থেকে পাতলা দিকে পানি যায়, যে নিয়মকে অসমোসিস বলে। তার কারণে ওই বাড়তি চিনির বীজে বেশি পানি এসে তা ফুলে যায়। ফলে এ বীজের আবরণটি টান টান হয়ে থাকে। পরে বীজের ভেতরটা পরিপক্ক হবার সময় পানি শুকিয়ে চিমসিয়ে গেলে ওই টান টান থাকা প্রসারিত আবরণটিকে কুঁচকে যেতে হয়। মসৃণ বীজের অপরিবর্তিত সেই জিন চিনিকে বাধাহীন ভাবে শর্করায় পরিণত করে বলে সেখানে এসবের কিছুই ঘটেনা। শর্করার বদলে চিনি বেশি থাকার কারণে কুঁচকানো বীজ খেতেও মসৃণ বীজের চেয়ে মিষ্টি বেশি। মজার ব্যাপার হচ্ছে কোন একটি জিনের নির্দেশ কার্যত ‘বীজ কুঁচকানো হও’ একথা মেন্ডেল বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু কেমন করে সে নির্দেশ পালিত হয় সেটি বুঝতে আমাদের আরো প্রায় দেড়শ’ বছর কেটে গেলো।

ভুল যেখানে কাম্য

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি বিবর্তনের জন্য মিউট্যাশনের প্রয়োজন, যা সাধারণ ভাবে উপস্থিত বৈশিষ্টের মধ্যে কিছু নতুন বৈশিষ্ট নিয়ে আসে। কিন্তু সচরাচর এ ধরনের মিউট্যাশনের পরিণতি জীবের জন্য ভাল হয়না, ক্ষতিকর পরিণতির কারণে এভাবে মিউট্যাশন হওয়া সদস্যটি প্রায়ই টিকতে পারেনা, তার সঙ্গে মিউট্যাশনটিও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কালেভদ্রে মিউট্যাশনটি যে নতুন বৈশিষ্ট নিয়ে আসে তা পরিবেশের সঙ্গে বেশি খাপ খাওয়াতে পারে বলে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয় এবং বেশি বংশবৃদ্ধি করে ছড়িয়ে পড়ে– সেগুলোই জীবকে বিবর্তিত করে। আমাদের প্রজাপতির উদাহরণে সবুজ প্রজাপতির মধ্যে মিউট্যান্ট কালচে প্রজাপতি এমনি ভাল পরিণতি নিয়ে এসেছিলো। অন্য নানা রকম মিউট্যান্টও হয়তো সৃষ্টি হয়েছিলো, যেমন পাখাবিহীন প্রজাপতি– সেগুলো দ্রুত বিলুপ্ত হয়েছে। অভিজ্ঞ ঘড়ি-নির্মাতা উন্নত ঘড়ি তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে ঘড়ির কলকব্জা পরিবর্তন করেন। অন্ধ ঘড়ি-নির্মাতা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘড়ির কলকব্জা নাড়াচড়া করলে ঘড়ি নষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশি। মিউট্যাশন হলো অন্ধ-ঘড়ি নির্মাতার মত উদ্দেশ্যহীন ইতস্তত কাজ, তাই এর পরিণতি সাধারণত ধ্বংসাত্মক। কিন্তু বিবর্তনে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলে এটিই হয়ে পড়ে মূল্যবান জিনিস।

ডিএনএ'র পর্যায়ে দেখলে মিউট্যাশন হলো বেইস-ক্রম থেকে একটি বেইস ঘটনাচক্রে বাদ পড়ে যাওয়া, অথবা একটি বেইস যোগ হওয়া, অথবা একটি বেইস অন্য বেইসে পরিবর্তিত হওয়া। এর কোনকোনটি কেমন ভাবে ডিএনএ বার্তাকে একেবারে গুবলেট করে ফেলতে পারে তাও আমরা দেখেছি। সেক্ষেত্রে পুরো ব্যাপারটিই ধ্বংসাত্মক হবে। কিন্তু কোন কোন মিউট্যাশনের ফলে একটি দুটি কোডন বদলে গিয়ে প্রোটিন শেকলে তাদের এমাইনো এসিড বদলিয়ে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক জিনের প্রোটিনটির বদলে একটি নতুন প্রোটিন সৃষ্টি হতে পারে যা জীবটিকে একটি নতুন বৈশিষ্ট দিতে পারে। সেই বৈশিষ্টটি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারলে টিকে বিস্তৃত হবে, নইলে বিলুপ্ত হবে। তবে অনেক সময় ক্ষতিকর মিউট্যাশনও বাবা অথবা মা'র মধ্যে গৌণ বৈশিষ্ট হিসেবে নীরবে লুকানো

থাকতে পারে, শুধু এক কপি আছে বলে যা তার মধ্যে প্রকাশিত হয়না। পরে কোন সন্তান বাবা ও মা উভয়ের কাছ থেকে পেলে ওই মিউট্যান্ট জিনের দুই কপি পেয়ে সন্তানটির মধ্যে ক্ষতিকর বৈশিষ্টটি প্রকাশ পায়। বংশগত অসুখের মিউট্যাশনগুলো এভাবে ক্ষতিকর হয়েও টিকে আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো বেইস-ক্রমে এই মিউট্যাশনগুলো ঘটে কেন। মরগ্যানের সাদা চোখ মাছির মত নানা ক্যামিকাল্স ইত্যাদি প্রয়োগ করে ঘটানো অবশ্য এক কথা, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা ঘটে কেন? এর প্রধান কারণ হলো ডিএনএ কপি হওয়ার সময় দৈবাৎ তার মধ্যে ভুল ঢুকে যাওয়া– যা এভাবে কপি হওয়ার সময় হতেই পারে। অধিকাংশ ভুলগুলো নিজেই শুধরে নেবার ব্যবস্থা ডিএনএ'র মধ্যেই আছে। কিন্তু তারপরও কিছু ভুল থেকে যায়, যেগুলো নিজেরাও কপি হতে থাকে এবং এমনকি শুক্রকোষে বা ডিম্বকোষে পৌঁছে যায় বলে সন্তানের মধ্যেও চলে যায়। এর ভাল দিক হলো বিশেষ পরিবেশে সুফল দিতে পারে এরকম মিউট্যাশনও সব সময় কিছু কিছু এভাবে তৈরি হয়েছে, এবং তার ফলে বিবর্তনও ঘটতে পেরেছে। যখন মনে করি ধাপে ধাপে মানুষের মস্তিষ্ক বড় ও সক্ষম হওয়ার পেছনেও এরকম ডিএনএ'র কপি হবার ভুলগুলোই দায়ী, তখন বুঝতে হয় এই ভুল কত কাম্য।

কিছু কিছু মিউট্যাশন নিরেপক্ষ ধরনের, এর সুফল বা কুফল কিছুই নেই। বিবর্তনে কাজে না লাগলেও এরা অন্য এক ভাবে চমৎকার কাজে আসে। জীবের লাভক্ষতি কিছু হয়না বলে এগুলো বিলুপ্তও হয়না, আবার বিবর্তিত হয়ে বদলেও যায়না। বরং এরকম নিরপেক্ষ মিউট্যাশনগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম বংশধারায় জমতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বর্তমানের কোন গোষ্ঠির মানুষ অতীতের কোন গোষ্ঠি থেকে বেশি এসেছে তা জানা যায় তাদের মধ্যে বিরল কোন এমনি মিউটেশ্যানের ব্যাপকতা থেকে। এর থেকে অতীত অভিবাসন সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়। এক জায়গার কিছু মানুষ যদি দূরের কোথাও গিয়ে বসত করে তাহলে ওই কয়েকজন মানুষ পরে নতুন জায়গার সব বংশধরদের মধে তাদের নিয়ে আসা এমনই কয়েকটি বিরল এবং নিরপেক্ষ ধরনের মিউট্যাশন ছড়িয়ে দিতে পারে যা এখন মূল জায়গা ও নতুন

জায়গা উভয় জায়গার মানুষের মধ্যে দেখা যাবে। প্রাচীন অভিবাসনের ধারাগুলো আন্দাজ করার যে কটি উপায় আছে– ভাষা বিশ্লেষণ, কালচার বিশ্লেষণ, এবং ডিএনএ বিশ্লেষণ– তার মধ্যে এই শেষোক্তটাই সর্বাধুনিক এবং সব চেয়ে নিখুঁত তথ্য দিতে পারে।

আগেই দেখেছি প্রত্যেক কোষে ডিএনএ বান্ডিলের মত গুটানো অবস্থায় সুনির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোজোম-জোড়ার মধ্যে থাকে। ফলের মাছির মধ্যে এরকম চার জোড়া অর্থাৎ আটটি ক্রোমোজোমে ডিএনএগুলো বিভক্ত থাকতে আগেই দেখেছি। মানুষের মধ্যে আছে ২৩ জোড়ায় ৪৬টি ক্রোমোজোমে। মরগ্যান সেই যে ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনগুলোর অবস্থান জানার জন্য ম্যাপিং শুরু করেছিলেন সেই থেকে এই অবস্থান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন ডিএনএ বিজ্ঞান ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনকে চিহ্নিত করার আরো মোক্ষম উপায় এনে দিয়েছে। পরিচিত জিনগুলোর কোন্‌টি কোন্ ক্রোমোজোমে কোথায় আছে তা জানার ভাল উপায় এখন রয়েছে। একটি উপমা দিলে ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাবে। সকল ডিএনএ বার্তা অর্থাৎ জিনগুলোর তথ্য সম্ভারকে আমরা একটি খুব বড় বইয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি যে বই ১ম, ২য়, ৩য় ইত্যাদি নানা খণ্ডের আকারে বিভিন্ন ভল্যুমে রয়েছে। প্রত্যেকটি খণ্ডকে আমরা এক একটি ক্রোমোজোম-জোড়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ক্রোমোজোম-জোড়ারও নাম হয় ১, ২, ৩ ইত্যাদি করে। প্রত্যেক ক্রোমোজোম-জোড়ার দুই সদস্যে কিন্তু প্রায় একই ধরনের বার্তা থাকে যদিও হুবহু এক নয়। এ দুইটির আকার ও আকৃতি একই এবং পাশাপাশি কাছাকাছি থাকে। সেরকম বইয়ের একটি খণ্ডকেও আমরা দুটি সমান ভাগে বিভক্ত হিসেবে দেখতে পারি যেগুলো '১ম খণ্ড ক' এবং '১ম খন্ড খ' এই ভাবে দুই পাশাপাশি ভল্যুমে লাইব্রেরীর শেল্‌ফে থাকে। এই দুই ভাগে মোটামুটি একই তথ্য আছে– ধরা যাক দুই ভিন্ন ভাষায়।

এখন একটি বিশেষ বার্তা খুঁজতে গেলে আমাকে প্রথম জানতে হবে এটি কোন্ খণ্ড বইয়ে আছে– অর্থাৎ কোন্ ক্রোমোজোম-জোড়ায়। আবার বইয়ের প্রতি খন্ডে যে রকম নানা অধ্যায় আছে প্রত্যেক ক্রোমোজোমে সে রকম কিছু বিভাজনও রয়েছে। যেমন অণুবীক্ষণে যখন একে দেখা যায় তখন

প্রত্যেকটির মাঝে কোমরের মত একটি সরু জায়গা দেখা যায় যা একটি কব্জার মত ক্রোমোজোমকে দুই অংশে ভাগ করে– যদিও অংশ দুটি ঠিক সমান নয়। অপেক্ষাকৃত লম্বা অংশকে p এবং বেঁটে অংশকে q বলা হয়।

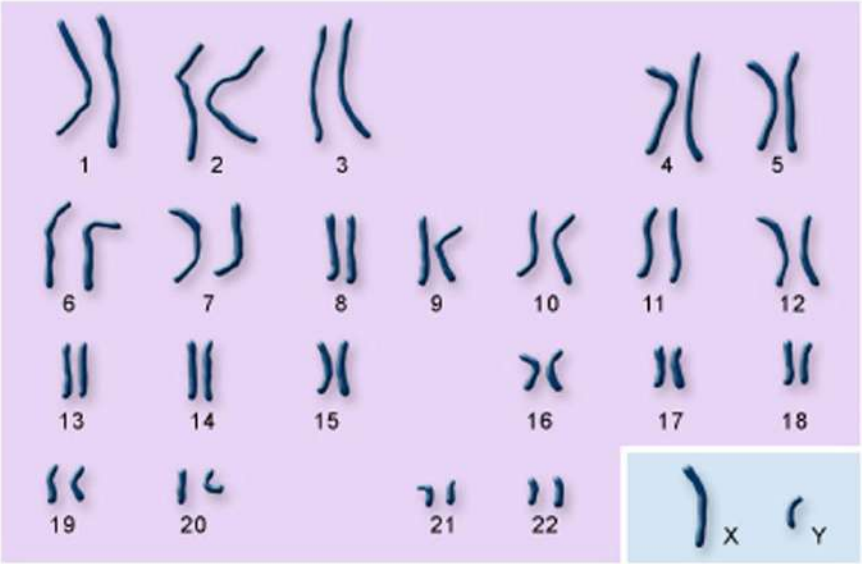

২২ জোড়া সাধারণ ক্রোমোজোম সেক্স ক্রোমোজোম

মানুষের ক্রোমোজোম

মানুষের প্রত্যেক কোষে থাকা ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ছবি যা অণুবীক্ষণে দেখা যায়। প্রত্যেক জোড়ার একটি আসে বাবার থেকে, অন্যটি আসে মায়ের থেকে। ক্রোমোজোম-জোড়ার ক্রমিক নম্বরগুলো দেয়া হয় এদের বড় থেকে ছোট আকারের ক্রম অনুযায়ী। শেষ জোড়াটি সেক্স ক্রোমোজোম হিসেবে কিছুটা ব্যতিক্রমী। পুরুষের মধ্যে এই জোড়ার একটি X ও অন্যটি Y। স্ত্রীর মধ্যে দুটিই X। এই সব ক্রোমোজোমগুলোর মধ্যেই থাকে মানুষের দীর্ঘ ডিএনএ অণু বাণ্ডিলের মত গুটানো অবস্থায়। মানুষের নানা জিনগুলো এই বিভিন্ন ক্রোমোজোমে বন্টিত রয়েছে, এর ডিএনএ'র নানা জায়গায়।

তাছাড়া ক্রো... দাগ একে কয়েকটি ছো... কে আরো স্পষ্ট করে ... p ... q ..., ... অংশগুলোর কোনটিতে– যেমন বইয়ের বার্তা খুঁজতে সেটি বইয়ের কোন্ খণ্ডে, কোন অধ্যায়ে, কোন অনুচ্ছেদে ইত্যাদি।

জিনের কাজ জীবকে একটি বৈশিষ্ট দেয়া; কিন্তু জিন থাকলেই বৈশিষ্টটা পুরাপুরি প্রকাশিত হবে এমন কথা নেই, সেটি নির্ভর করে তার নিয়ন্ত্রক অন্য ডিএনএ'র ওপর। প্রত্যেকটি জিনের সীমানার একটু বাইরে কাছেই আরো কিছু অর্থপূর্ণ ডিএনএ থাকে যা এই জিনটির নিয়ন্ত্রক। এর মধ্যে 'প্রমোটার' নামে একটি অংশ থাকে যা জিনটিকে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হতে দেয়। সেটি ঠিক মাত্রায় কাজ না করলে জিনটি কার্যত প্রকাশিতই হয়না। আবার 'এনহেন্সার' বা 'উদ্দীপক' নামের একটি অংশ আছে যা প্রমোটারের কাজকে উদ্দীপ্ত করে, এবং 'সাইলেন্সার' বা 'নীরবকারী' নামের আরেকটি অংশ আছে যা প্রমোটারের কাজকে অবদমিত করে দেয়। কোষের মধ্যেকার পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এভাবে জিনের প্রকাশকে নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরের এক অধ্যায়ে আমরা দেখবো এই নিয়ন্ত্রণ কত গুরুত্বপূর্ণ– জিনের বার্তা শুধু থাকলেই হবেনা, এই নিয়ন্ত্রনই অনেকটা ঠিক করে দেবে আসল ঘটনা কী ঘটবে। ওখানে আমরা দেখবো আমাদের জিনগুলো কী ভাবে প্রকাশের ভিন্নতা ঘটিয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে সাড়া দিতে পারে তাছাড়া শরীরের নানা কোষে কিছু জিনকে এই নিয়ন্ত্রকের সাহায্যেই সব সময় সুইচ অফ্ করে রাখতে হয়– অর্থাৎ সেখানে এসব জিন মোটেই প্রকাশিত হয় না। আমাদের শরীরের সব কোষে সব জিন রয়েছে। তাই বলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে যে কাজ করতে হয় লিভারের কোষকে তা করতে হয়না, আবার লিভারের কোষকে যা করতে হয় স্নায়ুকোষকে তা করতে হয়না। তাই লিভারের কাজের জিনগুলো স্নায়ুকোষে সুইচ অফ্ থাকতে হবে, নইলে অসম্ভব বিপত্তির সৃষ্টি হবে। জিন থাকলেই তা প্রকাশিত হবেনা, সেটি নির্ভর করতে কোনটির সুইচ অন্ আছে আর কোন্টির অফ্ আছে তার ওপর।

বিবর্তন গড়েছে মস্তিষ্ক

মস্তিষ্কই মন

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে বিবর্তন যেমন জীবের দেহকে দীর্ঘকাল ধরে গড়েছে, তেমনি তার আচার-আচরণকেও গড়েছে। তবে উচ্চতর জীবে আচরণের এই গড়াটি সরাসরি ভাবে হয়না। বরং কথাটি এভাবে বল্‌লেই ঠিক হয়: 'বিবর্তন গড়েছে মস্তিষ্ক, আর মস্তিষ্ক গড়েছে আচরণ'। কেউ কেউ মস্তিষ্ক না বলে তাকে মনও বলতে পারেন, কিন্তু এখন কারো কোন সন্দেহ নেই যে মস্তিষ্কই মন।

দেহ গঠনের ক্ষেত্রে মেন্ডেল মটরশুঁটির উদাহরণে ধরে নিতে পেরেছিলেন, ওই উদ্ভিদের একটি জিন আছে যার বার্তা অনেকটা এরকম– 'বীজ কুঁচকানো হও'। সেই বার্তা অনুযায়ী বীজ কুঁচকানো হয়েছে। এই ধারণায় নীতিগত কোন ভুল ছিলনা। কিন্তু এর বদলে যদি মানুষের বিবর্তন-সৃষ্ট একটি আচরণের বার্তার প্রশ্ন ওঠে, তখন ব্যাপারটি এমন সরাসরি হবেনা। এর জন্যও আমরা একটি উদাহরণ নিই। বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখিয়েছেন যে মাদকের প্রতি আকর্ষণ মানুষের একটি বিবর্তন-সৃষ্ট আচরণ। কিন্তু সেজন্য বলা যাবেনা যে মাদকাসক্তির একটি জিন রয়েছে যার বার্তা হলো– 'মাদকাসক্ত হও'। কুঁচকানো বীজকে দেখিয়ে যেটি আমরা পারি সেরকম কাউকে দেখিয়ে বলতে পারবোনা যে ওই জিনটি আছে বলেই সে মাদকাসক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাপারটি অনেক বেশি জটিল, তবে বিবর্তনের অবদান তাতে স্পষ্ট।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্যার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে প্রাচীন পরিবেশে মাদক-দ্রব্য আছে এমন কিছু উদ্ভিদ ছিল যার প্রতি প্রাচীন মানুষ এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের কেউ কেউ খাদ্য হিসেবে আকর্ষণ অনুভব করতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক সংকটে, খাদ্যাভাবের সময়, শিকার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার সময় প্রাকৃতিক নির্বাচন মাদকসহ এই ব্যতিক্রমী খাদ্য গ্রহণকারীদেরকে বাড়তি

সুবিধা দিয়েছিলো– যা টিকে থাকার ও বেশি সন্তান হবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। ফলে মস্তিষ্কে মাদকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির একটি অংশ গড়ে ওঠেছে– অর্থাৎ আকর্ষণটি মানুষের মধ্যে বিবর্তিত হয়ে কিছু জিন মস্তিষ্কের এই বিশেষ অংশটি গড়েছে। কিন্তু প্রায় একই সময়ে আরো কিছু জিন মস্তিষ্কের আরো অন্যান্য অংশও গড়ে তুলেছে– যেগুলোর কোন কোনটিও মাদকের সঙ্গে সম্পর্কিত। খাওয়ার পর মাথায় বিজাতীয় অনুভূতি হয় এমন খাবার গ্রহণে অনীহা সৃষ্টির কিছু জিনও এর অন্যতম। ক্ষতিকারক খাবার থেকে রক্ষার জন্য তা থাকাই স্বাভাবিক। মাদকের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া এই নেতিবাচক জিনের আওতায়ও পড়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ মস্তিষ্কের এক অংশ মাদকের প্রতি আকৃষ্ট করছে, আর এক অংশ তাতে নিরুৎসাহিত করেছে। এই দুই অংশের টানাপোড়েনে এখন কোন একজনের মস্তিষ্ক কোন আচরণটিকে কাজে পরিণত করবে তা বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। সেরকম একটি পরিস্থিতি হলো কোন কোন কালচারে এমন সব উদ্দাম উৎসব আছে যেখানে আপাতত খাদ্যাখাদ্য বিচারের চেয়ে উদ্দামতাটিই বেশি ভূমিকা রাখে। সেখানে মাদকের প্রতি আকর্ষণের অংশটিই গুরুত্ব পায় বেশি। আবার আধুনিক কালের নাগরিক সমাজে ওই অতীত মাদকের তুলনায় অনেকগুণে বিশুদ্ধ ও তীব্র মাদক হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এখানে আসক্তিটি মস্তিষ্কের জন্য মারাত্মক ধ্বংসাত্মক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আবার এরই প্রতিক্রিয়ায় সব মাদকের কুফলগুলোও ব্যাপক ভাবে সবার জানা হয়েছে। এসব নতুন পরিস্থিতি কোথাও মাদককে বিস্তৃত করছে, কোথাও এর থেকে অধিকাংশ মানুষকে শক্ত ভাবে বিরত রাখছে। এরকম বিভিন্ন বিপরীতমুখি আচরণ দেখা যাওয়ার অর্থ কি ওই জিনগুলো এবং মস্তিষ্কের ওই স্থায়ী প্রবণতাগুলো অবলুপ্ত হয়ে গেছে? গবেষণায় কিন্তু তা দেখা যায়না। ওই মৌলিক জেনেটিক উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মাদক সংক্রান্ত আচরণের প্রতিকার খুঁজলে ভুল করা হবে। একটি জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল মস্তিষ্কের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার ব্যাপারটি আচরণের বিবর্তনকে বেশ জটিল জিনিসে পরিণত করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে মন জিনিসটি মস্তিষ্কের কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়– মস্তিষ্কের বাইরে মনের কোন অস্তিত্ব নাই। অবশ্য মস্তিষ্কের সব কাজই মন নয় বা এর সব অংশ মানসিক ব্যাপারে ব্যস্তও নয়। আচরণ, অনুভূতি, আবেগ, চিন্তা এসব ছাড়াও শরীরকে পরিচালনার অনেক কাজও মস্তিষ্কের রয়েছে যেমন আমাদের হৃদস্পন্দন বা পরিপাক ক্রিয়াকে সচল রাখা। সেগুলো মস্তিষ্কের মানসিক কাজ নয়। কারো কারো কাছে মনে হতে পারে মস্তিষ্ক হচ্ছে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন রক্তমাংসের একটি বস্তু, এর সঙ্গে অনুভূতি বা আবেগের মত বস্তু-গুণ বিবর্জিত জিনিসের কী সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু মস্তিষ্কের কম্পিউটেশন তত্ত্বই এই যোগাযোগের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে। এই তত্ত্বটি বোঝাতে আমরা গাছের গুড়ি নিয়ে যে সাদামাটা কম্পিউটারের উদাহরণ নিয়েছিলাম তাতে গাছের গুড়ি, ফটো-টিউব সবই কিন্তু বস্তুগত জিনিস– কিন্তু তার থেকেই গাছের বয়সের মত বা সময়ের মত একটি ধরা ছোঁয়ার বাইরের জিনিস সম্পর্কে সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়েছিলো। এটিই তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ম্যাজিক। সব কম্পিউটারেই এই ম্যাজিক কাজ করে। সাধারণ কম্পিউটারেও আমরা মানব আচরণ সম্পর্কে নানা গবেষণা করে থাকি– সেগুলোও মানসিক ব্যাপার, বস্তুগত নয়। অথচ কম্পিউটারটির মধ্যে যে সব জিনিস সে কাজগুলো করে সেগুলো নেহাতই সিলিকন বস্তু। মস্তিষ্কেও তাই ঘটে। বস্তু আর অবস্তুর মধ্যে সব বৈপরীত্ব দূর হয়ে যায় যখন আমরা মনের ব্যাপারগুলোকে তথ্য হিসেবে দেখি। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের বস্তুর মধ্যে সেগুলোকে এক রকম চিহ্ন বা কোড ধারণকারী সিগন্যাল রূপে দেখলেও তাই হয়।

বিবর্তনের কাজ মস্তিষ্কের এমন সব সিগন্যাল দেয়ার মত সূক্ষ্ম স্নায়ুবর্তনী সৃষ্টি করা এবং তাতে কম্পিউটার প্রোগামের মত একটি প্রোগ্রাম দিয়ে দেয়া। এই প্রোগ্রাম নানা তথ্যের মধ্যে তুলনা, যাচাই, পুনরাবৃত্তি ইত্যাদি করতে পারে যা কম্পিউটার প্রোগ্রাম মাত্রই করে থাকে। এই প্রোগ্রাম আবার তার ভেতর নানা উপ-প্রোগ্রাম চালু করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তারই কোনটি যৌক্তিক কাজের মাধ্যমে (লজিক) ফলাফলে মাদকের প্রতি একটি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে বটে তবে এই ফলাফলের সঙ্গে অন্য ফলাফলের তুলনা ইত্যাদি

প্রক্রিয়া করে অন্যরকম চূড়ান্ত ফলাফলও দিতে পারে। যে কোন কম্পিউটার যা করতে পারে, মস্তিষ্কের মত জটিল কম্পিউটার তা করতে পারবেনা কেন? তা করতে হলে শুধু যেটি দরকার তা হলো বিবর্তন-প্রদত্ত ওই প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা ও প্রোগ্রাম।

আমরা যখন বলি মস্তিষ্কের কোন অংশ বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তখন ধরে নিই যে মস্তিষ্কের এই অংশের কাজের মাধ্যমে এর অধিকারী এমন কিছু পারিবেশিক সুবিধা পেয়েছে যা তাকে অন্যদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচতে ও বেশি সন্তান দিতে সুবিধা করে দিয়েছে। সুদূর অতীতে কী সুবিধা এটি পেয়েছিলো তা আমরা আজ শুধু আন্দাজ করলে চলবেনা যথেষ্ট নিশ্চিতভাবে বলতে হলে তা নিয়ে ব্যাপক বৈজ্ঞানিক গবেষণার দরকার। কেউ কেউ মনে করেন নেহাত সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক আন্দাজের ওপরেই বিজ্ঞানীরা এই সুবিধাগুলোর কথা বলেন। তাঁরা ভুলে যান যে বিজ্ঞানের এটি রীতি নয়, খুবই আটঘাট বাঁধা পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে তা যথাসম্ভব নির্ণয় করাটাই রীতি। যেমন কয়েক মাসের শিশুর মধ্য থেকে শুরু করে দুনিয়ার সব কালচারের মানুষের মধ্যে সঙ্গীতপ্রীতি দেখে আমরা মনে করতে পারি সঙ্গীতকে ভালবাসা বিবর্তনের ফলে আদি মানুষের মধ্যে এসেছিলো, যেখান থেকে ডিএনএ'র মাধ্যমে আমরা সবাই জন্মগতভাবে পেয়েছি। কিন্তু আদিতে কী সুবিধার কারণে এটি এসেছিলো? এর উত্তরে নানা আন্দাজ করা যেতে পারে। কেউ বলেন সঙ্গীত গাওয়ার আর সঙ্গীত শোনার আনন্দ দলের সব মানুষকে একত্রিত করতে পারতো। ওখানে শলাপরামর্শের ফলে শিকার ইত্যাদির সুবিধা হয়েছে। কেউ বলেন সঙ্গীত ক্লান্তি দূর করে কাজের প্রেরণা যোগাতে পেরেছে বলে বাঁচার সুবিধা করে দিয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্ম গবেষণা ছাড়া এর কিছুই গ্রহণযোগ্য হবেনা। যেমন গবেষণায় দেখাতে হবে যে সঙ্গীত সত্যিই গঠনমূলক কাজের জন্য মানুষকে একত্রিত করতে পারে; বুঝতে হবে কেন তা পারে, বা পারতো। যা আমরা এখনকার মানুষের ওপর প্রমাণ করছি তা সেদিনের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য কিনা তা বুঝতে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সেদিনের পরিবেশ যতটা সম্ভব সূক্ষ্মভাবে জানতে হবে।

মাদকের আকর্ষণ বিবর্তনে কেন সৃষ্টি হয়েছিলো তার ওপর কিছু গবেষণা উদাহরণ স্বরূপ এখানে দেখতে পারি। এই গবেষণায় মাদকের আকর্ষণ সৃষ্টিতে মস্তিষ্কের কোন্ অংশের স্নায়ুবর্তনীতে– বিশেষ করে দুই স্নায়ু তন্তুর সংযোগ স্থলে, ব্যতিক্রমী কী ঘটে; কী ধরনের রাসায়নিক নিউরোট্রান্সমিটার ওখানে কাজ করে; তা জানতে হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় জানতে হয়েছে অতীতে মাদক প্রাপ্তির পরিবেশ। মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তনের গবেষণা আবার আমাদের প্রজাতির মানুষের অস্থিত্বকালের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রাখা যায়না। যেহেতু অনেক কিছুই ঘটেছে তার পূর্বসূরি আরো প্রাচীন প্রজাতিদের মধ্যে– তাদের খবরও নিতে হয়। অন্যদিকে সেই একই পূর্বসূরিদের থেকে আলাদা ধারায় বিবর্তিত হয়ে আজকে যারা আমাদের কিছুটা সদৃশ প্রজাতি তাদের বর্তমান তথ্যও খুব সুবিধাজনক হয়। যেমন শিম্পাঞ্জির স্বাভাবিক মাদকাসক্তি কী রকম তা এই গবেষণায় খুবই প্রাসঙ্গিক।

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা কয়েক কোটি বছর আগের স্তন্যপায়ীদের, ২০ লক্ষ বছর আগের মানুষের পূর্বসূরি হোমিনিডদের মধ্যে, ৪০ হাজার বছর আগে অস্ট্রেলিয়ায় নতুন আসা আদিবাসীদের মধ্যে, মাদক ব্যবহারের সাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছেন। সে সময়ের বিভিন্ন পরিবেশে মাদকের প্রাপ্যতাও তাঁরা নির্ণয় করেছেন। এও তাঁরা আবিষ্কার করেছেন যে ওদের মধ্যে মাদকের আকর্ষণের বিবর্তন এবং কোন কোন উদ্ভিদের বিবর্তন একই ধারায় হয়েছিলো পরস্পর থেকে উৎসাহ পেয়ে– যাকে সহবিবর্তন বলা হয়। আবিষ্কৃত হয়েছে যে মাদকের প্রাপ্যতা আর তীব্রতা তখন কম থাকার কারণে এর পরিমিত আকর্ষণ বিবর্তিত হলেও সত্যিকারের মাদকাসক্তি বিবর্তনের সুযোগ প্রথম দিকে ছিলনা, যা দেখা দিয়েছে পরের দিকে।

সীমিত মাত্রার মাদকের আকর্ষণের যে সুবিধা গবেষণায় ধরা পড়েছে তা হলো এটি উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি সহ্য করতে পারার অধিকতর ক্ষমতা দিয়েছে, উদ্দীপনা ও শক্তি বৃদ্ধি করেছে, এবং দুর্বলতা হ্রাস করেছে– যে সব সুবিধা বিশেষ করে খাদ্যাভাবের সময় খাদ্য সংগ্রহ ও শিকারের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে। তখন মাদকের মাত্রা এমন ছিল যে এ সব সুবিধা থাকলেই মস্তিষ্কে 'সুখানুভূতির' সৃষ্টি হতো । যখন পরিস্থিতি বদলের কারণে ওই সুবিধাগুলো

হতোনা তখন সুখানুভূতির বদলে মাদক ব্যথা, অস্বস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করতো। এর ফলে একই সঙ্গে নির্বাচিত হয়েছে মাদককে আকর্ষণের জিন এবং মাদককে এড়িয়ে যাওয়ার জিন।

এ গবেষণাতেই দেখা গেছে আধুনিক কালে এসে মাদকের তীব্রতা এবং সহজপ্রাপ্যতা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে ওই প্রাচীন সুবিধাগুলোর কিছুই আর পাওয়া যাচ্ছেনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীতে বিবর্তিত হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের কারণে সে নকল এক রকম সুখানুভূতি আদায় করে নিচ্ছে, বর্তমানে মাদকের তীব্রতার কারণে বেশ তীব্রভাবেই। এটিই চরম আসক্তির জন্ম দিয়ে মস্তিষ্কের এই অংশকে ধ্বংস করার আয়োজন করছে। কাজেই আজকের মাদকাসক্তিকে যে নেহাত নিজের অলস ইচ্ছা বা সঙ্গদোষের সৃষ্টি বলে মনে করা যায়না, এর বিবর্তনগত উৎসের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া দরকার– সেটি বুঝতে বিজ্ঞানীদেরকে অনেক গবেষণা করতে হয়েছে। গবেষণাকে বিস্তৃত হতে হয়েছে বিভিন্ন ধরণের মানসিক পরিস্থিতিতে বিবর্তনগত সাধারণ প্রবণতাগুলো কীভাবে প্রকাশিত হয় বা অবদমিত হয় তা নিয়েও। যেমন দেখা গেছে পারিবারিক ঘাত-প্রতিঘাত, দারিদ্র, চরম হতাশা, ইত্যাদি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রবণতাগুলোকে দারুণভাবে সামনে নিয়ে আসছে। প্রাচীন প্রবণতা, আজকের তার পরিণতি, কৃত্রিম সুখানুভূতি, এসবকে হিসেবের মধ্যে না এনে শুধু বাহ্যিকভাবে দেখা যাওয়া সামাজিক বা আচরণগত লক্ষণগুলোর ওপর গবেষণায় পুরো সুফল আসবেনা।

এই ক্ষেত্রে যেমন গবেষণায় দেখা গেছে মাদকের আকর্ষণ প্রাচীন বিবর্তনের সৃষ্টি, তেমনি অনেক অনেক মানবিক প্রবণতার ক্ষেত্রে গবেষণায় তা দেখা গেছে। ক্রমেই নতুন নতুন ক্ষেত্রে এ গবেষণা বিস্তৃত হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা জানি কী ভাবে মস্তিষ্ক আমাদের মধ্যে নানা আচরণ সৃষ্টি করছে। অতীতে এগুলো বিবর্তিত হয়েছিলো কিছু না কিছু সুবিধা পেয়ে গিয়েছিলো বলে, অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেরেছিলো বলে। সঙ্গীতপ্রীতি থেকে সাপের ভয় পর্যন্ত অনেক সহজাত আচরণ এর মধ্যে পড়ে। তবে ব্যাপারটি সোজাসাপটা নয় তা আমরা আগেই দেখেছি। তাছাড়া জিন যেমন জেনেটিক ভাবে মস্তিষ্ককে দিয়ে আচরণ সৃষ্টি করাচ্ছে,

এপিজেনেটিক নামে ডিএনএ'র কিছু প্রান্তীয় বিষয় আবার সেই জিনকে নিয়ন্ত্রণ করে প্রকারান্তে সে আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। সেটি আমরা পরে দেখবো।

আপাত কারণ ও চূড়ান্ত কারণ

গবেষণার মাধ্যমেই জানা যাচ্ছে যে মানুষ এবং অন্যান্য নানা প্রাণীর মধ্যে দেখা যাওয়া আচরণের অনেকগুলোই অতীতে বিবর্তনের সৃষ্টি। এর মানে অতীতে এরা কোন না কোন পরিবেশগত সুযোগ পেয়ে নির্বাচিত হতে পেরেছিলো। তাহলে এই সব আচরণের কারণ হিসেবে বলতে হবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন। এই ঘটনাকেই অন্যভাবে দেখলে কারণ হিসেবে বলতে হয় অধিক সন্তানের দ্বারা অধিক জিন বিস্তারের সুযোগ। পারিবেশিক সুযোগ পেয়েছিলো বলে এই আচরণকারীরা বেঁচে থেকেছে বেশি, সন্তান দিয়েছে বেশি, কাজেই এই আচরণের জিন ছড়িয়েছে বেশি। তাই আজও বহু প্রজন্ম পর আমরা সেই আচরণ দেখতে পাচ্ছি। সবই অবশ্য হয়েছে ওই জিনের দ্বারা উপযুক্ত মস্তিষ্ক গঠনের ফলে। বিবর্তন বা জিন বিস্তার যে আচরণের কারণ শেষ পর্যন্ত এটিই সত্য, এটিই চূড়ান্ত কারণ। কিন্তু এই আচরণটি যে করে সে কি এই কারণের তাড়নায় তা করে? নবজাত শিশু প্রায়ই তারস্বরে কাঁদে। এই কান্নার অভ্যাস বিবর্তিত হয়ে সহজাত ভাবে সে পেয়েছে, কারণ এটি অসহায় শিশুকে বাঁচার ক্ষেত্রে সুবিধা করে দিয়েছিলো। সেটি অবশ্যই কান্নার চূড়ান্ত কারণ। কিন্তু এই মুহূর্তে সে শিশুটি কাঁদছে সেটি কি ওই টিকে থাকার সুবিধার কথা ভেবে কাঁদছে? মোটেই না, সে কাঁদছে তার তাৎক্ষণিক ক্ষুধা, অথবা অস্বস্তির কারণে। কাজেই এই ক্ষুধা বা অস্বস্তি এক্ষেত্রে আচরণের অন্য রকম কারণ, বলা যায় আপাত কারণ।

সব আচরণেই একটি আপাত কারণ আছে, তাৎক্ষণিক ভাবে সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত কারণে অর্থাৎ বিবর্তনে ওই আচরণটি করার মত মস্তিষ্ক যখন গড়ে ওঠেছিলো তখনই সে মস্তিষ্কে ব্যবস্থা হয়ে গেছে কোন্ আপাত কারণে আচরণটি ঘটবে– যেমন শিশুর কান্নার ক্ষেত্রে ক্ষুধা, অস্বস্তি, একাকীত্ব ইত্যাদির যে কোন একটি মস্তিষ্কে ধরা পড়লে, মস্তিষ্ক তাকে কাঁদাবে।

আপাত কারণগুলো সব সময় এতটা স্পষ্টও হয়না, তাই আচরণের বিশ্লেষণের জন্য আপাত কারণটি খুঁজে বের করা প্রয়োজন। সব আচরণের কারণ হিসেবে শুধু চূড়ান্ত কারণ বিবর্তনের কথা বলে ক্ষান্ত দিলে চল্‌বেনা, সেটি মশা মারতে কামান দাগার মত ব্যাপার হবে।

অনেক ক্ষেত্রে বিস্তারিত গবেষণা ছাড়া আপাত কারণ বের করা সম্ভব হয়না। লোভনীয় খাবার সামনে থাকলে কেন খাবারের ইচ্ছা বেড়ে যায় ও অতিভোজন হয়ে যেতে পারে সেটি জানতে গবেষণা না লাগলেও মাদকের মত নীরস ও বিস্বাদ জিনিসে মানুষ কেন আকৃষ্ট হয় তা জানতে গবেষণার প্রয়োজন আছে বটে। মানুষের ওপর সব গবেষণা খুব সহজ না হলেও এ সম্পর্কে অনেকগুলো গবেষণা অন্যান্য প্রাণীর ওপর অপেক্ষাকৃত সহজতর ভাবে করা গেছে।

কাকের বাসায় কোকিল ছা নিয়ে এমনি একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। কোকিল নিজের বাচ্চার যত্ন নেয়না, কাকের বাসায় ডিম দিয়ে কোকিল যে কর্তব্য সেরে ফেলে। কাক এই ডিমকে নিজের ডিমের মতই যত্ন করে, এবং কোকিলের বাচ্চাগুলোকে নিজের বাচ্চা মনে করেই লালন পালন করে। এটি শুধু যে আমাদের দেশের বিশেষ কোকিল বা বিশেষ কাকের মধ্যে ঘটে তা নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে কোকিল জাতীয় অনেক প্রাণিই এই চালাকির আশ্রয় নেয় এবং কাকের মত অন্য 'মেহমানদার' প্রাণীর বাসায় ডিম পাড়ে। স্পষ্টত এতে কোকিলের এই সন্তান উৎপাদনের একটি সুবিধা হয়ে গিয়েছিল– তারা বেশি সন্তান দিতে পেরেছে আর ফলে ওই চালাকি করার জিনটি ক্রম বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য কোকিলের মস্তিষ্ক এত উন্নত নয় যে সে ভেবেচিন্তে নিজের সুবিধার কথা ভেবে এই আচরণটি করে। কোকিল মা'র মস্তিষ্কে নিশ্চয়ই একটি সহজাত সহজ-সরল প্রবৃত্তি আছে যা তাকে দিয়ে কাকের বাসায় ডিম পাড়ায়; সেটিই এর আপাত কারণ। আমরা এখানে অবশ্য কোকিল মা'র এই আচারণের আপাত কারণটি খুঁজবোনা, বরং আলোচনা করবো কোকিল ছানার একটি আচরণের বিষয়ে।

কাকের বাসায় ডিম দিয়ে কোকিল মা তার কর্তব্য শেষ করে বটে, কিন্তু ওই ডিম ফুটে কোকিল ছানা যখন বের হয় তারা এই চালাকিটিকে আরো খানিকটা এগিয়ে নেয়। বিবর্তন কোকিলের ডিম পাড়ার সময়কে কাকের নিজের ডিম পাড়ার সময়ের সঙ্গে এমন সূক্ষ্মভাবে সমন্বয় করে দিয়েছে যে কাকের বাসায় কাকের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার আগে কোকিলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ডিম থেকে বের হয়েই কোকিলের বাচ্চার প্রথম কাজ হয় বেশ কসরৎ করে কাকের এক একটি ডিম তার পিঠে তুলে নেয়া এবং দু'পাশে দুই ডানা বিস্তার করে ডিমটাকে পিঠে ব্যালেন্স করা। এরপর ধীরে বাসার কিনারায় এসে কাৎ হয়ে ডিমটিকে সে গড়িয়ে বাসা থেকে একেবারে নিচে ফেলে দেয়। এভাবে এরা যতগুলো পারে কাকের ডিম নিচে ফেলে নষ্ট করে। সদ্যজাত কোকিল ছানার এই আচরণের কারণ যে বিবর্তনগত তা স্পষ্ট। তবে সেটি চূড়ান্ত কারণ– কাক মা যেন তার নিজের সন্তানদের যত্ন নিয়ে সময় ও শক্তি ব্যয় করার বদলে তা কোকিল সন্তানদের যত্নে ব্যয় করে এটি তারই ব্যবস্থা। সেটি কোকিলের যে বাচ্চারা করেছে তারা অধিকতর বাঁচার আর সন্তান দেবার সুবিধা পেয়েছিলো বলেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সদ্যজাত বাচ্চা এটি করে গেছে। কিন্তু সেই সদ্যজাত বাচ্চার মস্তিষ্কে কিন্তু এত সব ভেবেচিন্তে কাকের ডিম ফেলে দেবার ইচ্ছে জাগার ব্যবস্থা নেই। তা হলে কী আছে, যার জন্য এটি সে ফেলে দেয়। সেটিই আপাত কারণ।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে এই আপাত কারণ উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন অনুমান থেকে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন। হয়তো কোকিল ছানার মাথায় রয়েছে বাসাকে খোলামেলা রাখার একটি প্রবৃত্তি, অনেক ডিম থাকলে যা সম্ভব নয়। হয়তো তারা একে একটি শারীরিক কসরতের খেলা হিসেবে নিয়েছে। অথবা হয়তো বিশেষ রঙের ও আকৃতির জিনিস ফেলে দেয়ার একটি সহজাত প্রবৃত্তি কোকিল বাচ্চার রয়েছে। যেমন বিভিন্ন ধরনের অপরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি করে দেখা গেছে যে কোকিল ছানার সেগুলোর দিকে কোন মনোযোগ নেই। বরং দেখা গেছে তাদের মনোযোগ হলো বিশেষ আকৃতির বস্তুর প্রতি– মোটামুটি গোল আকৃতির। চারকোনা, আয়তাকার ইত্যাদি নানা কৃত্রিম বস্তুকে ফেলার কোন চেষ্টা তারা না করলেও প্লাষ্টিক বা তেমনি কিছুর

তৈরি গোলাকার জিনিস তারা ঠিকই ফেলে দেয়। বস্তুগুলোর রঙ, ঘনত্ব, মসৃণতা ইত্যাদি নানা জিনিসে পরিবর্তন এনে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে কোকিল–ছানার মনোযোগ শুধু এর আকৃতির ওপর। বোঝা গেল তার মস্তিষ্কে ওই আকার-আকৃতির একটি ছাপ রয়ে গেছে যার সঙ্গে মিলে গেলে সে ওই জিনিসগুলোকে পিঠে তুলে ফেলে দেয়ার প্রবৃত্তি অনুভব করে। এটিই তার আচরণের আপাত কারণ হিসেবে পাওয়া গেল।

বিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট হলো যে পর পর বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এর একটি ধারাবাহিকতা থাকে। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আচরণ বুঝতে গেলে অন্য প্রাণীর অনুরূপ আচরণ থেকে তার একটি সূত্র পাওয়া যায়– যদিও মানুষের আচরণ যথেষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির হতে বাধ্য। সন্তানের প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি, আপদ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, সন্তানের যত্ন এগুলো অধিকাংশ উচ্চতর প্রাণীর ক্ষেত্রে খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে সব স্তন্যপায়ী মা'দের ক্ষেত্রে। মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়। এই ক্ষেত্রে প্রাণীতে প্রাণীতে এমন মিল এবং ব্যাপক সর্বজনীনতা দেখে বোঝাই যায় যে এর মূলে রয়েছে বিবর্তন অর্থাৎ নিজের জিন বিস্তার। সাধারণ যুক্তিতেও বোঝা যায় যে যারা এভাবে সন্তানের নিরাপত্তা দিয়েছে তাদের সন্তানরা বেশি বেঁচেছে বলে ওদের মাধ্যমে এই নিরাপত্তা দেবার জিনটি বিস্তৃতি পেয়েছে। এ সম্পর্কে আরো বিস্তৃতভাবে আমরা পরে দেখবো। এখানে এর অবতারণা এই চূড়ান্ত কারণের জন্য নয়, বরং এর আপাত কারণ কী হতে পারে তা দেখতে। এটা তো সত্যি যে মানুষেই হোক বা অন্য প্রাণীতেই হোক কোন মা'ই নিশ্চয়ই জিন বিস্তারের কথা চিন্তা করে সন্তানকে নিরাপত্তা দেয়না। তাদের এর জন্য কোন তাৎক্ষণিক আপাত কারণ থাকে যা তাদের মস্তিষ্কে আছে। আমরা একে বলি সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা, হয়তো অন্য প্রাণীরও এরকম এক ধরনের ভালবাসা রয়েছে সন্তানের প্রতি। কিন্তু এটি মোটা দাগে বলা কথা। এর সত্যিকারের প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করতে হলে এখানেও গবেষণা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে অন্য প্রাণীর ওপর গবেষণা এ কাজের প্রথম ধাপ হিসেবে ভাল দিগ্‌দর্শিকা হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম গবেষণা

অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যে রকম আপাত কারণের সন্ধান দিয়েছে মানুষের ক্ষেত্রেও তা অনেকটা প্রযোজ্য বলে মনে হয়েছে।

এরকম আর একটা উদাহরণ নেয়া হোক। মানুষের প্রায় সব কালচারে বাবা-মা, ভাই-বোন ইত্যাদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে যৌন সম্পর্ককে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয়। দেখা গেছে প্রাচীন মানুষের ক্ষেত্রেও এটি বর্জনের আচরণটি ছিল; শুধু তাই নয় অন্যান্য অনেক প্রাণীর মধ্যেও মোটামুটি এমনটিই নিয়ম। বিবর্তনের চূড়ান্ত কারণটি এখানে স্পষ্ট। যেসব ক্ষতিকর জিন বাবা বা মা'র মধ্যে প্রকাশিত না হয়ে লুকানো থাকে, বাবা ও মা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলে উভয়ের মধ্যেই সেই জিন থাকার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। এভাবে সন্তানের জন্য দুই কপিই ক্ষতিকর জিন থাকাটি মারাত্মক হয়ে ওঠে। তা ছাড়া এমন ক্ষেত্রে জিন-বৈচিত্রেরও অভাব ঘটে। তাই ওই বর্জনের অভ্যাসটি বিবর্তিত হয়েছেন। কিন্তু এর আপাত কারণ কী? বিজ্ঞানীরা গবেষণায় দেখেছেন– আপাত কারণ হলো ছোটবেলার নৈকট্য মস্তিষ্কে বড়বেলায় এক রকম যৌন অনীহার সৃষ্টি করে। এটি অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রথম দেখা গেছে। এখন মানুষের মধ্যেও এই আপাত কারণটি দেখা গেছে।

আধুনিক মাথায় প্রাচীন মস্তিষ্ক

বিবর্তনের কয়েকটি শর্ত মনে করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের প্রজাতির মানুষের মস্তিষ্কে যত সব বিবর্তন তার প্রায় সবই ঘটেছে তুলনামূলক ভাবে প্রাচীন কালে। এরকম একটি শর্ত হলো বিবর্তনের জন্য পরিবেশের প্রতিকূলতা ও সংকট প্রয়োজন– সংকট যখন বেশি ছিল বিবর্তন তত দ্রুত এগিয়েছে। আর একটি শর্ত হলো বিবর্তন সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। আমাদের প্রজাতির মানুষের (প্রজাতি নামঃ হোমো সেপিয়েন্স) জন্য সংকটময় জীবন ছিল তার শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন, যখন তারা ছোট ছোট দলে যাযাবর জীবন যাপন করতো। ঘন ঘন পরিবেশ প্রতিকূলতারও সম্মূখীন তাদেরকে হতে হয়েছে যার বিরুদ্ধে তেমন কোন নিরাপত্তা বিধান তাদের কাছে ছিলনা। মানুষের জনসংখ্যাও ছিল খুব কম– এমনো হতো যে ২০-৩০ জনের এক একটি দলের সঙ্গে অন্য কোন মানুষের দেখা হতোনা

দীর্ঘকাল। এরকম পরিস্থিতিতে প্রায়শ এক একটি দল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকতো। চরম প্রতিযোগিতার পরিবেশে কাটাতে হয়েছে বলে টিকে থাকার জন্য তাদের ওপর সুবিধাজনক নানা বৈশিষ্ট বিবর্তিত হবার চাপ ছিল খুব বেশি। বিশেষ করে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিবর্তন এসেছিলো সেই চাপে সাড়া দিতে গিয়েই।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে মানুষের এই শিকারি-সংগ্রাহকের জীবন শেষ হয়েছে হাজার দশেক বছর আগে কৃষির উদ্ভবের ফলে। অবশ্য এরও বেশ কয়েক হাজার বছর আগে থেকে মানুষ বন্য ফসলকে এক জায়গায় লাগিয়ে কিছুটা স্থায়ীভাবে বসত করতে শুরু করেছিলো। কৃষি, পশুপালন, গ্রাম ও নগর রচনা এসবের পর পরিবেশের সংকট অনেকটাই কেটে গিয়েছিলো মানুষের জন্য। তাই বিবর্তনের গতিও থেমে গিয়েছিলো বলা চলে। এর আগে যতই পেছনে যাই ততই ছিল মানুষের জন্য সংকট কাল– একেবারে লাখ দুয়েক বছর আগে আমাদের প্রজাতির মানুষের উদ্ভব কাল থেকে। আসলে বিবর্তনের ক্ষেত্রে সেখানেও থামার উপায় নেই। তারও আগে আমাদের পূর্বসূরি অন্য প্রজাতির মানুষের মধ্যেও চলেছিলো বিবর্তনের সেই প্রতিযোগিতা এবং মস্তিষ্কের ক্রম গঠন ও উন্নয়ন। খুব সম্ভব আমাদের মস্তিষ্ক গঠনে শেষ বড় পরিবর্তনটি এসেছিলো ৭০-৮০ হাজার বছর আগে যখনো আমরা আমাদের আদি জন্মভূমি আফ্রিকায় সীমাবদ্ধ ছিলাম। আর সেখানেই তখন ভাষা, অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা, নান্দনিকতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের মস্তিষ্কে বড় রকমের সক্ষমতার জন্ম হয়েছিলো। বিবর্তনের দিক থেকে খুব সক্রিয় লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে ১০-১৫ হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই পুরো সময়টিকে আমরা বলবো ‘বিবর্তনের কাল’। এর পর ধরতে গেলে তেমন কোন বিবর্তন আমাদের মধ্যে হয়নি। তাছাড়া বিবর্তন হবার জন্য প্রয়োজন লক্ষ বছর কিংবা নিদেন বহু হাজার বছর, ১০-১৫ হাজার বছর সেখানে অকিঞ্চিৎকর।

কাজেই আজকে আমাদের যে মস্তিষ্ক বিবর্তনের ফল, তার সৃষ্টি সাম্প্রতিক কালে হয়নি, হয়েছে প্রাচীন কালে– সেই বিবর্তনের কালে। তখন তৈরি হয়ে যাওয়া মস্তিষ্কই আমরা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ডিএনএ’র মাধ্যমে লাভ

করেছি। এই অর্থেই আমাদের আধুনিক মাথায় যে মস্তিষ্কটি রয়েছে তার উৎস প্রাচীন কালে। এমন একটি কথাকে আমরা যে মেনে নেবো তার সাক্ষ্য-প্রমাণ কোথায় ? একটি বিষয় লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে কিছুটা আস্থা সৃষ্টি হতে পারে। আজ এত বছর পরেও, পরিবেশের অনেক কিছু বদলে যাওয়ার পরেও আমরা তেমন জিনিসগুলোতেই সহজে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যেগুলোর মধ্যে বিবর্তন কালের মানুষরা ছিল। আমরা সহজাত ভাবেই তেমন জিনিসগুলোকে ভয় করি যেগুলোর ভয়ে সেদিনের মানুষরা অস্থির ছিল। আমাদের প্রাচীন মস্তিষ্কে ব্যাপারগুলো রয়ে গেছে বলেই এমনটি হয়। উদাহরণ স্বরূপ এখনো আমরা ১০-১২ থেকে বড় জোর ২০-৩০ জনের দলে আড্ডা দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি, এবং এরকম দলে মিলে নিজেদের কাজগুলো করতে পছন্দ করি। দল খুব বড় হয়ে গেলে, যেমন এক শ'এর কোঠায় পৌঁছে গেলে এই স্বাচ্ছন্দ্য আর থাকেনা। এটি কি শিকারি-সংগ্রাহকদের সেই ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়ানো সময়ের রেশ আমাদের মস্তিষ্কে থেকে যাওয়ারই ফল নয়? অথচ আজকের যে সংস্কৃতি, যেই প্রযুক্তি তাতে শত শত এমনকি হাজার হাজার মানুষ এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করতে পারে, সভা করতে পারে, কাজও করতে পারে। কিন্তু মনের ভেতরে তাতে নিজেকে কেমন জানি আগন্তক মনে হয়; সরল স্বাচ্ছন্দ্যটি আসেনা।

আমাদের মনের সহজাত ভয়গুলোর উৎস খুঁজতে গেলে আমরা দেখি আজকের দিনে সেগুলোর অধিকাংশের তেমন কোন কারণ নেই। সম্পূর্ণ শিল্পোন্নত দেশে নাগরিক জীবনে বহুতলা ভবনেও যাদের সার্বক্ষণিক বাস, সাপের কথা গল্পচ্ছলেও যারা কোনদিন শোনেনি, তারাও সাপের মত কিছু দেখলে বা মাকড়সার মত কিছু দেখলে তারস্বরে চিৎকার করে ওঠে। এমনকি এগুলো যদি প্লাষ্টিকের সাপ বা মাকড়সাও যদিও হয়। বিবর্তনের কালে কিন্তু মানুষ বিষাক্ত সাপ, বিষাক্ত মাকড়সার কাছে যথেষ্ট অসহায় ছিল– সেই ভয়ই আমাদের সবার মস্তিষ্কে সঞ্চিত রয়েছে। যে স্থানে বা যে পরিবেশে কিছু ভয় আজ একেবারেই অবান্তর– সেই বড় খোলা ময়দানে একাকীত্বের ভয়, সম্পূর্ণ নিরাপদ কাচের দেয়ালের ভেতরে থেকেও উচ্চতার ভয় ইত্যাদি আমাদের ওই অসহায়ত্বের সময়কেই মনে করিয়ে দেয়। আবার অন্যদিকে আজ যে সব

জিনিসকে সত্যি সত্যি ভয় পাওয়া দরকার, যেমন একটি খোলা ইলেকট্রিক তার, ট্রাফিক পূর্ণ রাস্তা ইত্যাদিকে এড়িয়ে চলতে শেখাতে শিশুদেরকে অনেক প্রশিক্ষণ দিতে হয়, কখনোবা বড়দেরকেও। এসবের ভয় সহজাতভাবে মানুষের মধ্যে আসে না। এর কারণ খোঁজাটিও কঠিন নয়। এগুলো সবই সাম্প্রতিক কালের উদ্ভাবন, 'বিবর্তনের কালে' এগুলো ছিলনা বলে আমাদের মস্তিষ্কেও সহজাত ভাবে এগুলো নেই।

অতীতে বিবর্তনকালে আমাদের মস্তিষ্কে যে সব আচরণের বিষয় গ্রথিত হয়েছিলো বেশি দিন বাঁচার ক্ষেত্রে কিছু না কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়েছিলো বলেই তা হয়েছিলো। কিন্তু এখন এগুলোর কোন কোনটির জন্য পরিবেশ এমন ভাবে বদলে গেছে যে আজ এটি বরং বাঁচার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওই আচরণের প্রতি আমাদের সহজাত আকর্ষণ মোটেই হ্রাস পায়নি। পরিবেশ বদলে গেছে, আচরণের ফলশ্রুতিও বদলে গেছে, কিন্তু মস্তিষ্কতো বদলায়নি, এযে আমাদের সেই প্রাচীন মস্তিষ্ক। এরকম আচরণের একটি উদাহরণ হলো চর্বি, মিষ্টি ও লবণ সমৃদ্ধ খাবারের প্রতি আমাদের লোভ। এই লোভটি আমাদের মস্তিষ্কে এসেছে বিবর্তন থেকে। প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের কাছে এ ধরনের খাবারগুলোর প্রাপ্যতা খুব অনিশ্চিত ছিল। সাধারণত খরগোস ইত্যাদি ছোটখাট শিকার দিয়ে তাদেরকে পেট ভরাতে হাতো যাতে চর্বির পরিমাণ তেমন থাকতোনা– সেই শিকারও নিত্য মিলতোনা। কালেভদ্রে বড় হরিণ, বন্যগরু বা এমনি কিছু মিলে গেলে তাতে প্রচুর চর্বি পাওয়া যেতো বটে কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে সব যত পারে দ্রুত খেয়ে নিতে হতো। সারাক্ষণ শিকারের পেছনে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর পুষ্টির জন্য চর্বি এত প্রয়োজনীয় ছিল যে যারা এরকম বড় শিকারের পর প্রচুর চর্বি খেতে লোভ অনুভব করতো তারাই বেশি বেঁচে থাকতে পেরেছে। এভাবে চর্বিদার খাবারের প্রতি অধিক রুচি আমাদের মস্তিষ্কের অংশ হয়ে পড়েছে।

মিষ্টি জিনিসটি অতীতে আসতো বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদ ও পাকা ফল থেকে। পাকার মৌসুমে এগুলো এত হতো যে সে পরিমাণে খাওয়ার মানুষ বা অন্য প্রাণী তেমন থাকতোনা। অন্য সময় আবার তা মোটেই পাওয়া যেতনা।

অথচ শরীরের শক্তি যোগানোতে মিষ্টি জিনিসের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। মৌসুমের সময় তাই যত পারা যায় মিষ্টি খাওয়ার মত মানুষগুলো তুলনামূলক ভাবে অধিক টেকার সুবিধা ভোগ করেছে। লবণের ক্ষেত্রে কথাটি ছিল আরো বেশি প্রযোজ্য। লবণযুক্ত খাবার বা খনিজ লবণ ছিল খুবই দুর্লভ। এক পর্যায়ে নিজেদের মধ্যে বিনিময়ের জন্য যে সব জিনিস মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো সেগুলোর মধ্যে লবণ ছিল অন্যতম। যাযাবর জীবনে হঠাৎ হঠাৎ লবণের উৎস পেয়ে গেলে যারা শরীরের জন্য ওই অতি প্রয়োজনীয় খনিজটি বেশি করে খেয়ে নিতে পারতো তারা নিঃসন্দেহে বাঁচার ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা পেয়েছে। এভাবেই মিষ্টি স্বাদ আর লবণের স্বাদের প্রতি আকর্ষণ আমাদের মস্তিষ্কে অঙ্গীভূত হয়ে আছে।

অথচ আজকের অবস্থা কী? আজ চর্বি, মিষ্টি, লবণ এই তিনটি জিনিসই অন্তত উন্নত বিশ্বের জন্য অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানিকর জিনিস হিসেবে বিবেচিত। যা ছিল প্রাচীন মানুষের জন্য বাঁচার চাবিকাঠি তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আধুনিক সময়ে স্থূলতা, হৃদরোগ ইত্যাদির মাধ্যমে মৃত্যুর বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেকাল থেকে একালে এসে যা বদলে গেছে তা হলো এগুলোর অতিমাত্রায় সহজলভ্যতা– উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ হাত বাড়ালেই এগুলো যথেচ্ছ খেতে পারছে। খেতে পারছে বুঝলাম, কিন্তু স্বাস্থ্যহানির কথা জেনেও খেতে চাচ্ছে কেন? তার কারণ আমাদের সেই প্রাচীন মস্তিষ্ক, যার মধ্যে চর্বিদার, মিষ্টি সমৃদ্ধ ও লবণাক্ত খাদ্য খাবার লোভ অঙ্গীভূত হয়ে আছে। ডাক্তারের পরামর্শে, বা স্বাস্থ্যনীতির প্রভাবে কেউ কেউ বাস্তবে সে লোভ সম্বরন করছেন বটে, কিন্তু লোভ নেই একথা বেশি মানুষ বলতে পারবেনা।

মাদকের প্রতি আকর্ষণটিও বিবর্তনজাত হবার যে উদাহরণটি আমরা আগে দেখেছি সেটিও প্রায় একই রকমের। বিবর্তনের কালে এটি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পেরে বাঁচার জন্য সুবিধাজনক হতে পেরেছিলো তাই তা মস্তিষ্কে অঙ্গীভূত হয়েছে। সুবিধাগুলোর কারণে নিউরোট্রান্সমিটারের মাধ্যমে এক রকম ‘পুরস্কার’ পাওয়া অনুভূতি মস্তিষ্কে সৃষ্টি হতো। এখন পরিস্থিতি বদলে যাওয়ায়, মাদক একেবারে শোধিত ও অনেক কড়া রূপে সহজলভ্য

হওয়ায়, বাঁচার সুবিধাগুলো আর নেই, কিন্তু ‘পুরস্কারের’ অনুভূতিটি মস্তিষ্কে রয়ে গেছে, সেই প্রাচীন মস্তিষ্কে। বরং মাদকের তীব্রতায় সেই অনুভূতি কৃত্রিমভাবে তীব্রতর হয়েছে, আকর্ষণটি আসক্তিতে পরিণত হয়ে বাঁচার বদলে মরণের কারণ হয়েছে। প্রাচীন মস্তিষ্কটিতে উপস্থিত না থাকলে এর কোন কিছুই হতোনা।

প্রাচীন মস্তিষ্ক আধুনিক সমস্যা সামলায় কীভাবে

আমাদের মস্তিষ্কটি প্রচীন সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি হয়েছে এমন কথা যদি আমরা মানি তাহলে একটি বড় প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে। যে মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে প্রস্তর যুগে হরিণ শিকারের, বিষাক্ত সাপের থেকে রক্ষা পাওয়ার, অথবা নিজেদের মধ্যে সমঝোতার সুবিধার জন্য, সেটি ব্যবহার করেই মানুষ উচ্চতর গণিতে ক্যালকুলাস উদ্ভাবন করার, চাঁদে যাওয়ার বা মহামারী বন্ধ করার মধ্যকার সমস্যাগুলো সমাধান করলো কী ভাবে। এসব আধুনিক সমস্যার কোন চিহ্নমাত্র সেই বিবর্তনের কালে ছিলনা– কাজেই সেই প্রাচীন মস্তিষ্কে তার সমাধানের কোন উপায়ওতো থাকার কথা নয়। মোটা দাগে এর যে উত্তর তা হলো বিবর্তন যখন কোন একটি বৈশিষ্টকে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচন করে তখন ঠিক যে কাজের জন্য এটি নির্বাচিত হয় তার বাইরেও তার কিছু করার ক্ষমতা থাকে। বিবর্তনের ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রে এরকম হবার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাখির বিবর্তনের উদাহরণে আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি আদিতে তার পালক সৃষ্টি হয়েছিলো দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে। সেই বৈশিষ্টকেই পরে বাতাস ধরে গাছ থেকে পতন ধীর করার কাজে লাগানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওড়াটাই এর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অথচ মূল বিবর্তনটি ছিল উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে পালকের সৃষ্টি। এমনি ভাবে তাৎক্ষণিক যে সমস্যার সমাধানে মস্তিষ্কের এক একটি অংশ গঠিত হয়েছিলো তাও একেবারে মাপ মতো শুধু সে কাজই করতে পারবে এমন নয়, তারও বাড়তি কিছু কাজ করার ক্ষমতা থেকে গিয়েছিলো।

সেগুলোই পরে আধুনিক সমস্যা সমাধানে কাজ করছে। ওভাবে দেখলে আধুনিক কাজগুলোকে সেই প্রাচীন কাজের উপজাত বলা যেতে পারে।

কিন্তু এমন কথা বলতে গেলে তার সপক্ষে প্রমাণ দিতে হবে। অনেকে বলতে পারেন বাতাস করে দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বাতাস ধরে গাছ থেকে পতন ধীর করার মধ্যে যে পার্থক্য তার তুলনায় হরিণ শিকারের দক্ষতার সঙ্গে থিওরি অফ রিলেটিভিটি আবিষ্কারের দক্ষতার পার্থক্যটি অনেক অনেক বেশি। কাজেই মস্তিষ্কের সেই প্রাচীন সমস্যাগুলোর সঙ্গে তার জন্য আধুনিক যুগের সমস্যাগুলোর আকাশ পাতাল ফারাক, শেষেরটি প্রথমটির উপজাত হবার সম্ভাবনা তাই খুব ক্ষীণ। তবে হ্যাঁ এটি ঠিক যে বিশেষ সমস্যা সমাধানে যে কম্পিউটারটি তৈরি করা হয়েছে, পরে তাকে প্রয়োজনে নতুন অন্য সমাধানেও ব্যবহার করা যায়; সেই হিসেবে প্রাচীন মস্তিষ্ককেও নতুন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারতো। কিন্তু নতুন কাজে লাগালে কম্পিউটারের নতুন প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয়। প্রাচীন মস্তিষ্কে সেই নতুন প্রোগ্রাম কোথায়? এই আপত্তির উত্তর হলো প্রাচীন সমস্যা এবং আধুনিক সমস্যার মধ্যে ফারাক যতটা প্রথম দর্শনে মনে হয় আসলে সে ফারাক এতো বেশি নয়। প্রাচীন সমস্যার সমাধানকে আমরা যত সোজাসাপ্টা ভাবে দেখছি আসলে ব্যাপারটা তাও নয়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ছুটন্ত হরিণের পেছনে ছুটতে ছুটতে তাকে বর্শা ছুড়ে ঠিক জায়গায় ঘায়েল করতে মস্তিষ্কের যতগুলো অংশকে যতগুলো কাজে দক্ষ হতে হয় সেটি সাধারণ ভাবে আমাদের চোখে পড়েনা বলেই আমরা এরকম মনে করছি। আর নতুন আধুনিক কাজের মৌলিক প্রোগ্রামগুলোও ওই প্রাচীন মস্তিষ্কেই রয়েছে, সেটি কেমন করে তা এখন বলছি।

এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আমরা কয়েক মাস বয়সী শিশুকে নিয়ে একটি পরীক্ষণের কথা বলেছি। এতে তার সামনে থেকে পুতুল সরিয়ে নিয়ে এবং পরে পর্দা তুলে ফেল্‌লে সেখানে পুতুলের সংখ্যা দেখে তার নির্লিপ্ত থাকা অথবা অবাক হওয়া থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে খুব সাধারণ এক, দুই ইত্যাদি সংখ্যার ও তার যোগ-বিয়োগের মৌলিক ধারণা তার মধ্যে জন্মগত ভাবেই রয়েছে। এটি তার মস্তিষ্কেই গ্রথিত রয়েছে, তাই সহজাত ভাবে কবিত্ব

ক্ষমতা আছে এমন কাউকে যেমন বলি স্বভাব-কবি, এই শিশুকে বলা যায় স্বভাব-গণিতবিদ– সব মানুষকেই বলা যায়। স্বভাব-কবি যেমন এমনি এমনিতে উঁচু দরের কবিতে পরিণত হয়না, স্বভাব-গণিতবিদও উচ্চতর গণিতবিদ হয়ে যায়না। এটি হতে হলে তাকে স্তরে স্তরে উচ্চ থেকে উচ্চতর গণিত শিখতে হয়, তার চর্চা করতে হয়। কিন্তু ওই সহজাত গাণিতিক ভিত্তিটি না থাকলে কারো পক্ষেই সেটি সম্ভব হতোনা– যেমন করে সর্বজনীন ব্যাকরণটি সবার মস্তিষ্কে গাঁথা না থাকলে পরে কেউ ভাষার চর্চা করতে পারতোনা। ওই সহজাত ক্ষমতাগুলোই মস্তিষ্কের জন্য মৌলিক প্রোগ্রামের কাজ করে। স্বভাব-গণিতবিদের ব্যাপারটি যেভাবে পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে সেরকম নানা পরীক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে মানুষের প্রাচীন মস্তিষ্কই প্রাচীন সমস্যার কারণেই তাকে স্বভাব-বিজ্ঞানী, স্বভাব-প্রকৃতিবিদ, স্বভাব-যুক্তিবিদ, এমনকি স্বভাব-মনোবিজ্ঞানীতেও পরিণত করেছে।

তিন-চার মাস বয়সী শিশুর সামনে থেকে পুতুল সরিয়ে পরীক্ষণটির মত আরো কিছু পরীক্ষণে তার আরো কিছু সহজাত ক্ষমতা ধরা পড়ে। শিশু তার সামনে একটি বড় ভিডিয়ো পর্দায় একটি বড়সড় ফোটাকে যদি পর্দার এক কোনা দিয়ে পর্দায় ঢুকতে দেখে এবং তা ধীরে ধীরে পর্দা অতিক্রম করে অন্য কোনা দিয়ে পর্দা থেকে অদৃশ্য হতে দেখে, তা হলে সে এতে নির্লিপ্ত থাকে– যা তার চোখ দেখে বোঝা যায়। কিন্তু সে যদি দেখে যে ফোটাটি পর্দায় খানিকটা এগিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হলো, আবার পরক্ষণই পর্দার সম্পূর্ণ অন্য একটি অংশে তাকে দেখা গেলো অন্য পথে পর্দা অতিক্রম করতে– তাহলে সে খুব অবাক হয়। এর কারণ সে একজন স্বভাব-পদার্থবিদও বটে। তার স্বভাব-পদার্থবিদের মস্তিষ্ক বলছে এটি হবার কথা নয়, কোন বস্তুর চলার পথকে নিরবিচ্ছিন্ন রেখায় থাকতে হয়। এটি স্থান ও গতি সম্পর্কে তার সহজাত জ্ঞানের প্রকাশ। প্রায় একই ধরনের ভিডিয়ো পর্দার পরীক্ষণে বোঝা যায় যে শিশু জানে যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুর ভেতর দিয়ে চলে যেতে পারে না, একটি বস্তু যখন আরেকটি বস্তুকে নাড়ায় তখন তাদেরকে পরস্পর সংলগ্ন হতে হয়, ইত্যাদি। এগুলো প্রাচীন আটপৌরে পদার্থবিদ্যার কিছু ধারণা, কিন্তু তবুও পরবর্তী একাডেমিক পদার্থবিদ্যার জন্য আবশ্যকীয় ভিত্তি।

কয়েক মাসের শিশু জীব ও জড়ের পার্থক্য বোঝে। আবার সব ধরনের কালচারে সাধারণ কোন রকম শিক্ষা না পাওয়া মানুষও সহজাত ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নানা বিষয় স্বভাব-প্রকৃতিবিদের মতই জানে। শিশুর মা এক বছরের শিশুকে যখন খেলনা গাড়ির বদলে এক পাটি জুতাকে বা একটি ছোট পিড়িকে ঘরের মেঝেতে গাড়ির মত শব্দ করে শিশুর দিকে এগিয়ে দেয়, শিশু সেটি নিয়েই বোঁ বোঁ করে গাড়ি চালাতে থাকে। মা ও শিশু দু'জনেই বোঝে যে তারা পরস্পরের সঙ্গে একটি প্রতীকী খেলা খেলছে, শিশুর জন্য সেটি একটি স্বভাব-মনোবিজ্ঞানী হবার ব্যাপার। এখানে যত উদাহরণ দেয়া হয়েছে তার কোনটাই কেউ শিক্ষার মাধ্যমে পায়নি, বরং নিজের মস্তিষ্কে সহজাত ভাবেই পেয়েছে। এর সবই তার প্রাচীন মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন সমস্যাগুলো সমাধান করতে গিয়েই। ওই সমস্যাগুলো এমন জটিল ছিল যে তার জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে স্বভাব-গণিতবিদের, স্বভাব-ভাষাবিদের, স্বভাব-বিজ্ঞানীর, স্বভাব-মনোবিজ্ঞানীর ক্ষমতা সৃষ্টি হতে হয়েছিলো। এখন আধুনিক কালের অনেক উচ্চতর গণিতবিদের, অনেক উচ্চতর বিজ্ঞানীর, কিংবা ভাষাবিদের সৃষ্টি হতে হলে ওই স্বভাব-সক্ষমতাগুলোর ভিত্তির ওপরেই শিক্ষণ ও চর্চার কাজ করে তা করতে হয়েছে। ওই শিক্ষণ ও চর্চার ক্ষমতাটিও ওই প্রাচীন মস্তিষ্কে প্রাচীন সমস্যা সমাধানেই তৈরি হয়েছিলো। আমরা স্বাভাব-গণিতবিদের সঙ্গে উচ্চতর গণিতবিদ্যার সম্পর্ককে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করবো।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে স্বভাব-গণিতবিদ আমরা যাকে বলছি সংখ্যা, স্থান, সময় ইত্যাদি সম্পর্কে তার জ্ঞানটুকু মৌলিক হলেও খুব সরল। এর ওপর নির্ভর করে উচ্চতর গণিতের মত একটি জটিল ও বিচিত্র জগত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাঁদের বিকল্প তত্ত্ব হচ্ছে এই স্বভাব-গণিত থেকে নয়, উচ্চতর গণিত সৃষ্টি হয়েছে মানুষের ভাষা সৃষ্টির একটি উপজাত হিসেবে। ভাষা সৃষ্টিতে মস্তিষ্কের যে অসম্ভব কারুকার্য দরকার হয়েছে উচ্চতর গণিতেও তার অন্য একটি রূপ দেখা গেছে– এটি 'ভাষা-নির্ভর গণিত তত্ত্ব'। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই বিকল্পটিকে সমর্থন দিচ্ছেনা। বরং এই গবেষণা দেখিয়েছে যে স্বভাব-গণিতই উচ্চতর গণিতের জন্য একটি কাঠামো হিসেবে

কাজ করেছে; মূল যে সমস্যা থেকে স্বভাব-গণিত এসেছে তার বস্তুগত জিনিসগুলো বাদ দিয়ে শুধু বিমূর্ত কাঠামোটিকে যদি আমরা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে দিই তা হলেই উচ্চতর গণিতের জগতটি গড়ে ওঠতে পারে। এতে হরিণের গতি-পথই হয়ে দাঁড়ায় একটি গ্রাফ কিংবা জটিল গাণিতিক ফাংশন। এ যেন বস্তুগত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ের এক রকম উপমা গড়া।

মস্তিষ্কবিদরা (নিউরোলজিষ্ট) সম্প্রতি বিষয়টিকে অন্যভাবে প্রমাণ করেছেন। তাঁরা এজন্য এম আর আই ইমেজিং সিষ্টেমের একটি উন্নত রূপ ব্যবহার করেছেন, কাউকে গণিতের কাজ করতে দিয়ে তার মস্তিষ্কের স্নায়ুবর্তনী জালের কোন্ কোন্ অংশ উদ্দীপ্ত হয় তা এর দ্বারা দেখার জন্য। এভাবে একেবারেই কখনো কোন গণিত চর্চা করেনি এমন স্বভাব-গণিতবিদকে সংখ্যা নিয়ে সরল কাজ করতে দিয়ে তাঁরা ইমেজিঙে লক্ষ্য করেছেন স্বভাব-গণিতে মস্তিষ্কের কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয়। এরপর ১৫ জন বিজ্ঞ গণিতবিদকে উচ্চতর গণিতে যাঁর যাঁর পারদর্শিতার ক্ষেত্রে কাজ করতে দিয়ে একই ভাবে মস্তিষ্কে ইমেজিং করেছেন। দেখা গেছে মস্তিষ্কের যে সব অংশ এতে ব্যবহৃত হচ্ছে তার সঙ্গে স্বভাব-গণিতের অংশের কিছু উপরি-পাতন আছে অর্থাৎ কিছু অংশ উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অন্যদিকে ওই গণিতবিদদেরকে সাধারণ ভাষাগত কাজ করতে দিয়ে দেখা গেছে যে তাতে উদ্দীপ্ত মস্তিষ্কের অংশের সঙ্গে গণিতে উদ্দীপ্ত অংশের কোন নৈকট্য নেই। পরীক্ষণকে আরো নিখুঁত করার জন্য ইমেজিঙের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ গণিত ও অর্থহীন গণিতের তুলনা, বিভিন্ন মানববিদ্যায় ওই গাণিতিকদের মত সমপর্যায়ের পারদর্শীদের নিজ নিজ কাজ করতে দিয়ে তাদের উদ্দীপ্ত অংশের তুলনা, ইত্যাদি করা হয়েছে। সবদিক থেকে বোঝা গেছে অর্থপূর্ণ উচ্চতর গণিতের সঙ্গে শুধু স্বভাব-গণিতের নৈকট্য, অন্য কোনটির সঙ্গে নয়। স্পষ্টত প্রাচীন মস্তিষ্কের স্বভাব-গণিত থেকে উচ্চতর গণিত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, ভাষা বা অন্য কিছু থেকে নয়। এমনি ভাবে অন্যান্য আধুনিক ক্ষমতাগুলোও প্রাচীন মস্তিষ্কের সহজাত ক্ষমতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তন কালের ওই মস্তিষ্ক বিবর্তনই আধুনিক সমস্যার সমাধানও সম্ভব করেছে।

অনেক বড় বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ মানুষের সৃষ্টি করা উচ্চতর গণিতের ফলাফলের সঙ্গে আবিষ্কৃত হওয়া প্রকৃতির অনেক নিয়ম হুবহু মিলে যাওয়াকে একটি অলৌকিক ঘটনা মনে করেছেন। এই মিলে যাওয়াটি বোঝা যায় যখন বিজ্ঞানী গণিত কষে প্রকৃতির একটি নিয়মের ভবিষ্যৎদ্বাণী করেন, আর তা প্রকৃতিতে সত্যি সত্যি পাওয়া যায়। এতে মনে হতে পারে মানুষ ওভাবে গণিত তৈরি করবে এমন কথা জেনেই যেন প্রকৃতিও সেভাবে নিজেকে গড়ে নিয়েছে। এটি সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। অনেকে এখন মনে করছেন হয়তো প্রকৃতির মৌলিক ধারণা আর গণিতের মৌলিক ধারণা মানুষের মস্তিষ্কে একই জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে বলেই এমনটি মনে হচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে প্রাচীন কালে প্রাচীন সাদামাটা জীবনের প্রয়োজনে সৃষ্ট আমাদের মস্তিষ্কে এত কিছুর মৌলিক প্রোগ্রাম ঢুকে গিয়েছিলো।

প্রাচীন সমস্যার সমাধানের জন্য তৈরি মস্তিষ্ক কী করে আজকের উচ্চতর সমস্যা সমাধানে সুন্দর ব্যবহৃত হচ্ছে তার অন্যরকম আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের প্রজাতির মানুষ উদ্ভবের বহু আগে থেকেই হোমো ইরেকটাস নামের মানব প্রজাতির মধ্যে প্রাণী-শিকারে দক্ষতার জন্য একটি জরুরী গুণ বিবর্তিত হয়েছিল। সেটি হলো ছুটন্ত পশুকে জোরে দৌড়ে অনুসরণ করে, তার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে, তার শরীরের সঠিক জায়গায় সজোরে বর্শাবিদ্ধ করতে নিজের যে ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন সেটি মস্তিষ্কে সৃষ্টি করা। এজন্য অন্তকর্ণের কিছু গঠনের মাধ্যমে ভারসাম্য সম্বন্ধে মস্তিষ্কে তথ্য পাঠাবার ব্যবস্থা সৃষ্টিও প্রয়োজন হয়েছিলো। হোমো ইরেকটাসদের ফসিল গবেষণায় তাদের মধ্যে অন্তকর্ণের ব্যাপারটি ধরা পড়েছে– যা এখন আমাদের অন্তকর্ণেও আছে। তাছাড়া প্রত্নতত্ত্বে আবিষ্কৃত তাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে ভারসাম্য রাখার ব্যাপারটিতেও নিশ্চিত হওয়া গেছে। সেই থেকে এই ক্ষমতাটি মানুষের মস্তিষ্কে আছে। যাদের এতে কিছু ঘাটতি আছে গাড়িতে, বিমানে বা জাহাজে ভ্রমণ করার সময় ওই যানের অধিক নড়াচড়ায় তাদের প্রায়ই বমি পায়, যাকে মোশন সিকনেস বলা হয়। প্রাচীন মস্তিষ্কের এই ক্ষমতাটি এখন আমাদের অধিকাংশদের জন্য হরিণ শিকারের কাজে লাগেনা। তবে এর অন্যান্য নানা উচ্চতর ব্যবহার আমরা উদ্ভাবনমূলক ভাবে গড়ে

তুলেছি তারই ওপর ভিত্তি করে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটি ব্যবহার করেই সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর চড়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের চূড়া পর্যন্ত ওঠেন, আর তার সঙ্গে নামেন– যেই সার্ফিং দেখে আমরা মুগ্ধ হই। ওটি তাঁরা প্রশিক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে অর্জন করেছেন। যাঁরা মহাশূন্যে যাবেন তাঁদের জন্য একই বিষয়ে আরো অসম্ভব কড়া প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে কারণ মহাশূন্য ভ্রমণে অসম্ভব রকম গতির ত্বরণ এবং মহাশূন্যযানের দারুণ কাঁপুনি তাঁদেরকে ভারসাম্য বজায় রেখে সহ্য করতে হবে। এই প্রশিক্ষণের ফলেই হয়তো তাঁদের অনেকে চাঁদে না হোক অন্তত মহাশূন্য ষ্টেশনে যাবেন। পশুর পেছনে ছোটার সময় ভারসাম্য রাখার সক্ষমতা প্রাচীন মস্তিষ্কটিতে তখন বিবর্তনের ফলে গড়ে না ওঠলে এসবের কিছুই সম্ভব হতো না। প্রাচীন মস্তিষ্ক আধুনিক কাজ করতে পারে বৈকি!

মস্তিষ্কের নীরব কাজ

শুধু মানুষের মধ্যে নয়, তারও বহু আগে আরো নানা প্রাণীর মধ্যে মস্তিষ্কের বিবর্তন কেন ঘটেছিলো? এর মূল উত্তরটি আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছি। মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছে তথ্যের প্রক্রিয়াকরণের জন্য, আর প্রাণীর পরিবেশিক সুবিধার জন্য তথ্য যে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস তা আমাদের চেয়ে ভাল আর কে জানে। তাই ক্রমে মস্তিষ্ক বড় হয়েছে, জটিল হয়েছে, তার কাজের পরিধি বেড়েছে– বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এবং তাদের ভেতর আরো বেশি করে প্রাইমেটদের মধ্যে (বানর, এইপ ও মানুষের যে প্রাণী-গোষ্ঠি)। সরু দীর্ঘ তন্তুর আকারের এক স্নায়ুকোষের নানা বিকল্প সংযোগ স্থলের সঙ্গে অন্য স্নায়ু কোষের নানা সম্ভাব্য সংযোগের যে বহু বৈচিত্র হতে পারে তাদের মধ্য থেকে বাছাই হয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুবর্তনী এবং স্নায়ুবর্তনীজাল। কম্পিউটারের মত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ এরাই করে। নানা মিউট্যাশনে সৃষ্ট নানা নতুন স্নায়ুবর্তনীর মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ সুবিধার কারণে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়ে গড়ে ওঠেছে নানা প্রাণীর মস্তিষ্ক। কিছুটা গড়ার পর তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া আরো অগ্রসর হয়েছে। মস্তিষ্কেই বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়েছে বাইরের তথ্য গ্রহণ করে শেখার

সক্ষমতা। এই শেখার সক্ষমতাও আবার মস্তিষ্ক বিবর্তনের ক্ষমতাকে ত্বরান্বিত করেছে।

এই কারণেই পিঁপড়া বা মৌমাছির মত প্রাণীর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও এমন সব দুর্দান্ত পরিমাপ ও হিসাবের কাজ করতে সক্ষম যা রীতিমত তাক লাগিয়ে দেবার মত। মরুভূমিতে থাকা কিছু পিঁপড়া আছে যারা ধূধূ মরুভূমিতে ছোট শিকারের পেছনে এলোমেলো ভাবে ছুটতে ছুটতে অনেক দূর চলে যায়। শিকারের নাগাল পেলে তার মৃতদেহ থেকে অংশবিশেষগুলো মুখে নিয়ে ওই শেষ গন্তব্য থেকে এবার একেবারেই সরল রেখায় ক্ষুদ্রতম পথে নিজেদের ক্ষুদ্র প্রায়-অদৃশ্য গর্তের মুখে সোজা ফিরে আসে। এ কাজটি করার জন্য পিঁপড়ার মস্তিষ্ককে যা করতে হয় তা উচ্চতর গণিতের ‘প্যাথ ইনট্রিগেশন’ নামক পদ্ধতির সমপর্যায়ের। সর্বাধুনিক ধারণামত পিঁপড়া সূর্যের অবস্থান অথবা সূর্যের পোলারায়িত আলোর দিকটিকে একটি স্থির অক্ষ হিসেবে ধরে নিয়ে সেখান থেকে তার গতিপথের প্রত্যেকটি আলাদা সরল রেখার দিকের কোণ পরিমাপ করে, তারপর এই প্রত্যেকটি অংশে অতিক্রম করা তার দুরত্বটি হিসেব করে ফেলে খুব সম্ভব তার পদক্ষেপের সংখ্যা গণনার মাধ্যমে। এভাবে বহুভূজের মত যে ক্ষেত্রটি তৈরি হলো তার বাকি সবগুলো বাহুর তথ্য থেকে অজানা বাহুটি অর্থাৎ একেবারে সোজা ফিরে আসার বাহুটি নির্ণয় করে। এসব অনেক পরিমাপ, অনেক হিসেব, যথেষ্ট উচ্চ গণিতের ব্যাপার। এই একই পদ্ধতিতে ফিরে আসার পথ নির্ণয়ের ক্ষমতা অনেক পাখি এবং অনেক স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কে আছে।

মৌমাছি যা করতে পারে তা আরো চমকপ্রদ। কারণ সে ওই ধরনের উচ্চতর গাণিতিক হিসেবে শুধু করেইনা তার ফলাফলগুলো সহকর্মীদেরকে নিখুঁত ভাবে জালিয়ে দিতে পারে– যাতে ওরা সেই তথ্য নিয়ে একই পথে যেতে পারে। মৌমাছির নানা দিকে ইতস্তত ফুল খুঁজে বেড়াবার সময় অনেক দূরে গিয়েও যদি সে কোন মৌ-ফুলের বাগানের সন্ধান পায়– সোজা তার মৌচাকে ফেরৎ গিয়ে চাকের অন্য শ্রমিক মৌমাছিদের কাছে সব খবর অদ্ভুত এক নাচের

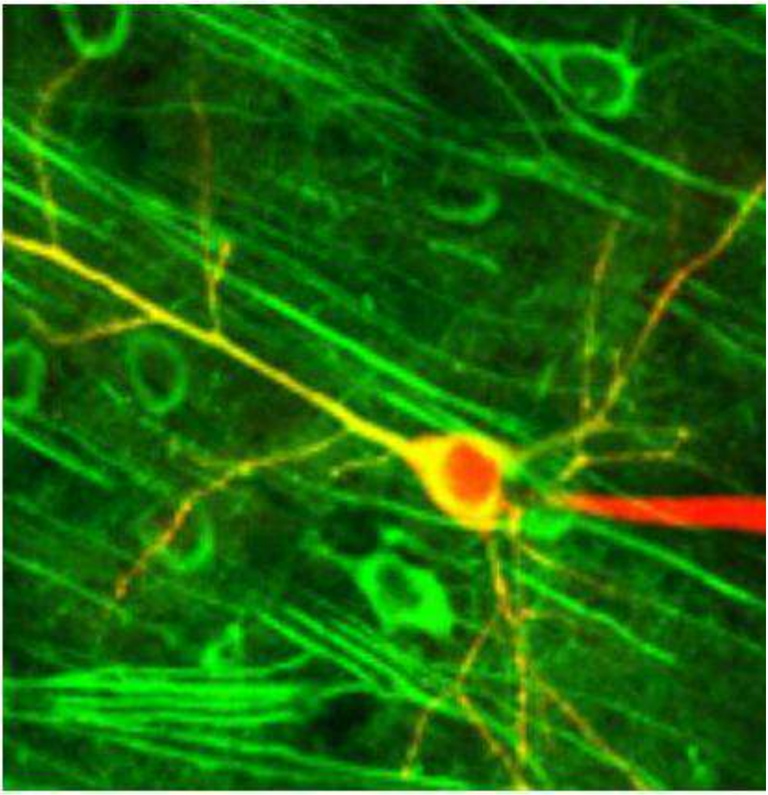

মস্তিষ্ক ইমেজে স্নায়ুকোষ বর্তনীজাল উদ্দীপ্ত হবার ছবি

মস্তিষ্কে চিন্তা, বুদ্ধি, স্মৃতি, আচরণ-সৃষ্টি সব কাজের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ হয় প্রত্যেকটি দীর্ঘ অসংখ্য স্নায়ুকোষ নিউরোনের বর্তনীজালে। এতে যে সব নিউরোন উদ্দীপ্ত হয় তা আতশ বাজির মত এক ধরনের ফায়ারিং প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। আধুনিক ইমেজিং পদ্ধতিতে এই আণুবীক্ষনিক ফায়ারিং ধরা পড়ে এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণায় তা খুব সহায়ক হচ্ছে।

মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। পিঁপড়ার মত প্রায় একই পদ্ধতিতে সে সরাসরি রেখায় ফুলের অবস্থান-দিক ও দূরত্ব হিসেব করে বের করে। নিজের চাকের সামনে ৪ এই সংখ্যাটির আকৃতিতে খুব দ্রুত নাচতে নাচতে উড়ে এই তথ্যগুলো এটি অন্যদেরকে জানায়। ৪ এর অক্ষের দিকটি তখনকার সূর্যের অবস্থানের আপেক্ষিকে দিকের কোণটি জানিয়ে দেয়। আর নাচের দ্রুততার পরিমাপটি বলে দেয় ফুলগুলো কত দূরে আছে। অন্যেরা তার এই নাচের গণিতের ভাষা বুঝতে পারে এবং সেভাবে পথ হিসেব করতে করতে মধু সংগ্রহে যায়। এই সব গণিত আর ভাষার সঙ্গে অবশ্য আমাদের গাণিতিক ক্ষমতা ও ভাষা ক্ষমতার প্রচুর পার্থক্য আছে। কারণ তাদের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা একদম স্থির সহজাত– এর মধ্যে কোন নতুনত্ব, কোন অভিনবত্ব আনার সুযোগ তাদের নেই। যে কোন পরিবর্তনের জন্য হয়তো তাদেরকে আরো লক্ষ বছরের নতুন বিবর্তনের অপেক্ষা করতে হবে।

মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো ভিন্ন কেন? অনেকে মনে করেন মানুষের ক্ষেত্রে পিঁপড়া বা মৌমাছির মত সহজাত কিছু নেই– সবই উপস্থিত মত আনকোরা হিসেব করা। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয়। মানুষের মস্তিষ্কও সহজাত নানা জিনিসে ঠাসা– শুধু বিবর্তনই সেগুলো বদলাতে পারবে। কিন্তু বিবর্তন মানুষের মস্তিষ্কে বাড়তি এমন একটি ক্ষমতার সৃষ্টি করেছে যা অন্য কারো নেই। এটি আবার বিবর্তনের সহজাত জিনিসগুলোর ওপর আমাদের ষোল আনা নির্ভরশীলতাকে কমিয়ে দিয়েছে। এই ক্ষমতাটিকে বলা যায় অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা, ভবিষ্যত কৌশল নির্ধারণের ক্ষমতা, এক কথায় বিবেচনার ক্ষমতা বা মননশীলতা। সব মিলে এর জন্য ব্যবহৃত হয় 'কগ্‌নিশন' – এই শব্দটি। কগ্‌নিশন মানুষের মস্তিষ্ককে তার অনেক সহজাত আচরণগুলোকে একটি মহাপ্রোগ্রামে সাজাবার ক্ষমতা দিয়েছে; প্রয়োজনে সেই প্রোগ্রামকে রদবদল করার ক্ষমতাও একে দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কগ্‌নিশন মানে সহজাত আচরণগুলোকে বিসর্জন দেয়া নয়, সেগুলোকে বিবেচনার প্রোগ্রামে আনতে পারা। পিঁপড়া বা মৌমাছির মস্তিষ্ক সহজাত

ক্ষমতাগুলোতেই শুধু অন্ধভাবে ওইটুকুর পরিধিতে হুবহু ব্যবহার করতে পারে– হোক না সে যতই চমকপ্রদ। মানুষ তার চেয়ে একটু বেশি কিছু করতে পারে।

মানুষেরও আগে ওই কগ্‌নিশন ক্ষমতাটির কিছুটা পূর্বসূরি প্রাইমেটদের মস্তিষ্কে এসেছে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত একটি বৈশিষ্ট হিসেবে– অর্থাৎ বিবর্তনের একটি ধারা হিসেবে। অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও যার যার মত করে টিকে থাকার অন্য রকম বৈশিষ্ট নির্বাচিত হয়েছে– যেমন বাঘের ক্ষেত্রে তার অসম্ভব শক্তি আর চোয়ালের জোর। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই কগ্‌নিশনের বৈশিষ্ট শেষ পর্যন্ত তাকে অন্য সব প্রাণীর বিবর্তিত কৌশলের থেকে টিকে থাকার অধিকতর সক্ষমতা দিয়েছে। তাই হাতির চেয়ে দশ বার গুণ বড় হাতির পূর্বসূরি উত্তর আমেরিকার ম্যাস্টাডন বা উত্তর এশিয়ার রোমশ ম্যামথ মানুষের হাতে দলে দলে মারা পড়ে বহু হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। সীমিত দৈহিক শক্তির অধিকারী মানুষকে ওই ক্ষমতা যুগিয়েছে তার কগ্‌নিশন। এরই ফলে এই প্রজাতিটি মোটামুটি পুরো পৃথিবীটি তার কব্জায় নিয়ে নিতে পেরেছে। কগ্‌নিশন মানুষের সহজাত ক্ষমতাগুলোকে, কিংবা প্রবৃত্তি বা আচরণগুলোকে বাদ দেয়নি, এগুলোকে বিবেচনার মহাপ্রোগ্রামের মধ্যে সাজিয়ে তার মাধ্যমে বড় বড় কাজ করিয়ে নিয়েছে।

সবকিছু অবশ্য সম্ভব হয়েছে ওই মস্তিষ্কটির গড়নে যা কম্পিউটেশন তত্ত্বে কাজ করছে। অধিকাংশ বিজ্ঞানী এখন মনে করেন মস্তিষ্ক একটি মাত্র কম্পিউটার নয়– এটি আসলে অনেকগুলো ‘মিনি-কম্পিউটারের’ সমন্বয়, যার প্রত্যেকটিকে বলা যায় এক একটি মড্যুল। এক একটি মড্যুল গড়ে ওঠেছিল বিবর্তনের কালে এক একটি টিকে থাকার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে, এক এক ধরনের স্নায়ুবর্তনীজালের আকারে। প্রত্যেকটি মড্যুল তাই এখনো বিশেষায়িত কাজই করে– বাইরের দুনিয়া থেকে বিশেষ রকমের তথ্য নেয়, সেগুলোকে বিশেষ রকমে প্রক্রিয়াকরণ করে, এবং বিশেষ রকমের ব্যবহারযোগ্য ফলাফল দেয়। আবার এর সঙ্গে কিছু কেন্দ্রীয় মড্যুল রয়েছে অন্যান্য মড্যুলের ফলাফলগুলো যেখানে এসে জমা হয়, তুলনা হয়, তাদের

মধ্যেও একরকম প্রক্রিয়াকরণ হয়। এভাবেই চূড়ান্ত বিবেচনা, অনুধাবন, চিন্তা বা আচরণের সৃষ্টি হয়। অনেক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কে মোটা দাগে বিভিন্ন কাজের জন্য যে বিভিন্ন অঞ্চল খুঁজে পেয়েছেন– ভাষার অনুধাবন অঞ্চল, ভাষার বাচন অঞ্চল, দর্শন অঞ্চল, শ্রবণ অঞ্চল, স্মৃতি অঞ্চল ইত্যাদি সেটিও মনে হচ্ছে বিশেষায়িত মড্যুল বিভাজনের ফলশ্রুতি। বিবর্তনকে এবং মস্তিষ্কের বাস্তব গঠনকে হিসাবের মধ্যে না নিয়ে এতদিন যে মনোবিজ্ঞানের প্রচলন ছিল তাতে ব্যাপারটি ঠিক উল্‌টোভাবে চিন্তা করা হতো। মনকে দেখা হতো একটি অখণ্ড সত্ত্বা হিসেবে যার সঙ্গে বিবর্তনকালীন আলাদা আলাদা সমস্যাগুলোর কোন সম্পর্ক দেখা হতোনা। মনে হয় মনোবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতার কারণ ছিল সেখানেই।

মস্তিষ্কের কাজ সহজ নয়, আলাদা আলাদা মড্যুলে কাজটির ছোট ছোট ভাগ করে নিয়ে তাই মস্তিষ্ক তার কঠিন কাজ করতে পারে। আমাদের সাধারণ চেতনায় শুধু তার শেষ ফলটুকু ধরা পড়ে– বলা যায় বিশাল হিমশৈলের শুধু চূড়াটুকুর মত যার বাকি পুরোটাই পানির ভেতরে অগোচরে থাকে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি ভাল বোঝা যাবে। মনে করি একটি মশার বিরক্তিকর বোঁ বোঁ শব্দ শুনে আমি এটিকে দেখলাম আর দুহাতে চড় দিয়ে এটিকে মেরে ফেল্‌লাম। ব্যাস আমার চেতনায় শুধু এইটুকুই ধরা পড়লো। কিন্তু এর মধ্যে আমার মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ভাবে কী কী কাজ করতে হয়েছে এবং এই প্রত্যেকটি কাজের ক্ষমতা বিবর্তনের কালের টিকে থাকার প্রতিযোগিতায় কোন্ সমস্যার সমাধানের জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো– সেটি আমার চেতনার বাইরে থেকে যায়। শুরুতে মশার বোঁ বোঁ শব্দটি যে শুনেছি তার সূত্রপাত তার পাখার দ্রুত সঞ্চালনে এবং একে মস্তিষ্কের জন্য স্নায়ু সিগ্‌ন্যালে পরিণত করেছে কানের ভেতরের নানা ব্যবস্থা বিশেষ করে কম্পন সংবেদী কিছু কোষ যা লোমের মত দেখতে। এই সিগন্যাল মস্তিষ্কের শ্রবণ অংশে বিশেষ মড্যুল ওই বিরক্তিকর অনুভূতিটি সৃষ্টি করার মাধ্যমে পুরো ব্যাপারটি শুরু করে দিয়েছিলো। বিবর্তনকালে কীটপতঙ্গ পরিবেষ্টিত পরিবেশে আত্মরক্ষার জন্য এমন মড্যুল দরকার হয়ে পড়েছিলো।

মশাটির দিকে আমার তাকানোর ফলে এর থেকে যে আলো আমার চোখের রেটিনার ওপর এসেছে স্নায়ু-সিগন্যাল হিসেবে তার নানান্ প্রভাব গিয়ে আমার মস্তিষ্কের নানা জায়গায় বিভিন্ন মড্যুলে কাজ করেছে। যেমন মশাটির আকার-আকৃতি পরীক্ষা করেছে একটি মড্যুল। বির্বতনের কালে শিকারের

অস্ত্র

চার

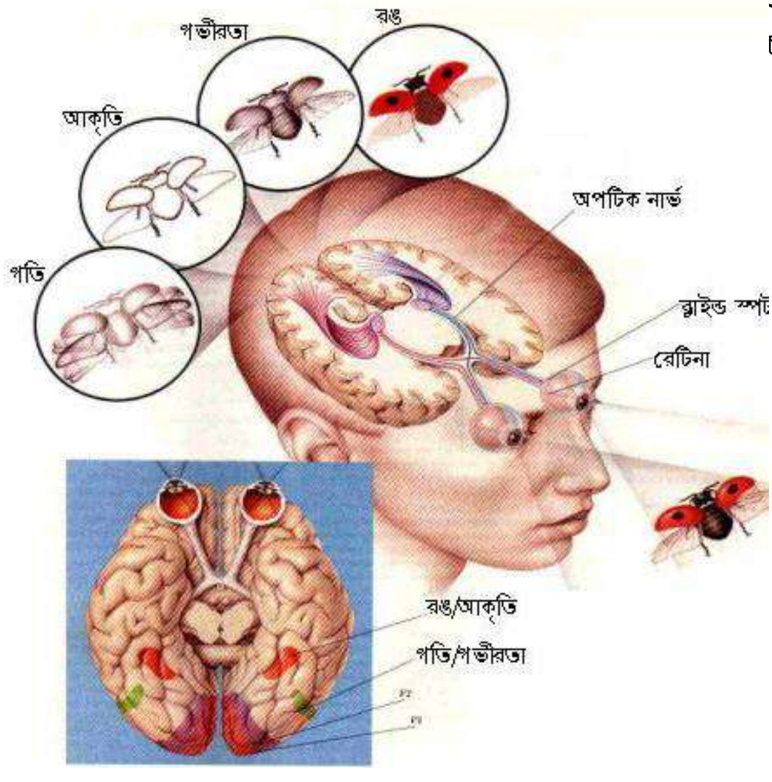

চোখের দৃশ্যকে নিয়ে মস্তিষ্ক নীরবে যা করে

একটি মাছির দৃশ্য চোখের রেটিনায় গিয়ে পড়লো। সেটির বোধের স্নায়ু-সিগন্যাল অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গেলো। মস্তিষ্কের নানা অংশ সে মাছির আকৃতি, গভীরতা, রং, গতি ইত্যাদি আলাদা ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে তার সামগ্রিক বোধটি মস্তিষ্কে সৃষ্টি করছে। আমরা সেই সামগ্রিক ফলাফলটিই বুঝে নিচ্ছি এবং সে অনুযায়ী আচরণ করছি।

বলেই সেই মড্যুল তৈরি হয়েছে। মশার গতির প্রকৃতি ও বেগ পরীক্ষিত হয়েছে অন্য একটি মড্যুলে, আবার গতির দিক পরীক্ষিত হয়েছে ভিন্ন একটিতে। এসব মড্যুল খুব সম্ভব বিবর্তনকালে ছুটন্ত পশু শিকার করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো। মশার রঙের ব্যাপারটি আবার নিশ্চিত অন্য একটি মড্যুল – খুব সম্ভব সপুষ্পক উদ্ভিদে ফুল, কাঁচা ফল, পাকা ফল এসবের পার্থক্যের মাধ্যমে বেঁচে থাকার সুবিধে করার জন্য বিবর্তনের কালে এই মড্যুলের সৃষ্টি হয়েছিলো। এখন এত সব মড্যুলের এত সব আলাদা ফলাফল একত্রিত হয়ে বিবেচিত হলে তবে মস্তিষ্কের মোটর অঞ্চলের মড্যুল মশাকে চড় মারার জন্য হাতের পেশিকে নির্দেশ দেবে; যেই মড্যুলটি হয়তো বিবর্তনকালে বর্শা নিক্ষেপের মত কাজের সুবিধার কারণে সৃষ্টি হয়েছিলো।

ঝট্ করে যে মশা মেরে ফেল্‌লাম তার পেছনে মস্তিষ্কের এত যে কাজ হয়ে গেল তা আমি জানতেই পারলামনা। ঝামেলা এড়ানোর জন্য এই না জানাটি মন্দ নয়। তেমনি ভাবে খাবার সময় পরিপাক যন্ত্রের কাজ সম্পর্কে সচেতন না থাকাটিও মন্দ নয়। তবে পরিপাক যন্ত্রের কাজ সম্পর্কে কখনো চিন্তা না করে যেমন স্বাস্থ্য-সচেতন হওয়া যায়না, তেমনি মস্তিষ্ককে ও বিবর্তনকে চিন্তায় না এনে আত্মসচেতনও হওয়া যায় না।

বিস্তারকামী জিন

জিন যদি কথা বলতো

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপধ্যায় তাঁর 'বৃষ্টি' নামের লেখায় বৃষ্টির ফোটার মুখে কথা তুলে দিয়েছিলেন। সেখানে বৃষ্টির ফোটা বল্ছেঃ 'চলো নামি-আষাঢ় আসিয়াছে-চলো নামি'। 'আমাদের মত ক্ষুদ্র কে, আমাদের মত বলবান কে?' এখন আমরা যদি একটি জিনের মুখে কথা তুলে দিতে পারতাম সে কী বলতো তা কল্পনা করা যাক। কল্পনাটি অবশ্য করবো জিনের স্বাভাবিক কাজকর্মের ওপর ভিত্তি করে। জিন বলতোঃ

'আমরা জিন, আমরা ক্ষুদ্র অণুমাত্র, কিন্তু দেখ একজন থেকে অন্য জনে ছড়িয়ে পড়ে আমরাই পুরো জীবজগতকে গড়েছি। যত জীব দেখছ, হতে পারে তাদের কেউ কেউ বিশাল, কারো কারো অনেক ক্ষমতা, কিন্তু এসব আমরা নিজের স্বার্থেই তাদের মধ্যে দিয়েছি– যেন আমরা ছড়িয়ে পড়তে পারি। তাদেরকে এমন ভাবে এসব দিয়েছি যেন ওরা বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারে। ওদের মধ্যেই তো আমরা আছি ওরা বাঁচলে আমরাও বাঁচি। কাজেই ওদের দেহটা আমাদের বেঁচে থাকার সুবিধার জন্য তৈরি একটি যন্ত্র মাত্র, ওদের স্বভাবগুলোও আমাদেরই কারসাজি। ওরা অবশ্য চিরকাল বাঁচবেনা, কিন্তু আমরা বাঁচবো। কারণ ইতোমধ্যে আমরা ওদের সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বো। আমরা তাই চেষ্টা করি ওদের যেন বেশি সন্তান হয়। শুধু তাই নয় ওরা যেন সন্তানের যত্ন নেয়, সন্তানের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে– সেই দিকগুলোও আমরা দেখি। এতে আমাদের লাভ। দেখনি পাখি-মা কেমন করে নিজে না খেয়ে সারাদিন খেটে বাচ্চার জন্য খাবার যোগাড় করে। এই অভ্যাস আমরাই তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। শুধু এটি নয় এমন কিছুও মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি যাতে সব আত্মীয়-স্বজনকে ওরা উপকার করে; কারণ ওই আত্মীয়দের মধ্যেও ওদের জিনের কপি হিসেবে আমরাই আছি। আমরা ক্ষুদ্র আণুমাত্র কিন্তু আমরাই পুরো জীবজগতকে গড়ে তুলেছি। এটি অবশ্য

ওদের লাভের জন্য করিনি, করেছি নিজেদের লাভের জন্য– যাতে আমরা ছড়িয়ে পড়তে পারি। তাই চলো ভাই, আমরা ছড়িয়ে পড়ি।'

একথাগুলো জিন বলতেই পারে, কারণ বাস্তবে ওরা এমনটিই করে। ওদের জবানিতে যা শুনলাম তাতে জিনের বেশ একটি স্বার্থপরের মত চেহারা ফুটে ওঠেছে। যেন তার সব কাজের পেছনে একটিই লক্ষ্য– নিজেকে বিস্তার করা। বাকি সব যেন ঘটেছে তার এই লক্ষ্য পূরণের জন্য। তবে জিন তো আসলে ভেবেচিন্তে স্বার্থপর হয়না, বরং তার প্রকৃতিই এমন যে তার ফলাফলকে বিস্তারকামিতা বা স্বার্থপরতার মত দেখায়। বিবর্তনে কোন বৈশিষ্টের জিন যদি কোন সুবিধা পেয়ে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়, তখন ওই জিন ওই জীবদলের যে সদস্যের কাছে আছে সে বেশি বাঁচে, বেশি সন্তান দেয়। জিনটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে ওই জিনের অধিকারী বেশি সন্তান দেয়া ও এ জিন নির্বাচিত হওয়ার অর্থ এই জিনটির বেশি বিস্তার হওয়া। যেই জিনটি এভাবে নির্বাচিত হয়নি সেটি বিস্তৃত হতে পারেনি, তাকে তাই আর দেখা যায়না। দেখা যায় যে জিনগুলো বিস্তৃত হয়েছে শুধু সেগুলোকে। কাজেই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে সব জিন শুধু বিস্তৃত হতে চায়; অর্থাৎ তারা স্বার্থপর।

এভাবে সবকিছু জিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে জিনের মুখের কথায় যা যা এইমাত্র শুনলাম তার সবই বাস্তব মনে হবে। এই যে জীবের দেহটা এমন সৌকর্যময় করে তৈরি করা মনে হবে সেটি যেন জিনের স্বার্থেই হয়েছে, জিনকে টিকিয়ে রাখতে আর তাকে বিস্তৃত হতে দিতে একটি যন্ত্রের মত কাজ করার জন্য। আর জীবের স্বভাবগুলোও যেন গড়া হয়েছে জিনকে বেশি বিস্তৃত হতে সহায়তা দেয়ার জন্য। ব্যাপারটি এতই বাস্তব যে সন্তান দেবার বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেলে অনেক জীব আর বাঁচেনা। অনেক কীটপতঙ্গ, কোন কোন মাছ (যেমন স্যামন) এবং অন্যান্য কিছু জীব একবারই শুধু প্রজনন করে, আর সেই প্রজননের মুহূর্তটি শেষ হয়ে গেলে এর পর পরই মারা যায়। মনে হয় এও যেন জিনের কারসাজি, তার উদ্দেশ্য সাধনের পর 'যন্ত্রটিকে' বাদ দিয়ে দেয়া। জীবের নানা আচরণের বিবর্তনমূলক উৎস খুঁজলে দেখা যায় যেই আচরণের ফলে জিনের বিস্তার হতে পেরেছে বেশি

সেই আচরণটিই সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ সন্তানকে যত্ন করে বাঁচাবার জন্য নানা প্রাণীতে মা-বাবার যে প্রাণপণ চেষ্টা তাও ব্যাখ্যা করা যায় এর ফলে সন্তান বেঁচে থেকে জিন বিস্তারে সুবিধা করে দেবে এ কারণেই মা-বাবার মধ্যে আচরণটি সৃষ্টি হয়েছে– এই ভাবে। এরকম আরো বহু উদাহরণ আমরা শিগ্‌গির দেখবো।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এই সব কথা জিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছু দেখার ফল। 'স্বার্থপরতা' যাকে বলা হচ্ছে সেটিও জিনের স্বার্থপরতা, জীবটির নয়। জীবটির নিজের আচরণে সেরকম কোন 'স্বার্থপরতা' খুঁজে পাওয়া যায়না। কারণ জীব যা করে তা ওই বিবর্তনের চূড়ান্ত কারণে করেনা– ওই চূড়ান্ত কারণ অনুসরণ জিনের কাজ; জীব আচরণ করে তার মস্তিষ্কে থাকা আপাত কারণে। যেমন ওপরের উদাহরণে মা-বাবা সন্তানকে যত্ন করে তার জিন বিস্তারের জন্য নয়, সন্তানকে ভালবাসে বলে– ওই ভালবাসাটাই তার মস্তিষ্কে আছে। তবে আমরা বার বার দেখবো জিনের ওই বিস্তারকামী স্বভাবের কথা মনে রাখলে প্রাণীর আচরণের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায়।

সর্বজনীনতার উৎস

আমরা দেখেছি মানুষের ক্ষেত্রে আচরণ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অন্য প্রাণীদের থেকে জটিল। এর কারণ মানুষের সেই বিশেষ সক্ষমতা– কগ্‌নিশন। এর ফলে আচরণগুলো একেবারে অন্ধ সহজাত অভ্যাসের মত ঘটে যায়না, কগ্‌নিশন পরিবেশে-পরিস্থিতি অনুযায়ী একে নানা ভাবে বিন্যস্ত করতে পারে, প্রকাশের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আনতে পারে। এটি আমাদের মস্তিষ্কের কম্পিউটারে জিন-নির্ধারিত প্রোগ্রামের দ্বারা আচরণের সূক্ষ্ম রদবদলের ব্যাপার, কিন্তু তা হলেও এর গুরুত্ব অনেক। এই রদবদলগুলোই মানুষকে অন্য প্রাণীর থেকে এত আলাদা করেছে। একটি বড় কথা হলো এটি মানুষকে কালচার সৃষ্টি করার সুযোগ দিয়েছে। পরে দেখবো এই কালচার সৃষ্টিতেও জিনের দূতিয়ালির ভূমিকা অনেকখানি। অতীতে সমাজবিজ্ঞানীরা কালচারের বৈচিত্রের ওপর খুব বেশি জোর দিয়েছেন– মনে করেছেন এই বৈচিত্রগুলো বুঝতে পারলেই

মানুষের আচরণের সবকিছু বোঝা যাবে। এখন বোঝা যাচ্ছে এই বৈচিত্রের গভীরতা খুব বেশি নয়, তার একটু বেশি গভীরে গেলেই দেখা যায় যে সকল মানুষের মধ্যে একই অভ্যাসের, একই আচরণের অদ্ভুত সব সর্বজনীনতাগুলো লুকিয়ে আছে। তা নইলে শিল্পোন্নত দেশের নগরবাসীদের কালচারে যা পাই তারই হুবহু রূপ আমাজনের গহীন বনের মানুষদের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যাবে কেন, এই দুইয়ের মধ্যে কোন যোগাযোগ তো কখনো হয়নি। সর্বজনীনতাগুলো এতই অবাক করার মত যে এর কারণ জানতে আমাদেরকে খুব কৌতুহলী করে তোলে।

মানব আচরণের যে কোন একটি ক্ষেত্র বেছে নিলে সেখানেই পেয়ে যাব এমন সর্বজনীনতার অনেক উদাহরণ। যেমন কথায় ভাষার ব্যবহারের বিষয়টি ধরা যাক। অনুসন্ধানে দেখা গেছে সব কালচারেই মানুষ আড্ডা দেয়, গুজব ছড়ায়, গল্প বলতে আর শুনতে ভালবাসে – সবই একেবারে সর্বজনীন অভ্যাস। এমন কোন কালচার নেই যেখানে মানুষ কখনো কখনো কবিত্ব করে কথা বলেনা, বক্তৃতাবাজি করেনা, বক্তৃতার সময় স্বাভাবিকের থেকে একটু ভারি শব্দ ও ভিন্ন ঢঙ ব্যবহার করেনা, এবং রসিকতা করে নিজের কথাকে অন্যের কাছে আনন্দদায়ক করার চেষ্টা করেনা। বোঝাই যায় যে এগুলোর প্রতি ঝোঁক মানুষের একেবারে সনাতন। ভাষার ক্ষেত্রে আর কিছু খুব সাধারণ ব্যাপার রয়েছে যেগুলো আমরা সব জায়গাতে স্বতসিদ্ধ বলে ধরে নিই। উদাহরণ স্বরূপ সারা দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ আছে কি যেখানে মানুষ সবকিছুকে একটি নাম দেয়না– সে মানুষই হোক, জায়গাই হোক, কি রাস্তাই হোক। এসব মিল কেমন করে এলো?

ভাষার ব্যবহারে যত না মিল তার চেয়ে অনেক বেশি মিল ভাষাহীন নানা স্বর ও মুখভঙ্গির দ্বারা যোগাযোগের ক্ষেত্রে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো একই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার প্রায় সব কালচারে এগুলো একই ভাবে ব্যবহৃত হয়। কষ্ট পেলে উহ্ আহ্ শব্দ করা থেকে শুরু করে নানা মুখভঙ্গির মাধ্যমে আনন্দ, দু:খ, রাগ, বিরক্তি, আকর্ষণ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রকাশের পদ্ধতি প্রায় সব মানুষে একই। অন্য মানুষের বা পশু-পাখির গলার স্বর নকল ও ভাবভঙ্গি নকল করার অভ্যাসটিও প্রায় সর্বজনীন।

বিনোদন আর সামাজিক আচার-উৎসবের একটু ভেতরে ঢুকলে নানা কালচারের মৌলিক মিলগুলো দ্রুত ধরা পড়ে। সুর, গান, নাচ, অভিনয় এ সব নেই কোন্ কালচারে? এমনকি কট্টর অনুশাসনের ভয়ে কোথাও যদি তা চাপা থাকে সমাজের ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে সেখানেও সবই আছে, সহজাত ভাবে আছে। সব কালচারের মানুষ শিশুদের সান্নিধ্য পছন্দ করে, তাদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে, একেবারে ছোট্ট শিশুর আধো আধো বুলি নকল করে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। অবাক করার মত একটি জিনিস হলো দুনিয়ার সবচেয়ে গহীনতম কোন জায়গার কোন অজানা কালচারে হাজির হয়েও সেখানে দেখা যায় মা, বড় বোন, বা বড় ভাই দোলনায় শিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছে ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে– ভাষা আলাদা, কিন্তু শুনলেই মনে হবে এতো চিরন্তন ঘুম পাড়ানি গানের সুর। অন্যদিকে গুরুজনদের শলা-পরামর্শের ভঙ্গি, সালিশ-বিচারের ভঙ্গি এগুলোতে দেখা যায় আশ্চর্য মিল।

আমরা মনে করি পুরুষ ও মেয়েদের আলাদা আড্ডা দেবার প্রবণতা এটি আমাদের মত কিছু সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের ফল। এমন ভাবা সঠিক নয়, কারণ সব সমাজে এই চিত্র নানা ভাবে আছে। পুরুষালি ঢঙ থেকে মেয়েলি ঢঙকে আলাদা করার ব্যাপারেও সব কালচারের এক রা। যৌন বিষয়ের আলোচনাকে অন্য সব বিষয়ের থেকে একটি আলাদা অদ্ভুত স্থান দেয়ার অভ্যাসটিও আসলে সর্বজনীন, বাইরে এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যতই আলাদা মনে হোক না কেন। এমনি ভাবে সর্বজনীন অভ্যাসের তালিকা আরো দীর্ঘ করা সম্ভব।

এমন সর্বজনীনতার উৎস খুঁজতে গেলে চট্ করে যেটি মনে হবে সেটি হলো বিবর্তনের কথা। আজ যে মানুষ বা যত গহীন জায়গাতেই থাকুক না কেন সবার পূর্বপুরুষরা একই আদি মানুষের বংশধর। তাই আজ যদি তাদের অভ্যাসে নানা জিনিস অদ্ভুতভাবে মিলে যায় তা হলে বলতে হবে ওটি ওই আদি পূর্বপুরুষের জেনেটিক গড়নে ঢুকে গিয়েছিল বলেই মানুষ পরে যেখানে গিয়েছে সেখানেই এ অভ্যাসগুলো পাওয়া যাচ্ছে। আদি মানুষের বিবর্তনে

এসব অভ্যাস কেন নির্বাচিত হয়েছিলো সেটি একটি প্রশ্ন বটে। বিবর্তনের ভাষায় বলতে হলে এর প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচা ও অধিক সন্তানের জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে কোন না কোন সুবিধা দিয়েছিলো। কবিত্ববোধ, রসবোধ, সুর, গান এগুলো কী ভাবে বাঁচার বাড়তি সুবিধা দিতে পারে তা নিয়ে আন্দাজ অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু সবই প্রমাণসাপেক্ষ হতে হবে। আর এত প্রাচীন বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণ করা খুব কঠিন। এ বিষয়ে অতি সাম্প্রতিক কালে একটি তত্ত্ব বেশ সমর্থন পাচ্ছে তা হলো এর অনেকগুলোর পেছনে রয়েছে যৌন-নির্বাচন বলে একটি বিষয়। অর্থাৎ স্ত্রীরা এমন অভ্যাস সম্পন্ন পুরুষদেরকে অথবা পুরুষরা এমন অভ্যাস সম্পন্ন স্ত্রীদেরকে পছন্দ করেছিলো বলে শুধু এই অভ্যাস সম্পন্নরাই প্রজননের সুযোগ পেয়ে অধিক সন্তান রেখে যেতে পেরেছে– যারা নিজেরাও এই একই অভ্যাস সম্পন্ন। এই যৌন-নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা পরে আরো বিস্তারিত দেখবো।

সর্বজনীনতার বিবর্তন উৎস খোঁজার জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে যে কতদিকে বিস্তৃত হতে হয় তা দেখার জন্য আমরা এখানে একটি উদাহরণ নেবো। গবেষণার বিষয়টি হলো মুখমণ্ডলের নানা ভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগের বিষয়টি সর্বজনীন হলো কী ভাবে তা নির্ণয়। কিছুদিন আগেও আমরা এক কথায় তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করতাম এই বলে যে এগুলো হলো নানা আবেগ প্রকাশের স্বাভাবিক ভঙ্গি। এর পেছনে যে অতীতের পারিবেশিক পরিস্থিতির কোন ভূমিকা আছে, বিবর্তন-সুবিধার একটি গভীর দিক আছে সেই পথ সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী কেউই মাড়াতে চাননি। কিন্তু এখনকার গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। মূলত ছয়টি আবেগের মুখভঙ্গি নিয়ে গবেষকরা কাজ করেছেন– আনন্দ, ভয়, ঘৃণা, দু:খ, বিস্ময় এবং রাগ। এর মধ্যে তাঁরা হাসির মুখভঙ্গিকে তাঁদের গবেষণার মুখ্য বিষয় করেছেন। এরকম গবেষণার একটি কৌশল হলো পরস্পরের মধ্যে অন্য কোন ভিন্নতা আছে এমন দুজনের মধ্যে বিষয়টি তুলনা করা। যেমন সেরকম দুজনের মধ্যে ওই আবেগগুলো প্রকাশের জন্য মুখমণ্ডলের কোন্ কোন্ পেশিগুলো ব্যবহৃত হয় এবং সে পেশির নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কে কোন্টির জন্য কোথায় থাকে– একজনের

সঙ্গে অন্যজনের তার তুলনা করে অনেককিছু বোঝা যায়। এজন্য গবেষণায় পেশিবিদ্যা ও মস্তিষ্কবিদ্যা বড় আকারে এসেছে।

এই তুলনা করতে গিয়ে এরকম পেশি সঞ্চালনে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য, শিশু ও বয়স্কের মধ্যে পার্থক্য, মৃদু হাসি ও দাঁত দেখানো হাসির মধ্যে পার্থক্য, ইত্যাদির বিশ্লেষণে অনেক মৌলিক বিষয় বেরিয়ে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা গেছে যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী অধিক সময় ধরে মুখে হাসি ধরে রাখে। স্ত্রীর জন্য এটিই স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থা– যে কারণে হাসিতে ব্যবহৃত মুখের কিছু পেশি স্ত্রীর ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নভাবে গঠিত। স্ত্রী ও পুরুষের জন্য পারিবেশিক পরিস্থিতির পার্থক্যের সঙ্গে হাসির পেশি ও মস্তিষ্কের অঞ্চলের এই পার্থক্যের তুলনা করে তার থেকে বিবর্তনকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব। একই ভাবে অন্যদের তুলনা থেকেও এভাবে আরো তথ্য মেলে।

একটি বিশেষ পারিবেশিক পরিস্থিতি ধরে নিয়ে তাতে বিশেষ মুখভঙ্গির মাধ্যমে যে যোগাযোগটুকু হলো তাতে কার কী সুবিধা হলো এটি নির্ণয় করা হলো আসল কাজ। অন্যভাবে যোগাযোগের তুলনায় মুখভঙ্গির মাধ্যমে যোগাযোগের একটি সাধারণ সুবিধা প্রায় সব ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে; তা হলো এতে শক্তির প্রয়োজন খুব কম। খুব কম শক্তি ব্যয় করে এতে ঘন ঘন যোগাযোগের সিগন্যাল দেয়া যায়– যেমন এক ধরনের যোগাযোগে মুখে সব সময় হাসি লাগিয়ে রেখে। কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মুখভঙ্গির পারিবেশিক সুবিধা অনুমান করা হয়েছে– শিশুর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, যৌন সঙ্গী আকর্ষণ, বিরোধ নিস্পত্তি, সামাজিক শান্তি বজায় রাখা, এবং এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। তবে মুখভঙ্গির তিনটি সুবিধার ক্ষেত্রে পরীক্ষণের সুনির্দিষ্ট ভাল ফল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে একটি হলো শিশুর সঙ্গে তার যত্নকারীর যোগাযোগ রক্ষায়। উভয়ের হাসি, শিশুর কান্না, যত্নকারীর উদ্বেগ ইত্যাদি এক্ষেত্রে কাজে এসেছে। শিশুর দিক থেকে এই যোগাযোগ রীতিমত জীবনরক্ষাকারী হতে পারে। প্রমাণিত দ্বিতীয় সুবিধাটি হলো অন্যের মধ্যে নিজের প্রতি সমবেদনা সৃষ্টির জন্য মুখভঙ্গির ব্যবহার। বিভিন্ন জীবের মধ্যে এখন অন্য কারো

উপকার করলে পরে সেই উপকার ফেরৎ পাওয়ার জন্য পারস্পরিক উপকার নামক এক প্রকার আচরণের বিবর্তন-মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে বানর, শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের মধ্যে মুখভঙ্গির ব্যবহারটি খুবই মূল্যবান বলে প্রমাণিত হয়েছে। তৃতীয় আর একটি সুবিধা যেটি প্রমাণিত হয়েছে তা হলো কথা বলার সময় একই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক মুখভঙ্গি করলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের জন্য তা কথার ঘনিষ্ঠতা বাড়াবার কাজ করে; এর মধ্যে আছে আনন্দ, বিস্ময়, দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করার মত মুখভঙ্গি। এই ঘনিষ্ঠতাটি যোগাযোগের সাফল্য-ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বড় ভূমিকা রাখতে পারে। পরীক্ষণের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে বিবর্তনের কালে এই তিনটি ক্ষেত্রে বিশেষ মুখভঙ্গিগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণ হয়েছিলো।

তবে গবেষণায় দেখা গেছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সুবিধা সত্যি সত্যি পাওয়ার জন্য মুখভঙ্গিকে ঘন ঘন ব্যবহার করতে হয়েছে; আর শক্তিক্ষয় কম রেখেই এটি করা সম্ভব। শুধু দু'একবার মুখভঙ্গি ব্যবহার করা হলেই বাঁচা-মরার মত নাটকীয় পরিবর্তন আনা হয়না বটে, কিন্তু দীর্ঘকালীন ঘন ঘন ব্যবহার বাঁচার এই সুবিধাও এনে দিয়ে থাকতে পারে। মুখভঙ্গির দীর্ঘকালীন ব্যবহার বা ব্যবহারের অভাব যে কী বিশাল পার্থক্য ঘটাতে পারে তা বোঝা গেছে পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের যোগাযোগ ক্ষমতাকে মুখভঙ্গি ব্যবহারের অসামর্থ্য কী ভাবে নষ্ট করে দেয় তা লক্ষ্য করে। এর যে মারাত্মক অসুবিধা তা শুধু যার এ ক্ষমতা নষ্ট হয়েছে তার ওপর নয়, যাঁরা তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে তাদের ওপরেও ঘটে। এর বিবর্তনগত সম্পর্কটি আরো স্পষ্ট হয়েছে মানুষের সবচেয়ে বেশি জেনেটিক নৈকট্যের প্রাণী শিম্পাঞ্জির ক্ষেত্রে পক্ষাঘাতে অসাড় মুখমণ্ডলের কারণে তার বাঁচার ও সন্তান দেবার ক্ষমতা মারাত্মক ভাবে কমে যেতে দেখে। এ ছাড়াও শিম্পাঞ্জির ও মানুষের হাসির তুলনা এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে জীবন-মানের ওপর তার প্রভাবের তুলনাও এর বিবর্তনের উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। কারণ কোন কিছুর উৎস বিবর্তনমূলক হতে হলে জেনেটিক ভাবে দুটি কাছাকাছি প্রাণীতে তার প্রভাবগুলো একই রকম হবার কথা। সংশ্লিষ্ট পেশি ও মস্তিষ্ক অঞ্চলের তুলনা করে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে শিম্পাঞ্জির নীরবে মুখ সামান্য ফাঁক করে

সামান্য দাঁত দেখানোকে মানুষের মৃদু হাসির সঙ্গে ও তার মুখ পুরো ফাঁক করে সশব্দে সব দাঁত পুরাপুরি দেখানোকে মানুষের মন খুলে হাসির সঙ্গে তুলনীয় মনে করা যায় এবং তাদের একই রকম সিগন্যাল-মূল্য নির্ধারণ করা যায়। একই ভাবে শিম্পাঞ্জির ও মানুষের রাগের মুখভঙ্গির মধ্যেও তুলনা করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্পষ্ট চিহ্ন এতে ধরা পড়েছে। মজার ব্যাপার হলো হঠাৎ কারো কাছ থেকে এই রাগ লুকাতে হলে শিম্পাঞ্জিও মানুষের মত চট্ করে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলে। উভয়ের ক্ষেত্রে দর্শকভেদে এই রাগ লুকানোর চেষ্টা থেকে বোঝা যাচ্ছে বিশেষ বিশেষ কারো জন্য রাগের এই মুখভঙ্গির সিগন্যাল-মূল্য রয়েছে, অন্যদের জন্য নেই।

নানা আবেগ বোঝাতে একই রকম মুখভঙ্গি কেন সব কালচারের সব মানুষ সর্বজনীন ভাবে ব্যবহার করে তার উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানীদেরকে নানা দিক থেকে গবেষণা করতে দেখলাম। স্পষ্টত গবেষণার কাজটি মোটেই সহজ হয়নি, এখনো পুরোপুরি শেষও হয়নি। কিন্তু এর মধ্যে এই সর্বজনীন অভ্যাসটি যে বিবর্তনের সৃষ্টি তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ আমরা পেয়ে গেলাম। বাকি সর্বজনীন আচরণগুলোর ক্ষেত্রেও এভাবেই গবেষণার মাধ্যমে জানতে হয়েছে সেগুলো প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনের সৃষ্টি কিনা। এটি দরকার কারণ এর জন্য বিকল্প তত্ত্বও রয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন কিছু সর্বজনীন আচরণগুলো সব কালচারের সবাই তাদের আদি জন্মভূমি থেকে নিয়ে গেছে জিনের অংশ হিসেবে নয়, কালচারগত আচরণের অংশ হিসেবে। যেমন একই জায়গা থেকে নানা জায়গায় যাওয়া মানুষ যেমন একই ডিজাইনের মাটির পাত্র বানাতে অভ্যস্ত হয় অনেকটা সেভাবে। হাজার হলেও দুনিয়ার সব মানুষের পূর্বপুরুষরা তো এক সময় আফ্রিকার মোটামুটি একই জায়গায় থাকতো। তাদের পরস্পর অনুকরণে তখনই হয়তো এই আচরণগুলো সাধারণ কালচারের অংশ হয়ে গিয়েছিলো। সর্বজনীন প্রত্যেকটি আচরণের ক্ষেত্রে পৃথক বৈজ্ঞানিক গবেষণাই নিশ্চিত করতে পারবে বিবর্তন নাকি আদিতে অনুকরণ কোনটি এর সর্বজনীনতার জন্য দায়ী। এটি জিন বিস্তার বনাম কালচার বিস্তারের প্রশ্ন।

অভিন্ন যমজরা স্বভাবে কতটা অভিন্ন

একজন মানুষ যে আচরণ করছে সেটি কতটা বিবর্তনের সৃষ্টি অর্থাৎ কতখানি তার জিনের কারণেই ওই আচরণটি সে করছে, আর কতখানি অন্য কোন কিছুর প্রভাবে করছে এটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় সহজ কাজ নয়। সুদূর প্রাচীন কালের পারিবেশিক সংকটে যা ঘটেছে আজ সেটি গবেষণার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করতে হলে গবেষণার জন্য অনুকূল কিছু পরিস্থিতি খুঁজে পেতে হবে। এমনি এক রকমের পরিস্থিতি দিতে পারে যখন দু'জন মানুষের জিনের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। সেই দু'জন মানুষের কোন স্বভাব যদি অন্য সাধারণ দুজন মানুষের তুলনায় অনেক বেশি মিলে যায় তখন মনে করতে হবে জিনের মিলের কারণেই স্বভাবের মিল হয়েছে, স্বভাবটির কারণ জিনের মধ্যেই। তা নইলে বুঝতে হবে অন্য কিছু। এরকম সব চেয়ে মোক্ষম পরিস্থিতি দিতে পারে মানুষ দু'জন যদি অভিন্ন যমজ হয়– কারণ সেক্ষেত্রে তাদের সকল জিন হুবহু একই হবে।

অভিন্ন যমজের উভয় সদস্য সৃষ্টি হয় একই অভিন্ন কোষ থেকে। বাবার একটি শুক্রকোষ এবং মায়ের একটি ডিম্বকোষ মিলে জাইগোট নামে শিশুর প্রথম কোষটি তৈরি হয় তা একেবারে গোড়াতেই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে দুটি শিশুর ভ্রূণে পরিণত হয়। এ সময় মূল জাইগোটের একই সব ডিএনএ দুই কপি হয়ে এই দুজনের মধ্যে যায় বলে তাদের শতভাগ জিনই একই। তাদের দুজনেই যে একই লিঙ্গের হয় এবং দুজনের দেহাবয়ব ও চেহারা যে হুবহু এক তা যারাই অভিন্ন যমজ পাশাপাশি দেখেছেন তারাই জানেন। তাদের সবকিছু এত অভিন্ন হয় যে একজন থেকে অন্যজনকে আলাদা করাই মুশকিল হয়ে পড়ে। শুধু চেহারা নয় দেহগত অন্যান্য বৈশিষ্টও এক হয়– গলার স্বর, হাত-পা-মাথা নাড়ার ভঙ্গি, মুখভঙ্গি থেকে শুরু করে সব কিছু। বোঝাই যায় যেসব জিন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলো একই বলে এমন হয়েছে। তবে বিভিন্ন জটিল মানসিক ও আচরণগত বিষয়গুলোতে তাদের মিল কতখানি সেটিই বর্তমান গবেষণাগুলোর বিবেচ্য। কারণ তার থেকেই বোঝা যাবে ওই মানসিক ও আচরণগত বিষয়গুলো জিনের সৃষ্টি কিনা।

অনেকে বলতে পারেন এক্ষেত্রে মানসিক বিষয়গুলো মিলে যাওয়ার পেছনে জিন ছাড়া অন্য কারণও থাকতে পারে। অভিন্ন যমজ একসঙ্গে মায়ের গর্ভে থাকে, সেখানে ভ্রূণ থেকে বেড়ে ওঠার একই পরিবেশ তাদের স্বভাব এক করতে পারে। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া অন্তত ছোটবেলায় অভিন্ন যমজের দু'জনেই একই পরিবারে একই পরিবেশে বড় হয়, স্বভাবের মিলের কারণ সেটিও হতে পারে। এই সম্ভাবনাটিও যেন খতিয়ে দেখা যায় তাই অভিন্ন যমজদের পরস্পর মিলকে তুলনা করা হয় সাধারণ যমজদের পরস্পর মিলের সঙ্গে। সাধারণ যমজরা একটি জাইগোট দু'ভাগ হয়ে জন্মায়না, ওরা অন্য ভাইবোনদের মত আলাদা আলাদা জাইগোট থেকে জন্মে। তাই ওদের মধ্যে জিনের মিল সাধারণ ভাইবোনদের চেয়ে বেশি নয়। তাই তাদের লিঙ্গ ভিন্ন হতে পারে, চেহারা ও অন্যান্য বৈশিষ্টের মিল-অমিল সাধারণ ভাইবোনের মতই। তবে মায়ের গর্ভে একই সঙ্গে বড় হবার ব্যাপারটিতে তারা কিন্তু অভিন্ন যমজের মতই। কোন আচরণের ওপর এই একই সঙ্গে গর্ভে থাকার ব্যাপারটির কোন প্রভাব থাকলে ওই আচরণের ক্ষেত্রে সাধারণ যমজের মধ্যে যে মিল থাকবে অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রেও একই মিল থাকবে। একই পরিবারে লালন-পালনের ক্ষেত্রেও উভয়ের মিল একই রকম হবে। একই ভাবে সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে মিলের সঙ্গে অভিন্ন যমজের মিলের তুলনাও অনেকটা তথ্য দিতে পারে– উভয় ক্ষেত্রে লালন পালনের পরিবেশ এক, কিন্তু জিনের মিল এক নয়, গর্ভে এক সঙ্গে থাকার ব্যাপারটিও এক নয়।

আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তার গবেষণায় অভিন্ন যমজের চেয়ে বড় সুযোগ আর কিছুতে হয়না। অবশ্য অভিন্ন যমজ খুব বেশি নাই, তা ছাড়া এরকম সব যমজকে নিয়ে দীর্ঘকালীন গবেষণা চালানোর মত পরিস্থিতি সব ক্ষেত্রে থাকেনা। তা সত্ত্বেও প্রায় শ'খানেক বছর ধরে প্রচুর অভিন্ন যমজদের ওপর নানা রকম গবেষণা চলে আসছে। তুলনামূলক গবেষণার সুযোগ আরো বেড়ে যায় যদি অভিন্ন যমজদের দু'জন একেবারে শৈশব থেকে ভিন্ন পরিবারে এবং ভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়– একেবারে ভিন্ন কালচারে পরস্পর সংযোগহীন ভাবে বড় হলে আরো ভাল। তা হলে আরো স্পষ্ট করে বলা যায় যে তাদের দু'জনের ক্ষেত্রে স্বভাবের মিলগুলো জিনের জন্য না হয়ে মোটেই

উপায় নেই, আর অমিলগুলো নিশ্চয়ই পরিবেশের অমিলের জন্য হয়েছে। কিন্তু এমন অভিন্ন যমজ পাওয়া আরো বিরল ব্যাপার। তবে পঞ্চাশের দশক থেকে আচরণ সৃষ্টিতে জিনের এবং অন্যান্য প্রভাবের অবদান নির্ণয়ে একই পরিবেশে বড় হওয়া এবং ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া অভিন্ন যমজের ওপর গবেষণা একটি খুব বড় ভূমিকা পালন করছে।

আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ভাল করার বিষয়ে অভিন্ন যমজের ওপর প্রচুর গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে পড়ার ও বোঝার সক্ষমতায়, অংকের সক্ষমতায় এবং বানান করার সক্ষমতায় অভিন্ন যমজের দুজনেই প্রায় সব সময় স্কুলে একই রকম নম্বর পাওয়ার সম্ভাবনা ৭৫% এর মত। এমনকি দু'জনে দুই স্কুলে পৃথকভাবে লেখাপড়া করেও এরকম মিল পাওয়া গেছে। অন্যদিকে সাধারণ যমজদের মধ্যে এই মিল অনেক কম, সাধারণ ভাইবোনের চেয়ে বেশি নয়– যাদের কারো কারো মধ্যে কিছুটা মিল আর কারো মধ্যে অমিল দেখা যায়। উচ্চতর পর্যায়ে লেখাপড়ায়ও দেখা গেছে যে অভিন্ন যমজের দুই জনেই একই বিষয় নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় একই রকম ফলাফল করছে। বোঝা যাচ্ছে অন্তত আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ভাল করার জন্য যে সব সক্ষমতার প্রয়োজন হয় সেগুলোর কিছুটা জিনের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়।

অভিন্ন যমজদের একজনের মধ্যে যদি ছোটবেলা থেকে সঙ্গীত প্রতিভা দেখা গেছে তাদের ৫০% ক্ষেত্রে অন্যজনেরও প্রায় সমান সঙ্গীত প্রতিভা দেখা যায়। এতে মনে হয় সঙ্গীত প্রতিভার অর্ধেকটি জিন-নির্ভর, বাকিটা অন্য কিছু নির্ভর। সাধারণ যমজদের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার মিল এর চেয়ে অনেক কম; সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যেও তাই। অনেকে বলেন এক্ষেত্রে অভিন্ন যমজের বেশি মিলের কারণটি অন্যত্র; প্রায় সব অভ্যাসই দেখা যায় যে ওরা উভয়ে একজন যা করে অন্যজন ঠিক তাই করে। সঙ্গীতের রেয়াজ করাও এমনি একটি অভ্যাস। কাজেই এতে ভাল করার অন্যতম কারণ হলো উভয়ে দীর্ঘসময় রেয়াজ করা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সঙ্গীতের রেয়াজ করতে চাওয়া, তাতে আনন্দ পাওয়া, এটিও জিনেরই ফলশ্রুতি।

অভিন্ন যমজদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিছু গবেষণায় দেখা গেছে ওদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের মিল হয় ৪৬% ক্ষেত্রে, অথচ সাধারণ যমজদের মধ্যে এই মিল হয় মাত্র ২৩% ক্ষেত্রে। এই মিল মানে হলো একজন খোলামেলা স্বভাবের হলে অন্যজনও তাই হওয়া, চাপা স্বভাবের হলে অন্যজনও তাই; এমনি ভাবে বিবেচক প্রকৃতির হওয়া, মিশুক প্রকৃতির হওয়া, পাগলাটে হওয়া ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বঘটিত মানসিক অসুখের ক্ষেত্রে অবশ্য অভিন্ন যমজদের মধ্যে মিল অন্যদের তুলনায় আরো বেশি। ওদের একজনের মধ্যে যদি স্খিজোফ্রেনিয়া (বিভক্ত মন) অসুখ থাকে তা হলে অন্যজনেরও তা থাকার সম্ভাবনা ৫০%; অথচ সাধারণ যমজদের মধ্যে এই মিলের সম্ভাবনা মাত্র ১০-১৫%। সাধারণ বুদ্ধিমত্তার যে সচরাচর পরিমাপকে আই কিউ বলা হয় সে ক্ষেত্রে অভিন্ন যমজের মিল ৮০% এর মত যা সাধারণ যমজ বা সাধারণ ভাইবোনের মিলের চেয়ে অনেক বেশি। আই কিউ কে আজকাল বুদ্ধিমত্তার সঠিক মাপকাঠি বলে অনেকে মনে করেন না। তবুও অন্তত তাতে জিনের অবদানটি অতি বেশিই মনে হচ্ছে।

অভিন্ন যমজদের মধ্যে কিছু গবেষণা শুধু সাম্প্রতিক কালেই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগতে কোন কোন আচরণ সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে। এখানে আমরা এরকম দুটি বিষয়কে দেখবো– একটি হলো সমকামিতা সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিবর্তন, অন্যটি হলো এনোরেক্সিয়া নামে একটি মানসিক-শারীরিক রোগ সম্পর্কে নানাদিক থেকে আগ্রহ সৃষ্টি। ১৯৬০ এর দশকের থেকে শুরু থেকে সমকামিতাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার রীতি পাশ্চাত্যে লোপ পেয়েছিলো এবং ১৯৮০এর দশক নাগাদ একে একটি স্বাভাবিক ভিন্ন আচরণ হিসেবে মেনে নিয়ে আইনের দিক থেকে এর প্রতি বৈষম্যগুলো দূর করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিলো। ওই সময় থেকে এই ভিন্নতার কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ভাবে জানার আগ্রহটিও বেড়ে যায়। খোলামেলা প্রচুর তথ্য পাওয়া যাওয়ায় এবং গবেষণার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় অভিন্ন যমজদের ওপর সহ এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ অভিন্ন যমজদের মধ্যে অন্তত একজন সমকামী এমন ৩৮ জোড়া পুরুষ

অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে যমজের অন্য জনকেও সমকামী হিসেবে পাওয়া গেছে ৬৫% ক্ষেত্রে। কিন্তু একই ভাবে অন্তত একজন সমকামী এরকম ২৩ জোড়া পুরুষ সাধারণ যমজে উভয়কে সমকামী হিসেবে পাওয়া গেছে ৩০% ক্ষেত্রে। স্পষ্টত অভিন্ন যমজে দু'জনের সমকামী হবার সম্ভাবনা খুব বেশি, এবং সাধারণ যমজেও সেটি তার চেয়ে কম হলেও নেহাত কম নয়, কারণ যমজ নয় এমন ভাইদের মধ্যে দু'জনের সমকামী হবার সম্ভাবনা তার চেয়ে অনেক কম। এ ধরনের বহু গবেষণাকে একত্রে নিয়ে যে সাধারণ চিত্রটি পাশ্চাত্য জগতে দেখা গেছে পুরো জনসংখ্যার সব পুরুষের মধ্যে সমকামী হবার সম্ভাবনা ৩-৫% মানুষের। যে সব পরিবারে ভাইদের মধ্যে একজন সমকামী সেখানে অন্য ভাইদের কারো সেটি হবার সম্ভাবনা ১৬%। সাধারণ যমজ ভাইদের ক্ষেত্রে একজন সমকামী হলে অন্যজনের তা হবার সম্ভাবনা ৩০%। আর অভিন্ন যমজদের মধ্যে একজন সমকামী হলে অন্য জনও তা হবার সম্ভাবনা ৫০%।

স্পষ্টত জিনের একটি খুব বড় প্রভাব এখানে রয়েছে, যার ফলে অভিন্ন যমজ ভাইদের ক্ষেত্রে তো বটেই, সাধারণ ভাইদের মধ্যেও এই ব্যাপারে সাধারণ জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি মিল দেখা যাচ্ছে। সাধারণ ভাইয়ের থেকে সাধারণ যমজ ভাইদের মধ্যে এই মিল অনেক বেশি হওয়ায় ধারণা করা হয় এই বাড়তি মিল নিশ্চয়ই মায়ের গর্ভে একই সঙ্গে থাকাকালীন প্রভাবগুলোর সৃষ্টি। কারণ জিনের দিক থেকে দুই সাধারণ ভাইয়ের মধ্যে মিল যেমন গড়পড়তা ৫০%, তেমনি দুই সাধারণ যমজ ভাইয়েও সেটি ৫০%; জেনেটিক দিক থেকে যমজ ভাই আর সাধারণ ভাইয়ের কোন তফাত নেই। অন্যদিকে একটি মাত্র অবিশেষায়িত কোষ থেকে বেড়ে সকল অঙ্গপ্রতঙ্গ নিয়ে একটি শিশুতে পরিণত হবার যে প্রক্রিয়াটি মায়ের গর্ভে ঘটে তা জিনের তত্ত্বাবধানে হলেও তাতে মূল জিন ছাড়াও নিয়ন্ত্রণকারী অন্য কিছু ডিএনএ অংশও কাজ করে। এই শেষের অংশগুলোর ওপর গর্ভকালীন পরিবেশ ইত্যাদিরও প্রভাব থাকে, যাকে বলা হয় এপিজেনেটিক প্রভাব। যে কোন ধরনের যমজের ক্ষেত্রে এই এপিজেনেটিক প্রভাবের মিল-অমিলগুলোও যে বড় ভূমিকা রাখে তা এরকম বহু গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে। মহিলা

সমকামীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গবেষণায় অনেকটা একই রকম ফল পাওয়া গেছে। দেখা গেছে এক্ষেত্রেও সাধারণ মহিলা জনসংখ্যায় সমকামীর সংখ্যার চেয়ে, এক বোন সমকামী এমন পরিবারে অন্য বোনদের তা হবার প্রবণতা যথেষ্ট বেশি, সাধারণ যমজ বোনদের মধ্যে আরো বেশি, আর অভিন্ন যমজ বোনদের মধ্যে অনেক বেশি। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সমকামী হবার প্রবণতা কম। তাছাড়া ভাইয়ের সমকামিতা বোনকে প্রভাবিত করেনা, আবার বোনেরটাও ভাইকে করেনা। মনে হয় যে পুরুষের সমকামিতায় যে সব জিনের প্রভাব রয়েছে তা মহিলাদের সমকামিতার জিনের সঙ্গে পৃথক এবং পরস্পর দূরত্বে রয়েছে।

ওপরে অভিন্ন যমজের নানা স্বভাবের মধ্যে যে মিলগুলোর কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু সত্য হতে দেখা গেছে মোটামুটি ৫০% ক্ষেত্রে, কিছু কিছু সক্ষমতায় এর চেয়ে বেশি ক্ষেত্রে, কিন্তু কখনো পুরো ১০০% ক্ষেত্রে নয়। অথচ অভিন্ন যমজের মধ্যে জিনের মিল কিন্তু ১০০%। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে জিন ছাড়াও অন্য কিছুর প্রভাবও মানুষের নানা আচরণের ওপর রয়েছে। এর মধ্যে এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ার যে কথা বলা হয়েছে সেটি একটি বড় প্রভাব। এটি জিনের মিলের ওপর নির্ভর করেনা, গর্ভাবস্থায় বেড়ে ওঠার ওপর তো নির্ভর করেই, জন্মের পরও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একই ভাবে জিন-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্পর্কে পরে আমরা আরো দেখবো। তাছাড়া লালন-পালনের, শিক্ষার এবং কালচারেরও প্রভাব রয়েছে বৈকি। পরে একটি অধ্যায়ে আমরা দেখবো এগুলোর প্রভাবও শেষ পর্যন্ত জিনের সম্পূর্ণ আওতামুক্ত নয়, জিনই মধ্যস্থতা করে দেয় বাইরের এসব প্রভাব স্বভাবের ওপর কতখানি পড়বে কি পড়বেনা।

অন্য যে আরেকটি গবেষণাকে উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি তা আধুনিক পাশ্চাত্য কালচারে একটি আচরণগত প্রবণতার সম্পর্কে, যার নাম এনোরেক্সিয়া নেরভোসা– সংক্ষেপে এনোরেক্সিয়া। এতে যারা ভোগে তারা নিজেদেরকে ফ্যাশন দুরস্ত করতে গিয়ে অতিরিক্ত হালকা পাতলা করে রাখার চেষ্টা করে। এজন্য তারা খাওয়া দাওয়া দারুণভাবে কমিয়ে ফেলে, কখনো কিছুটা খেলেও তা পরক্ষণই জোর করে বমি করে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে,

ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা ঘটে। ধীরে ধীরে প্রবৃত্তিটি এতটা প্রবল হয়ে ওঠে যে এটি একটি মানসিক রোগের পর্যায়ে চলে যায়। এর একজন বিখ্যাত রোগী বৃটেনের প্রয়াত রাজকুমারী প্রিন্সেস ডায়ানা নিজে বলে গেছেন এ রোগের বিরুদ্ধে তাঁকে কীভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে, এবং খোলামেলা আলোচনা এতে কীভাবে সহায়ক হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে রোগটি পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে একাধিক সদস্যের থাকতে পারে। অভিন্ন যমজদের মধ্যে একজনের এটি থাকলে অন্য জনের থাকার সম্ভাবনা ৫০%। কাজেই এর পেছনে যে জিনের হাত রয়েছে তা মানতেই হয়। তবে নানা ভাবে বোঝা গেছে যে এটি একটিমাত্র জিনের কাজ নয়, বেশ কয়েকটির সমন্বয়েই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি হতে পারে বিষণ্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত জিন, আরেকটি হতে পারে নিজের সাফল্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উদ্বেগের জিন। একই সঙ্গে এনোরেক্সিয়ার সাথে সমাজের প্রচলিত কালচারের সম্পর্কটিও খুব স্পষ্ট। এটি শুধু পাশ্চাত্য কালচারে দেখা যাওয়া একটি রোগ। সেই কালচারের একটি জনপ্রিয় ফ্যাশনের দিক হলো সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সাফল্যের সঙ্গে হালকা-পাতলা দেহ গড়নের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া। আবার একই দিকে এরকম সাফল্যের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা, বিষণ্নতা ইত্যাদিকেও জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাছাড়া এই রোগ বয়োসন্ধিকালে, মাঝ বয়সের ক্রান্তিকালে ইত্যাদি পর্যায়ে প্রকট হতে দেখা যায়– যা হরমোন, জীবনের ষ্টাইল প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে। কাজেই একদিকে জিন, অন্যদিকে কালচার-পরিবেশ এই উভয়ের খুব ঘনিষ্ঠ একটি মিশ্রণ এখানে গবেষণায় ধরা পড়ছে। মনে হচ্ছে প্রাসঙ্গিক জিনগুলোর উপস্থিতির সঙ্গে বাইরের জীবন-পরিবেশ যেখানে খাপের খাপ মিলে গেছে সেখানেই এই আচরণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠছে।

নানা প্রাণীতে স্ত্রী-পুরুষের জোড় বাঁধা

আচরণের প্রাচীন বিবর্তনের ধারা এখনকার গবেষণার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করতে পারার আর একটি কৌশল হতে পারে পরস্পর জেনেটিক ভিন্নতা সম্পন্ন দুই ভিন্ন দলের আচরণ-ভিন্নতার বিষয়গুলো লক্ষ্য করা। এই ক্ষেত্রে

গবেষকদের হাতে একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষের আচরণ ভিন্নতা– বিশেষ করে প্রজননগত ব্যাপারে। ভিন্নতাটি প্রধানত প্রজননতন্ত্রের পার্থক্যের কারণেই। স্ত্রী-প্রাণীর ডিম্বকোষ বড়; তা সংখ্যায় কম; স্ত্রী তার ডিম অথবা সন্তান নিজের দেহে বড় করে তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ে বড় জোর কয়েকটার বেশি সন্তানের মা হতে পারেনা। পুরুষ-প্রাণীর শুক্রকোষ ক্ষুদ্র, সংখ্যায় অনেক বেশি, অনেক স্ত্রীর মাধ্যমে একই সঙ্গে অনেক সন্তানের বাবা হতে পারে। নানা প্রাণীর মধ্যে ব্যাপক গবেষণায় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে আচরণগত একটি জিনিস স্পষ্ট হয়েছে, তা হলো পুরুষ-প্রাণীদের মধ্যে অধিক সংখ্যক যৌনসঙ্গী রাখার যতখানি প্রবণতা রয়েছে, স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে সেই প্রবণতা অনেকটা কম। মাছ থেকে শুরু করে, পাখি, স্তন্যপায়ী অনেকের মধ্যেই স্ত্রী-পুরুষের এই প্রবণতার পার্থক্যটি দেখা যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় একটি বা কয়েকটি পুরুষ অনেক স্ত্রীকে যৌনসঙ্গী করে একত্রে রাখছে। এর বিপরীতে শুধু মৌমাছি, পিঁপড়ার মত কিছু সামাজিক কীট পতঙ্গে এক স্ত্রী অনেক পুরুষকে যৌনসঙ্গী করে রাখে– যেটি ব্যতিক্রমী। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সহজেই এর একটি চূড়ান্ত কারণ হিসেবে দেখাতে পেরেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনকে যা জিনবিস্তারের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে। জিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে স্ত্রী-প্রাণীর অথবা পুরুষ-প্রাণীর উভয়ের জিনেরই উদ্দেশ্য একই– নিজকে যত বেশি সম্ভব বিস্তৃত করা। স্ত্রীর ক্ষেত্রে জিনের কৌশলটি বহুসঙ্গীর দিকে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই। কারণ পুরুষসঙ্গী যতই থাকুক স্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বড় জোর কয়েকটি মাত্র সন্তান দিতে পারবে। তাই তার জিনের বিস্তার লাভ করতে বরং ওই সন্তান ক'টির স্বাস্থ্য ও বাঁচার দিকে মনোযোগ দেয়া উচিত; সেটি সম্ভব পরিবারে নিরাপত্তার মধ্যে থেকে। অন্য দিকে পুরুষের জিনের বিস্তার তার যৌনসঙ্গীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে স্ত্রী ও পুরুষের জিনের বিস্তারের কৌশল ভিন্ন হতে বাধ্য। এই যুক্তির থেকে গবেষকরা মানুষকেও বাদ দেননি। মানুষের সকল কালচারে প্রচলিত রীতির ভেতরে বা বাইরে থেকে এ সংক্রান্ত যত তথ্য রয়েছে তাতে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে দেখা যায় পুরুষের বহু যৌনসঙ্গী রাখার প্রবণতা স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি।

এসব অবশ্য আচরণের চূড়ান্ত কারণ; চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে যেহেতু জিনের বিস্তারের অধিক সুবিধাই আচরণটির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে অসংখ্য আচরণের কারণ এই একটাই– বিবর্তনে জিন-বিস্তার এভাবে বেশি হয়েছে বলে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি প্রাণী কী আচরণ করবে তা কিন্তু তার মস্তিষ্ক বলে দেয়। মস্তিষ্ক তাৎক্ষণিক ভাবে সেই কারণটি এই আচরণের জন্য সৃষ্টি করে দেয়, তাই সেটি আপাত কারণ। বিবর্তনে ওই সুবিধা পাওয়ার জন্য মস্তিষ্ক ওভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। আপাত কারণ নির্ণয় করতে হলে নানা প্রাণীতে আলাদা করে গবেষণা করতে হবে। তখন হয়তো দেখা যাবে অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই পুরুষের বহু-যৌনসঙ্গীনী থাকার আপাত কারণ তাদের মস্তিষ্কে অতিরিক্ত কর্তৃত্ববাদিতার উপস্থিতি। আবার স্ত্রীর সে অভ্যাসে কম হবার কারণ হয়তো তাদের মস্তিষ্কে শান্তিপ্রিয়তার অথবা নিরাপত্তাকামিতার উপস্থিতি। প্রাণীর মস্তিষ্ক চূড়ান্ত কারণের ধার ধারেনা, জিন বিস্তার তার চিন্তার বিষয় নয়– ওটি জিনের কৌশল, প্রাণীর নিজের আচরণ চলে আপাত কারণে। এ ধরনের আচরণের গবেষণা খুব সম্ভব সব চেয়ে বেশি হয়েছে বিভিন্ন পাখিদের ক্ষেত্রে। এর একটি কারণ হলো স্ত্রী-পুরুষ সারা জীবনের জন্য জোড় বাঁধার রীতিটি পাখিদের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায়। এটি এমন একটি রীতি যা বিবর্তনের দ্বারা খুব বেশি সমর্থিত নয়, কারণ বিশেষ করে পুরুষের জিন বিস্তারের সুযোগ এতে কমে যাওয়ার কথা। তা সত্ত্বেও খুব সম্ভব বাবা-মা উভয়ের মিলিত চেষ্টায় সন্তান যত্নের সুবিধার জন্য এটি বিবর্তিত হয়েছে– পাখি দম্পতির ক্ষেত্রে উভয়ের এই যত্নটি দেখার মত। আমাদের জনশ্রুতিতে তাই পাখির এরকম দাম্পত্য জীবন প্রবাদতুল্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞানীরা বহু পরীক্ষণে প্রমাণ করেছেন যে জীবনব্যাপী জোড়ের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সুযোগ বুঝে বাইরের অন্য যৌনসঙ্গীও মাঝে মাঝে গ্রহণ করে; এবং এটি তুলনামূলকভাবে বেশি করে পুরুষ-পাখি। এক্ষেত্রেও জিন বিস্তারের সুবিধাটিই আচরণের এ পার্থক্যের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে ধরে নেয়া হয়। তবে গবেষণা আরো কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করেছে।

দেখা গেছে জোড়ের স্ত্রী-পাখিটি পুরুষের এই আচরণকে বেশ সহনশীল ভাবে নিয়ে থাকে। এর চূড়ান্ত কারণ হিসেবে গবেষকরা বলেন জোড়ের পুরুষটি বাসার বাচ্চাগুলোর যত্ন নিতে কোন কার্পণ্য করেনা বলে তাদের মাধ্যমে স্ত্রীর জিন বিস্তার যেভাবে হবার কথা সেভাবেই হয় তাতে কোন কমতি হয়না। অন্যদিকে জোড়ের পুরুষ-পাখিটি স্ত্রীটির জোড়ের বাইরের যৌনসঙ্গী নেবার ঘটনা বন্ধের জন্য সব রকমের চেষ্টা করে– তাকে নজরে রাখে, তার সঙ্গে অন্য পুরুষ পাখি দেখলেই সেটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে তাড়িয়ে দেয়, এবং স্ত্রী পাখিটি যে ডিমগুলো পাড়ছে সেগুলো যেন সত্যি সত্যি তারই শুক্রকোষে নিষিক্ত হয় সে জন্য সহজাত ভাবেই নানা কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকে। এসবের ব্যাখ্যাও জিন বিস্তারের নিরিখে খুব সহজ। অন্য পুরুষ পাখির কোন সন্তান জোড়ের পুরুষের দ্বারা লালিত পালিত হলে এতে তার শক্তি ও সময় ক্ষয় হবে, অথচ কিন্তু তার নিজের জিন বিস্তারের সুযোগ বরং কমে যাবে। তাই সহজাত ভাবেই তার পক্ষে এতে বাধা দেয়াটাই স্বাভাবিক। এখানেও এই কারণটি চূড়ান্ত কারণ। অপর পুরুষকে বাসার কাছে বা জোড়ের স্ত্রীর কাছে দেখলে তাকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে আক্রমণ করার সিগন্যালটিই মস্তিষ্কে তৈরি হয়। খুব সম্ভব এটি শুধু প্রজনন মৌসুমেই হয়, ওভাবে জিন বিস্তারের সুবিধা হয়েছিল বলে বিবর্তন পাখির মস্তিষ্ককে ওভাবেই গড়ে দিয়েছিল। সিগন্যালটি অতশত ভেবেচিন্তে হয়না, অন্য পুরুষ দেখলে এমনিতেই হয়। কোন্ প্রেরণায় অর্থাৎ কোন্ আপাত কারণে হয় তা এখনো গবেষণা সাপেক্ষ।

একটি প্রশ্ন কিন্তু এসবের মধ্যে থেকে যায়। স্ত্রী-পাখির একাধিক যৌনসঙ্গী গ্রহণ তার জিন বিস্তারে কোন সুবিধা দেয়না। এ জন্য তার ক্ষেত্রে এই অভ্যাস কম। কিন্তু সেটি শূন্যের পর্যায়ে যায়নি কেন? দেখা যাচ্ছে যে পুরুষের তুলনায় কম হলেও তার মধ্যেও অভ্যাসটি প্রচুর রয়েছে। জিন বিস্তার সুবিধার সাধারণ উত্তরটি এখানে খাটছেনা। এর জন্য অধিকতর গবেষণার প্রয়োজন হয়েছে। যে উত্তর পাওয়া গেছে তা হলো স্ত্রী-পাখির ক্ষেত্রে এর কারণ জিন বিস্তারের পরিমাণ বৃদ্ধি নয়, তার গুণ বৃদ্ধি। স্ত্রী পাখিকে যদি তার সব সন্তানদের জিনের গুণের জন্য সবেধন নীলমণি

জোড়ের পুরুষটির ওপর নির্ভর করতে হয়, তা হলে সবার ক্ষেত্রে সেই গুণ হবে গতানুগতিক। এই বাচ্চাদের স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবিতা, সন্তানদান ক্ষমতা ইত্যাদির ওপরও নির্ভর করবে তার স্ত্রী-পাখিটির জিন বিস্তার। এই ক্ষেত্রে বৈচিত্র এনে কোন কোন সন্তানের ক্ষেত্রে যদি এসব গুণ বাড়িয়ে নেয়া যায়, তা হলে মন্দ কী?

পরীক্ষণেও দেখা গেছে স্ত্রী-পাখি অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান, চটপটে বাইরের পুরুষদেরকেই তার যৌন সাথী করে। তাছাড়া জোড়ের পুরুষের সার্বক্ষণিক নানা রকম বাধা সত্ত্বেও সে যে ভিন্ন গুণের সন্তান জন্ম দিতে প্রায়শ সক্ষম হয় তাও বোঝা গেছে তার নানা সন্তানের ডিএনএ পরীক্ষা করে এবং তা জোড়ের স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পাখির ডিএনএ'র সঙ্গে তুলনা করে। এভাবে প্রায়ই দেখা যায় যে দু'একটি সন্তানের বাবা জোড়ের পুরুষটির নয়। এতে জোড়ের পুরুষের জিন বিস্তার বরং ব্যাহত হয় বলেই তার দিক থেকে এত বাধা আসে। সেই বাধা অতিক্রম করেই যে স্ত্রী-পাখি সফল হয় তার কারণ বাধার যত কৌশল পুরুষ-পাখি নিয়ে থাকে, গবেষণায় দেখা গেছে তার প্রত্যেকটির উল্টো কৌশল স্ত্রী-পাখিও নিয়ে থাকে। এ যেন উভয়ের মধ্যে এক 'অস্ত্র-প্রতিযোগিতা'। এর সবই অবশ্য হচ্ছে সহজাত অভ্যাস হিসেবে, কেউ চিন্তা ভাবনা করে যে একে অপরকে ঠকাবার প্রতিযোগিতায় রত হয়েছে তা কিন্তু মোটেই নয়। সবই ঘটছে বিবর্তনের চূড়ান্ত কারণে, সবই নিজের বিস্তারের জন্য যার যার জিনেরই কারসাজি। অন্তত কগ্‌নিশন বা মননশীলতার ক্ষমতাহীন এই পাখির জোড়ের ক্ষেত্রে এ কথাই খাটে। তাৎক্ষণিক ভাবে মস্তিষ্কের কোন্ প্রেরণায় পাখি এ সব আচরণ করছে সেটি অবশ্য আপাত কারণের ব্যাপার। তার নির্ণয়ে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক গবেষণা প্রয়োজন।

স্ত্রী-পুরুষ স্থায়ী জোড় বাঁধার রীতিটি পাখির মধ্যে ব্যাপক ভাবে দেখা গেলেও স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি খুব বিরল। তবে স্তন্যপায়ীর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো কোন কোন প্রাইমেট গোষ্ঠির প্রাণী (বানর, এইপ, মানুষ। দেখা গেছে প্রাইমেটদের প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রজাতি এভাবে স্থায়ী জোড় বাঁধে– বিশেষ করে এইপের মধ্যে উল্লুক, এবং বানরের মধ্যে কিছু আমেরিকা-মহাদেশীয় বানর এভাবে জীবনব্যাপী জোড় বাঁধে। সাধারণভাবে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে যা

নেই তা এদের মধ্যে কেন এলো সেটি একটি বড় প্রশ্ন। জিন বিস্তারের ক্ষেত্রে স্তন্যপায়ীর সাধারণ অভ্যাসের তুলনায় এরকম স্থায়ী জোড় বাঁধার কোন স্পষ্ট সুবিধা নেই। তাছাড়া ব্যাপক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে জীবনব্যাপী স্থায়ী জোড়ে বাঁধলেও পাখির মতই এদেরও স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই অন্য যৌনসঙ্গী নেবার অভ্যাস রয়েছে– যেটি অবশ্য জিন বিস্তারের সহায়ক। তাই যদি হবে তা হলে বাকি সব স্তন্যপায়ী বা অন্য প্রাইমেটদের মত খোলামেলা সেটি না করে এরকম জোড় বাঁধা কেন? সাধারণ ভাবে মনে হয় এ যেন একটি সামাজিক রীতি মাত্র– লোক দেখানো ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা তাই একে বলেও থাকেন 'সামাজিক জোড় বাঁধা'। এরও যদি কোন বিবর্তনজনিত কারণ থাকে তা হলে সেটি কী? সম্প্রতি ২০১৫ সালে এ সম্পর্কে একটি গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাথমিক পরীক্ষণে প্রাণী জগতে এই সামাজিক জোড় বাঁধার তিনটি সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথমটি হলো সন্তানদের যত্ন নেবার জন্য সার্বক্ষণিক দু'জন যত্ন-কারী থাকা, এটি সন্তানদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন– যা জোড়ের উভয়ের জিন বিস্তারে সহায়ক। দ্বিতীয় যে কারণটি জোড় বাঁধার সপক্ষে কাজ করতে পারে সেটি স্তন্যপায়ীদের মধ্যে দেখা যাওয়া এক নিষ্ঠুর আচরণের হতে থেকে সন্তানকে রক্ষা করা– যা হলো শিশু হত্যা। বিশেষ করে যে সব স্তন্যপায়ীতে এক পুরুষের কর্তৃত্বে অনেক স্ত্রী থাকে সেখানে ওই কর্তা-পুরুষটিকে (সাধারণত বলা হয় আলফা-পুরুষ) কিছু সময় পরপরই অন্য উঠ্তি শক্তিমান পুরুষের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে তাকে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত আঘাত, ভগ্নস্বাস্থ্য, বার্ধক্য ইত্যাদির সুযোগে তাকে পরাজিত করে নতুন কর্তা-পুরুষ যখন ওই স্ত্রী-দলের দখল নেয় তার প্রথম কাজ হয় দলের সবগুলো শিশুকে দ্রুত একে একে হত্যা করা। ওই শিশুদের মায়েরা তাদেরকে নানা গোপন জায়গায় লুকাবার চেষ্টা করে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু হত্যাকারী পুরুষ তাদেরকে লুকানোর জায়গা থেকে খুঁজে বের করে। সিংহ, সিন্ধুঘোটক, এবং কিছু প্রাইমেট সহ অনেক স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এই আচরণ বেশি দেখা যায়। এই নিষ্ঠুর আচরণটি কেন বিবর্তিত হয়েছে তা বোঝা কঠিন নয়। এতে স্তন্য দেয়ার মত

শিশু বেঁচে না থাকায় নতুন কর্তা-পুরুষটির সন্তান ধারণ করতে ও সেই সন্তানদেরকে যত্ন করতে দলের স্ত্রীদের আগ্রহ ও সুযোগ বাড়ে; ফলে নতুন পুরুষটির জিন বিস্তারের সুবিধা হয়। কিন্তু ওই নিহত শিশুদের বাবার জিন বিস্তার এতে প্রবল ভাবে ব্যাহত হয়, মা'দের জিন বিস্তার যথেষ্ট ব্যাহত হয়। বিবর্তনে সবার আচরণের সহজাত ঝোঁক থাকে যার যার জিন বিস্তার বাড়াতে, তা কমাতে নয়। তাই প্রাইমেটদের কোন কোন প্রজাতি নিজেদের সন্তানের হত্যা এড়াতে জোড় বাঁধাকেই কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। তৃতীয় যে কারণটি জোড় বাঁধার সপক্ষে কাজ করে বলে মনে হয়েছে সেটি আপাত দৃষ্টিতে শুধু পুরুষের জিন বিস্তারে সহায়ক হয়– তা হলো জোড়ের স্ত্রীকে সবসময় চোখে চোখে রেখে তাকে অন্য যৌনসঙ্গী থেকে দূরে রাখার প্রায় সার্বক্ষণিক সুযোগ। এরকম পাহারাদার পুরুষটিকে বাসার কাছে বেশি রাখা যায় বলে সন্তানের যত্ন বাড়ে ও সেভাবে স্ত্রীর জিনের বিস্তারেও সুবিধা হয়।

সাম্প্রতিক গবেষণাটি করা হয়েছে বেশ কিছু প্রাইমেট প্রজাতি ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার মাধ্যমে সম্ভাব্য নানা ঘটনা, নানা ফলাফলের কম্পিউটার সিম্যুলেশন করে। এতে অসংখ্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেখা হয়েছে কোন্ কারণ কতখানি ওই জোড় বাঁধার সহায়ক হচ্ছে। আসলে বিবর্তনের সিম্যুলেশন করার যে কথা আমরা আগে দেখেছি এও সে রকমের। ফলাফলে দেখা গেছে অনুমিত তিনটি সুবিধাই জোড় বাঁধার ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে কিন্তু এর মধ্যে জোড় বাঁধার বিবর্তনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় শুধু একটিকে– তা হলো শিশু হত্যা রোধ। এর যুক্তি হলো সিম্যুলেশনে দেখা গেছে জোড় বাঁধা বিবর্তিত হবার আগেই প্রাইমেট সহ নানা স্তন্যপায়ীতে শিশু হত্যা বিবর্তিত হয়েছিলো। ফলে এটি এড়াবার জন্য কোন কোন প্রজাতিতে জোড় বাঁধা বিবর্তিত হতে পেরেছে। অন্য দুটি আচরণকে জোড় বাঁধা বিবর্তনের পরে চালু হতে দেখা গেছে। এই সব গবেষণাতে জিন বিস্তারকেই নানাভাবে যৌন আচরণের ও আনুসঙ্গিক অন্য আচরণের পেছনে দেখা গেছে।

স্বজনপ্রীতির অন্তরালে

প্রাচীনকালে সংঘটিত বিবর্তনের অর্থাৎ জিন বিস্তারের প্রমাণ আজকের গবেষণায় উদ্ঘাটনের জন্য আমরা নানা কৌশল অবলম্বন করেছি। সর্বজনীনতার উৎস সন্ধান, অভিন্ন যমজের মধ্যে স্বভাবের মিল খোঁজা, স্ত্রী-পুরুষের আচরণের তুলনা ইত্যাদি এ সবের মধ্যে পড়ে। এ সবের মাধ্যমে আমরা নানা আচরণের উৎসও খুঁজে পেয়েছে। গবেষণার আরো একটি অদ্ভুত কৌশল এনে দিয়েছে নানা প্রাণী কেন নিজেদের মধ্যে একে অপরের উপকার করে তার কারণ অনুসন্ধান। এখানে বিশেষ করে পরোপকার হিসেবে সেগুলোকেই গণ্য করতে হবে যেখানে উপকারকারী নিজের কিছু ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের উপকার করে। প্রাণী জগতে এমন উদাহরণেরও কমতি নেই। যেমন কাকের মত কোন কোন পাখি অথবা বানরদের মধ্যে ভেরবেট বানর নামের একটি প্রজাতি কোন হিংস্র পশু পাখি আক্রমণকারীকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ রকম চিৎকার করে সবাইকে সাবধান করে দেয়। এ চিৎকার শুনে সবাই সময়মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করে বটে কিন্তু চিৎকার দেয়া উপকারী সদস্যটি এর মাধ্যমে নিজের বিপদ ডেকে আনে। আওয়াজ করে সবার আগে আক্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে এটি নিজেই আক্রমণের শিকার হতে পারে। এই ঝুঁকি নিয়ে অন্যের উপকার করাতে অবশ্যই তার বাঁচার ও জিন বিস্তারের কোন সুবিধা হয়না, বরং অসুবিধা হয়। তবুও এই স্বভাবটি বিবর্তিত হলো কেন?

নিজের আত্মত্যাগ করে অপরের উপকার করার ব্যাপারটি আরো অদ্ভুতভাবে দেখা যায় কিছু সামাজিক কীটপতঙ্গের মধ্যে– যেমন পিঁপড়া, মৌমাছি, ইত্যাদির মধ্যে। সেখানে দেখা যায় আক্রান্ত হলে নিজেদের কলোনির বাকি সব সদস্যকে রক্ষা করার জন্য এদের কোন কোন কর্মী প্রাণপণে লড়াই করে নিজেদেরকে আহত করে, প্রায়ই আত্মাহুতি দেয়। এভাবে নিজের মরণ ঘটিয়ে আর যাই হোক নিজের জিন বিস্তারের আপাতত কোন সুযোগ দেখা যায়না। এতে নিজের বাঁচার সুযোগ বাড়িয়ে অধিক সন্তান দেবার কারণতো ঘটেই না বরং ঠিক তার বিপরীতটিই ঘটে। তারপরও পরোপকারের এই সহজাত প্রবণতাটি বিবর্তিত হবার কারণটি যে কী সেটিই প্রশ্ন।

এর উত্তর বিজ্ঞানীরা সহজে পাননি। বিভিন্ন কানাগলিতে ঘোরার পর যে উত্তরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা হলো এভাবে পরোপকারে আত্মত্যাগ করলেও নিজের জিনের বিস্তার ঘটবে, কিন্তু তা ঘটবে যাদের উপকার করা হচ্ছে তারা যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয় তবে। জিন বিস্তার হওয়া মানে জিনের কপি বিস্তার হওয়া, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে নিজের অনেক জিনের কপি আছে বলে সেখান থেকেই তার বিস্তার ঘটতে পারে। তাই এমনকি কেউ নিজে যদি নাও বাঁচে, অথবা নিজের বাঁচার ক্ষেত্রে ক্ষতি স্বীকার করে কিন্তু তার দ্বারা কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে বেশি বাঁচতে সাহায্য করে, তা হলে সেভাবেও তার জিনের বিস্তার হতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাণীর মধ্যে নিজের আত্মীয়ের উপকার করার স্বভাবটিই বিবর্তিত হয়েছে, যে কোন কারো উপকার করাটি নয়। এক্ষেত্রে আত্মীয়তাটি যত ঘনিষ্ঠ হবে, তত বেশি জিনের কপি সেই আত্মীয়ের কাছে থাকবে, কাজেই তার উপকার করাতে জিন বিস্তার তত বেশি ঘটবে। কাজেই প্রবণতাটা হওয়ার কথা যে যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তার তত বেশি উপকার করা। এই তত্ত্বটিকে বলা হলো 'আত্মীয় নির্বাচন', অর্থাৎ সোজা কথায় স্বজনপ্রীতি।

এই তত্ত্বটি নানা পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন যেই ভেরবেট বানর চিৎকার করে সবাইকে আক্রমণকারী থেকে সাবধান করে দেয়, সেটি কিন্তু সব সময় তা করেনা, আশপাশে যদি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন যেমন তার সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন, খালা-মামা-চাচা-ফুপু বা তাদের সন্তান এমনি কেউ থাকে তবেই তারা নিজের ঝুঁকি নিয়ে এরকম চিৎকারের মাধ্যমে সাবধান করে, নইলে করেনা। এটি নিশ্চিত করার জন্য গবেষকদেরকে বহুদিনের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওই বানরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে চিনতে হয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করতে হয়েছে। তারপর ওই নানা ঘনিষ্ঠতার আত্মীয়ের উপস্থিতিতে হিংস্র পশুর মূর্তির মত কৃত্রিম 'আক্রমণকারীর' আক্রমণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বানরটি তাতে কী ভাবে সাড়া দিচ্ছে তা লক্ষ্য করা হয়েছে। দেখা গেছে যত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা উপস্থিত থাকে চিৎকারের তীব্রতা তত বেশি হয়।

বেছে বেছে আত্মীয়দের উপকার হলে সব ধরনের আত্মীয়কে আলাদা করে চেনার ক্ষমতা ওই প্রাণীর থাকতে হয়। ভেরবেট বানর যে এটি করতে পারে তা এসব পরীক্ষণেই বোঝা গেছে। ব্যাপকতর গবেষণায় দেখা গেছে বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে আত্মীয়দের চেনার ক্ষেত্রে ঘ্রাণের সূক্ষ্ম তারতম্য ধরতে পারার ক্ষমতা বিশেষ ভূমিকা রাখে। প্রায় সব রকম প্রাণীই ছোটবেলা থেকে একত্রে যাদের সঙ্গে থাকে তাদেরকে আত্মীয় হিসেবে চিনতে পারে। এভাবে অনেক প্রাণী আত্মীয়দেরকে প্রায় জীবনভর মনে রাখতে পারে।

আত্মীয়দের উপকার করার এই যে প্রবণতা তাও কাজ করে বিশেষ জিনের কারণে যাকে বা যেগুলোকে বলতে পারি স্বজনপ্রীতির জিন। এই জিন যার আছে তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যেও থাকার সম্ভাবনা বেশি অন্যান্য জিনের কপির মতই। কাজেই ওই উপকার পাওয়া আত্মীয়রা উপকারের কারণে অধিক বেঁচে থাকাতে ও অধিক সন্তান দেয়াতে স্বজনপ্রীতির এসব জিনও বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়েছে। এভাবেই নানা প্রাণীতে আত্মীয়রে উপকার করার প্রবণতাটি ছড়িয়ে পড়ে এখন অবধি চলে এসেছে। আগে যে আমরা বিভিন্ন প্রাণীতে বাবা-মা'র মধ্যে মরণপণ করে সন্তানকে নিরাপত্তা দেবার প্রবণতার কথা বলেছে সেটিও এর একটি উদাহরণ। সন্তানের অর্ধেক জিন আসে বাবা থেকে আর বাকি অর্ধেক মায়ের থেকে। কাজেই নিরাপত্তা দেবার ফলে সন্তান বাঁচলে তাদের এসব জিনেরও বিস্তার হয়। আবার সন্তানকে নিরাপত্তা দেবার জিনটিও এভাবে সন্তানের মধ্যে আছে। এই সন্তান আবার তার সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে মরনপণ করবে ওই জিনের প্রভাবে। দীর্ঘজীবী সন্তান ও তাদের সন্তানদের মাধ্যমে এই জিনটিরও বিস্তার ঘটেছে। ফলে সন্তানকে নিরাপত্তা দেবার আচরণটিই এখন ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। এটিও আত্মীয়-নির্বাচনের একটি স্পষ্ট প্রমাণ। সন্তানের প্রতি অবহেলা করার বা নিষ্ঠুর আচরণ করার কোন জিন যদি থেকেও থাকতো তার ফলে সন্তানগুলো অল্প বয়সে মারা পড়তো বলে তাদের মাধ্যমে ওই জিন বিস্তৃত হবার কোন সুযোগ ছিলনা।

বিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যামিলটন আত্মীয়-নির্বাচন তত্ত্বে এই স্বজনপ্রীতির মাত্রা কোথায় কীরকম হওয়ার কথা তার রীতিমত একটি গাণিতিক সূত্র দিয়ে গেছেন– যাকে বলা হয় হ্যামিলটনের নিয়ম। একজন আত্মীয়ের উপকার করলে তার ফলে ওই আত্মীয়ের যে সুবিধা হবে তাকে একটি গাণিতিক রাশি হিসেবে মাপার চেষ্টা করা যায় এবং b (বেনেফিট) হিসেবে প্রকাশ করা যায়। একই ভাবে যে সাহায্য করলো তাকে নিজের যে ক্ষতি বা ত্যাগ এই উপকারটির জন্য স্বীকার করতে হলো তাকে প্রকাশ করা হলো c (কষ্ট্) হিসেবে। এখন হ্যামিলটনের নিয়মটি হবে $b > \frac{c}{r}$ । এর মধ্যে r রাশিটি নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন, এর দ্বারা ওই আত্মীয়টির সঙ্গে উপকারীর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে প্রকাশ করা হচ্ছে; তাকে বলা হয় 'সম্পর্কের মাত্রা'। উভয়ের মধ্যে ভগ্নাংশের হিসেবে কী পরিমাণ জিন গড়পড়তা একই থাকার কথা ঘনিষ্ঠতার হিসেবটি সেখান থেকে আসে, ওটিই হলো r। দুইজন যদি অভিন্ন যমজ হয় তা হলে তাদের একজনের সব জিন অন্য জনের মধ্যে থাকে– কজেই সে ক্ষেত্রে r হলো ১, যা কিনা সর্বোচ্চ (ভগ্নাংশ)। সন্তানের অর্ধেক জিন বাবার থেকে ও অর্ধেক মায়ের থেকে আসে, তাই বলা যায় বাবার ও সন্তানের মধ্যে অর্ধেক জিন একই থাকে। এটি আসলে হুবহু অর্ধেক হতেই হবে এমন নয়, তবে গড়পড়তা সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে তাই হবে, অর্থাৎ বাবার ও সন্তানের মধ্যে r হলো $\frac{১}{২}$ । একই ভাবে মায়ের সঙ্গে সন্তানের rও $\frac{১}{২}$ । একই যুক্তিতে ওই গড়পড়তা হিসেবে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের, বোনের সঙ্গে বোনের, এবং ভাইয়ের সঙ্গে বোনের r হলো $\frac{১}{২}$ । দাদা, দাদি, নানা, নানি এই চার জনের প্রত্যেকের যত ভাগ জিন শেষ অবধি নাতি ও নাতনির কাছে যাওয়ার সম্ভাবনা সেই হিসেবে ওদের প্রত্যেক্যের সঙ্গে নাতি বা নাতনির r হবে $\frac{১}{৪}$ । দুই কাজিনের মধ্যে আত্মীয়তার এই মাত্রা

আরো কম, তাদের মধ্যে r হলো $\frac{১}{৮}$ । এভাবে আত্মীয়তা যত দূরের হবে r তত ছোট ভগ্নাংশ হবে এবং তা যে কোন দূরত্বের আত্মীয়র মধ্যেও থাকবে; যদিও সত্যি সত্যি উভয়ের একই কোন জিন থাকার সম্ভাবনা সেক্ষেত্রে অনেক কমে যাবে।

এখন হ্যামিলটনের নিয়মের দিকে তাকালে বোঝা যাবে এটি বলছে আত্মীয়তার মাত্রা (r) যত বেশি হবে উপকারী প্রাণিটি নিজের ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ (c) ততই আত্মীয়ের উপকারের পরিমাণের (b) কাছে নিয়ে যাবে। যেমন ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় অভিন্ন যমজের জন্য (r=১) যদি উপকার করাটির ওপর আত্মীয়টির জীবন-মরণ নির্ভর করে তবে উপকারকারীও এর জন্য নিজের জীবন-মরণ পণ করার কাছাকাছি চলে যাবে। ছেলে-মেয়ে, বাবা-মা, ভাই-বোনের জন্য ত্যাগ স্বীকার উপকারের অর্ধেকের কাছাকাছি যাবে। কিন্তু অনেক দূরের আত্মীয়ের জন্য, যেখানে r খুব ছোট ভগ্নাংশ সেরকম কিছু মোটেই করবেনা, উপকারের তুলনায় ত্যাগ স্বীকার অনেক ছোট হবে। ভেরভেট বানর বা মৌমাছির মত অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষণে উপকারের ও ত্যাগ স্বীকারের যথাসম্ভব গাণিতিক মাত্রা বের করে নানা আত্মীয়ের জন্য তাদের উপকার আচরণে হ্যামিলটনের নিয়ম চমৎকার ভাবে লাগসই হতে দেখা গেছে।

কতগুলো ক্ষেত্রে ওই উপকার ও ত্যাগ স্বীকারকে একটি গাণিতিক রাশিতে রূপ দেয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। যেমন এমন কিছু পাখি আছে যারা প্রজননের মৌসুমে বাচ্চাদের যত্ন নিতে হিমসিম খেয়ে যায় বলে প্রতিবেশী অন্য পাখির সাহায্য নিয়ে থাকে। তখন প্রতিবেশী পাখি এসে বাসায় বাচ্চাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে পাহারা দেয়, খাবার এনে তাদেরকে খাওয়াতেও সাহায্য করে। দেখা যায় যে এই উপকারী প্রতিবেশীরা সাধারণত মা পাখির কোন না কোন রকম আত্মীয় হয়ে থাকে। কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সেটি জেনে r জানা যায়। সাহায্যকারীটি সাহায্যের জন্য কত সময় ব্যয় করে, কত শক্তি ব্যয় করে তার থেকে c বের করা যায়। একই ভাবে এর ফলে মা পাখির কত সময় ও শক্তি

বাঁচলো যেখান থেকে b বের করা যায়। সব কিছু এখন হ্যামিলটনের নিয়মে ঢোকালে এবং নানা ক্ষেত্রে নানা ঘনিষ্ঠতার আত্মীয়ের সাহায্যের মধ্যে তুলনা করলে নিয়মটি সুন্দর মানা হচ্ছে দেখা যায়।

হ্যামিলটনের নিয়ম প্রমাণের আর একটি সুন্দর সুযোগ এনে দিয়েছে মৌমাছির প্রজননের ক্ষেত্রে অদ্ভুত এক ব্যতিক্রমী ব্যাপার। মৌমাছির চাকের অর্থাৎ কলোনির সব সদস্য একটি মাত্র রাণীর সন্তান। তাদের অধিকাংশই স্ত্রী-সন্তান যাদের শ্রমিক মৌমাছি বলা হয় কারণ তারা নিজেরা বাচ্চা দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং শুধু কলোনির সবার জন্য কাজ করে বিশেষ করে রাণীর নতুন নতুন সন্তানদের জন্য। এ ছাড়া অল্প কিছু পুরুষ মৌমাছি থাকে যাদের সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে রাণী সামনের সব প্রয়োজনের শুক্রকোষগুলো সংগ্রহ করে নেয় এবং সেগুলো দিয়ে নিজের প্রচুর স্ত্রী-সন্তান হবার ডিমগুলোকে ধীরে ধীরে নিষিক্ত করে। ব্যতিক্রমী ব্যাপার হলো পুরুষ সন্তানগুলো জন্ম দেবার সময় ডিমকে পুরুষের শুক্রকোষ দিয়ে নিষিক্ত করতে হয়না। অনেকটা অযৌন প্রজননের মত রাণীর অনিষিক্ত ডিমই পুরুষ সন্তানে পরিণত হয়। মৌমাছি ছাড়া আরো অল্প কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়– যাকে বলা হয় পার্থেনোজেনেসিস। আরেকটি অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই পুরুষগুলোর শুক্রকোষ তৈরির সময় ওই যে সাধারণত ডিএনএ'র ইতস্তত ভাঙ্গাগড়া ও বিনিময়, যাকে আমরা ক্রস্ ওভার নামে আগে দেখেছি তা হয়না। এই ভাঙ্গাগড়ার কারণেই সাধারণত এক একটি শুক্রকোষের জিনের সঙ্গে অন্য শুক্রকোষের জিনে পার্থক্য দেখা দেয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তা হতে না পারায় একটি পুরুষের সব শুক্রকোষে সব জিন একই থাকে।

রাণীর ডিম্বকোষ এবং এই পুরুষের শুক্রকোষ মিলিত হয়ে যে শ্রমিক মৌমাছির জন্ম হয় তাদের প্রত্যেকে মায়ের থেকে অর্ধেক ও বাবার থেকে অর্ধেক জিন পায়। তাদের দুই বোনের মধ্যে মায়ের থেকে যে অর্ধেক তার গড়পড়তা অর্ধেক একই জিন হবে, অর্থাৎ মায়ের কারণে দুই বোনের $\frac{১}{৪}$ ভাগ জিন এক হবে। বাবার কারণেও সাধারণত আরো $\frac{১}{৪}$ ভাগ এক ভাগ

জিন এক হবার কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে বাবার সব শুক্রকোষ একই জিনের হওয়াতে দুই বোনের মধ্যে বাবার দিকের সব জিনই এক হবে; অর্থাৎ বাবার অর্ধেকের সব জিন দু'বোনের মধ্যে এক হওয়াতে সেই $\frac{১}{২}$ জিন এক হবে। মোট এভাবে $\frac{১}{৪}+\frac{১}{২}=\frac{৩}{৪}$ ভাগ জিন সব বোনের মধ্যে গড়পড়তা একই থাকবে। তাদের আত্মীয়তার মাত্রা r হবে $\frac{৩}{৪}$, সাধারণ বোনদের মত $\frac{১}{২}$ নয়। তাই তাদেরকে নেহাত বোন বা সিষ্টার না বলে 'সুপার সিষ্টার' বলাই সঙ্গত হবে কারণ বোনের চেয়েও তারা অধিক ঘনিষ্ঠ। কেন মৌমাছির ক্ষেত্রে কিছু শ্রমিক মৌমাছি কলোনির বাকি সবার জন্য জীবন বিসর্জন দেয় সেই রহস্যময় প্রশ্নের উত্তরটি এখন হ্যামিলটনের নিয়মই দিতে পারলো। এ কলোনির মধ্যেই যে রয়ে গেছে তাদের অনেক সুপারসিষ্টার, যাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বোনের চেয়ে বেশি– বলতে গেলে অভিন্ন যমজের কাছাকাছি। অবশ্য সুপারসিষ্টার হবার জন্য একই বাবার সন্তান হতে হবে। হিসেব করে দেখা গেছে চাকের গড়পড়তা ৫% শ্রমিক মৌমাছি একই বাবার সন্তান হয়। যেখানে চাকে বহু হাজার শ্রমিক মৌমাছি তখন এই ৫% সুপারসিষ্টার নেহাত কম নয়, ওদের জন্য এই চরম আত্মত্যাগ করাই যায়– কারণ ওরা বেঁচে থাকলে নিজের জিনের বিস্তৃতি আরো ভাল ভাবে ঘটবে, নিজে বেঁচে থাকার চেয়েও। হ্যামিলটনের নিয়মও সে কথাই বলে।

মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী উপকার করার যে রকম তথ্য সব সমাজ থেকে পাওয়া যায় তাতে আত্মীয় নির্বাচন যে মানুষের বিবর্তনেও কাজ করেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। হ্যামিলটনের নিয়মও মানুষের ক্ষেত্রে ভালই খাটে। মানুষের স্বজনপ্রীতি কথাটি তো আর এমনি এমনি আসেনি। সব প্রাণীর মত মানুষের আত্মীয়তার মাত্রাও দূরের আত্মীয়ের ক্ষেত্রে কমে যায়, তারপরও একই পাড়ার মধ্যে নানা মানুষের সঙ্গে কমবেশি আত্মীয়তা থাকার সম্ভাবনাটি যথেষ্ট। পাড়ায় পাড়ায় বিরোধ লাগলে মানুষ যে নিজের পাড়ার পক্ষে কাজ করে, এর জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তার ব্যাখ্যা এভাবে

আত্মীয়-নির্বাচনের মাধ্যমে দেয়া যায়। একই কথা হয়তো আরো বড় ক্ষেত্রে গোষ্ঠি, জাতি, দেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। তবে আত্মীয়তার ঐক্য ছাড়াও অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য অভিন্ন স্বার্থও ওই পর্যায়ে স্বজনপ্রীতির পেছনে কাজ করতে পারে, আসলে সব পর্যায়েই কাজ করতে পারে। তাই অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে যতটা একক ভাবে জিনের কারণে আত্মীয় নির্বাচন ঘটে, মানুষের ক্ষেত্রে তা ততটা এই একমাত্র কারণে হয়তো ঘটেনা, তবুও এটি যে বড় কারণ তা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্য তারও প্রবল টান থেকে স্পষ্ট।

পারস্পরিক উপকার

আত্মীয়ের বাইরে কি কেউ কখনো কারো উপকার করেনা? হ্যাঁ করে বৈ কি। মানুষের মধ্যে তো বটেই, অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও অনাত্মীয়ের উপকার করতে দেখা যায়, এমনকি যথেষ্ট আত্মত্যাগ করেই সেই উপকারগুলো তারা করে। আমরা এভাবে তাৎক্ষণিক নিজের ক্ষতি স্বীকার করা উপকারগুলোকেই শুধু এ আলোচনায় আনবো। বিভিন্ন প্রাণী সেটি নিজের প্রজাতির অনাত্মীয় কারো জন্য যেমন ভাবে করে অন্য প্রজাতির জন্যও করে। আত্মীয়ের উপকারটি আমরা জিন বিস্তারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু এটিকে ব্যাখ্যা করবো কী ভাবে? এর ব্যাখ্যা আসে উপকারপ্রাপ্ত সদস্য থেকে পরে উপকারটি ফিরে পাওয়ার থেকে।

সমুদ্রে এক রকম বড় মাছ আর ছোট মাছের ব্যাপারটি দেখা যাক। বেশ ক্ষুদ্র কিছু মাছ এক একটি বড় মাছের সঙ্গে সব সময় চলাফেরা করে। বড়মাছ এদেরকে তার মুখের মধ্যে ঢুকে দাঁতমুখ পরিস্কার করতে দেয়। এতে দু'পক্ষেরই লাভ হয়। ছোট মাছ ওই পরিস্কার করতে গিয়ে তার প্রয়োজনীয় খাবারটি পায়, আর বড় মাছের মুখের ভেতরটি এভাবে সব সময় পরিস্কার থাকাতে সেটি তার দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যের জন্য খুবই সুবিধাজনক। পরস্পরিক উপকারের এ কারণটি বোঝা তাই কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের আলোচনার মূল উপকারটি সেটি নয়। প্রায়ই ওই বড় মাছ হাঙ্গরের মত হিংস্র খাদক দিয়ে আক্রান্ত হয়। তখন তার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হলো যত দ্রুত সম্ভব পালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই পালাবার আগে এটি একটু থমকে দাঁড়ায় মুখের

ছোট মাছগুলোকে বের করে দেবার জন্য। বের না করলে পালাবার সময় পেটে ঢুকে গিয়ে ওদের মারা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ছোট মাছের এই উপকার করতে গিয়ে বড় মাছ কিন্তু বেশ ঝুঁকি নেয় পালাতে দেরির কারণে। এই দেরির জন্য হাঙ্গর তাকে ধরেও ফেলে কোন কোন সময়। তা সত্ত্বেও ছোট মাছকে বাঁচাবার এই অভ্যাসটি বিবর্তিত হলো কেন? নানা পরীক্ষণে বিজ্ঞানীরা এর যে জবাব দিচ্ছেন তা হলো আজ যে সে ঝুঁকি নিয়ে হলেও ছোট মাছকে বাঁচালো তার ফলে এই বেঁচে থাকা ছোট মাছগুলো ভবিষ্যতে তার মুখ পরিস্কার রাখার কাজ অব্যাহত রাখবে। আর তা যদি না করে তা হলে এর জন্যই ভবিষ্যতে তার গুরুতর স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। উপকার ফিরে পাবার এই পারিবেশিক সুবিধাটি রয়েছে বলেই ব্যাপারটি বিবর্তিত হয়েছে। এও পারস্পরিক উপকার– তবে এখন যার উপকার করা হচ্ছে যে এই উপকারটি ফিরিয়ে দেবে এখন নয়, ভবিষ্যতে। বড় মাছ যে ভেবেচিন্তে নিজের ভবিষ্যতের খাতিরে এটি করছে তা নয়, পারিবেশিক সুবিধার কারণে বিবর্তন সহজাত ভাবেই এই অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে দিয়েছে। একে বলা হলো পারস্পরিক উপকার তত্ত্ব। এখন উপকার করলে ভবিষ্যতে উপকার ফিরে পাবে– বিবর্তন এটি নিশ্চিত করার বিষয়টিই পারস্পরিক উপকার।

ভ্যাম্পায়ার বাদুড়কে রক্তচোষা বলা হয়। আসলে তাদের খাদ্যই হলো বনের নানা পশুর রক্ত। এতে যে সেই পশুর সব সময় মারাত্মক কোন ক্ষতি হয় তাও কিন্তু নয়। দিন দুয়েক এরকম রক্ত খেতে না পেলে ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের বাঁচা দায় হয়। অথচ এদের প্রত্যেকে প্রতিদিন যে রক্ত খাওয়ার জন্য পশু পাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। সে রকম ক্ষেত্রে এই বাদুড়টি দলের অন্য কোন বাদুড়ের সঙ্গে এমন একটি মিত্রতায় আবদ্ধ হয় যে দ্বিতীয়টি কিছু রক্ত বমি করে তাকে খেতে দেয়। এতে কিছু রক্ত কমে যায় বলে দাতা বাদুড়ের কিছুটা ক্ষতি স্বীকার জড়িত রয়েছে। কিন্তু ওই রক্তটি পাওয়া বাদুড়ের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে যে অন্যকে রক্ত দান করে, তার বিনিময়ে দাতা বাদুড় ওই গ্রহীতা বাদুড় থেকেই নিজের প্রয়োজনে রক্ত পাওয়া আশা করে। দেখা যায় যে এ বাদুড়গুলো তাদের সৃষ্ট বিশেষ রকম শব্দের বিভিন্নতা দিয়ে দলের সবাইকে আলাদা ভাবে চিনতে পারে এবং দাতা-গ্রহীতা পরস্পরকে ঠিক

চিনে রেখে রক্ত পেতে পারে। এ রক্ত দিতে গ্রহীতা অস্বীকার করেছে, বা তার বদলে অন্য কারো কাছে চাইতে হচ্ছে এমন ঘটতে সাধারণত দেখা যায়না। বোঝা যাচ্ছে এখানেও পারস্পরিক উপকারের বিবর্তন-সৃষ্ট সহজাত নিয়মটি কাজ করছে।

পারস্পরিক উপকারটি আর একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে অন্যের মন বোঝার কগনিশন ক্ষমতা আছে এমন প্রাণীতে এসে। মানুষের বাইরে বানর আর এইপের মধ্যে এই ক্ষমতা কিছুটা আছে। ওরা দৃশ্যত ভাষাহীন যোগাযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপকার অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে– যেমন খাবারের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে। সেই উপকার পেলে একরকম স্বীকৃতির আচরণও তাদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায়– যেটি হয়তো দাতাকে উপকার ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে এক রকম আশ্বস্ত করে। মানুষের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কগ্নিশন ক্ষমতা আর ভাষার বিরাট সুবিধা এই ব্যাপারে অনেক কিছু বদলিয়ে দিয়েছে। পারস্পরিক উপকারটি এখানে একটি সহযোগিতা ও সমঝোতার ব্যাপার যেমন হতে পেরেছে, তেমনি আবার ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে অনেকটা বুঝেসুঝেই এই সমঝোতার বরখেলাফ করার সুযোগও মানুষের মধ্যে আছে– যা সহজাত ভাবে পারস্পরিক উপকার করা প্রাণীদের ক্ষেত্রে নেই।

আত্মীয় বেছে উপকার এবং ফিরে পাওয়া যাবে এমন কারো উপকার– নানা প্রাণীর মধ্যে দেখা এই দুটি প্রবণতা মানুষের মধ্যেও আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ কি শুধু এই দুই ক্ষেত্রেই অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ করে? অভিজ্ঞতা কিন্তু তা বলেনা। যদি তাই হতো তা হলে অসংখ্য বাবা-মা নিজেদের সঙ্গে একেবারেই জেনেটিক সম্পর্কহীন শিশুকে দত্তক নিয়ে নিজের সন্তান হিসেবে নিস্বার্থ ভাবে সারা জীবন তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতোনা। অথবা যে বিদেশীর সঙ্গে জীবনে কোনদিন দেখা হবেনা, বা যার থেকে কোন রকম কোন উপকার ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতোনা। এক্ষেত্রেও অনেক সময় প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে মানুষকে দেখা যায়।

বিজ্ঞানীরা এখন মনে করছেন আত্মীয়-নির্বাচন ও পারস্পরিক সুবিধা বিবর্তনে নির্বাচিত হয়ে মানুষের মধ্যে এই দুটি অভ্যাস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি আরো একটি অভ্যাস গড়ে দিয়েছে। এটি হলো 'সজ্ঞানে' অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে তৃপ্তি পাওয়া। এটিও আসলে বিবর্তনের ফলেই সৃষ্ট। ধরা যাক অতীতে আত্মীয়-নির্বাচনের বিবর্তনগত প্রেরণা অনুভব করেও কোন কোন মানুষ অবহেলা বা অন্য কোন কারণে নিজের সন্তানের যত্ন নেয়নি। ওটি তারা করতে পেরেছে ওরকম অবহেলা করার কোন জিনের থাকার কারণে। সেক্ষেত্রে যত্নের অভাবে নিজের সন্তানের জীবন দীর্ঘ না হওয়ার ফলে এই অবহেলার জিন বেশি টেকেনি। যেই জিনটি টিকেছে সেটি হলো সন্তানকে যত্ন করার মূল প্রেরণাটি মস্তিষ্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা 'সজ্ঞানে' বাস্তবায়িত করার। এ ভাবে 'সজ্ঞানে' যত্ন করতে গিয়ে যত্নের আবশ্যকতার উপলব্ধিটি এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে তা অন্য অনাত্মীয় শিশুকে যত্ন করার মধ্যে বিস্তৃত হতে পেরেছে। ব্যাপারটি আগাগোড়া অন্ধ ভাবে অর্থাৎ সহজাত ভাবে হলে এমনটি হতে পারতোনা, যেমন অন্য প্রাণীতে সচরাচর হয়না। বিবর্তন এখানে এক অদ্ভুত কাজ করেছে। আমরা দেখেছি জিন মাত্রেরই বিস্তারকামী অর্থাৎ 'স্বার্থপর' হওয়ার কথা। অথচ এখানে ওই স্বার্থপর জিনই মানুষকে স্বার্থহীন ভাবে পরোপকার করতে শিখিয়েছে।

লক্ষ বছর ধরে সেই ভয়, সেই সুখ

আবেগ কেন?

হঠাৎ এমন কিছু ঘটলো যে মনের সাধারণ অবস্থা ছাড়িয়ে একটি অনুভূতি অতি তীব্র হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে শরীরেরও অনেক কাজ যেন উল্‌টা পাল্‌টা হয়ে গেল, যেমন হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। আরো কিছু পরিবর্তন এলো চোখেমুখে এবং আচরণেও, অনেকটা অস্বাভাবিক ভাবে ফুটে ওঠলো সেগুলো। একেই আমরা আবেগ বলি। সাধারণভাবে সব আবেগে এমনই হয় বটে, কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো এক এক আবেগের জন্য ভিন্ন ভাবে হয়। বাইরে থেকে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে কোন্ আবেগে মানুষটির এমনটি হয়েছে– একি ভয়, নাকি বিতৃষ্ণা, নাকি ভালবাসা? এগুলো সহ এরকম কিছু আবেগ অন্যগুলোর থেকে একেবারে আলাদা, একেবারে মৌলিক; এর মধ্যে আরো আছে দু:খ, উদ্বেগ, ঘৃণা, গর্ব, বিস্ময়, লজ্জা, অপরাধ-বোধ ইত্যাদি। এদের একটির সঙ্গে আরেকটি জড়িয়ে আবার কিছু কিছু মিশ্র আবেগও সৃষ্টি হয়। ধরা যাক্ প্রথম চাকরি পেয়েছি, সে চাকরিতে আমার প্রথম দিন। আমি আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছি। সেটি কী রকম আবেগ? খুব সম্ভব সুখ, উত্তেজনা আর ভয়ের একটি মিশ্র আবেগ।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে কোন আবেগই সাধারণ আটপৌরে জিনিস নয়। যেমন হঠাৎ কোন কিছুতে ভয় পেলে বুকটি ধক্ করে উঠলো, হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো, সারা গায়ে প্রচুর ঘাম হতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে চোখেমুখে ভেসে উঠলো ভয়ের চিহ্ন। এতক্ষণ গতানুগতিক যা করা হচ্ছিল তা মুহূর্তে থেমে যেতে পারে, এমন কি দ্রুত ওখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও হতে পারে। এগুলোর কোনটিই অহরহ হবার জিনিস নয়। অবশ্য সব সময় এটি বড় রকমের ভয় হবে এমন কথা নয়, আবেগেরও কমবেশি হয়। আবার একই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সবার আবেগের তীব্রতা একই মাত্রার নাও হতে পারে– প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু প্রবণতা থাকে মাত্রা কতখানি হবে। বড় প্রশ্নটি

হলো এরকম একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার দেহমন জুড়ে হতে যাবে কেন? এর একটি সরল উত্তর হতে পারে যে ঘটনা থেকে আবেগটির উৎপত্তি তার একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবেই এটি আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট উপকার পাওয়া যায়, যেমন ভয় পেলে দ্রুত সরে যাওয়াতে ভয়ের কারণটি থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে উপকারটি স্পষ্ট নয়। উদাহরণ স্বরূপ যে কারণ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা নেই তা জানার ও বোঝার পরও মানুষ অনেক সময় ভয় পায়। সিনেমায় শোকাবহ কিছু দেখলে ওটি যে নেহাৎ সিনেমা তা জানা সত্ত্বেও দু:খের আবেগের সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে। আবেগের পুরো ব্যাপারটিই বেশ জটিল।

এই যে আবেগের জটিল হওয়া, এতে কার্য কারণের সম্পর্ক সব সময় না থাকা, এ সবই দেখিয়ে দেয় যে আবেগের ব্যাপারগুলো সদ্য টাটকা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নতুন করে মাথায় সৃষ্টি হচ্ছেনা বরং সেগুলোর মূল উৎস আমাদের বিবর্তনজাত প্রাচীন মস্তিষ্কে। সরল প্রকৃতির জিনিস তা দৈহিক হোক বা মানসিক হোক, সরাসরি বিবর্তনে সৃষ্টি না হয়ে অন্য কোন কিছুর উপজাত হিসেবেও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন আগে দেখেছি হাড় যে সাদা সেটি বিবর্তনে হয়নি, কিন্তু হাড় যে ক্যালসিয়ামে তৈরি সেটি বিবর্তনে হয়েছে। ক্যালসিয়াম সাদা বলেই হাঁড়ও সাদা। কিন্তু জটিল জিনিস মাত্রই বিবর্তনের মাধ্যমেই ধাপে ধাপে সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক, যেমন চোখের মত জটিল জিনিস অবশ্যই বিবর্তনজাত।

তাছাড়া অনেক আবেগই মানুষের একচেটিয়া নয়। শিম্পাঞ্জি, গরিলা ইত্যাদি মানুষের সদৃশ প্রাণীদের মধ্যে এর অনেকগুলোই আছে, অন্য প্রাণীর মধ্যেও কমবেশি আছে। যেমন কুকুর-বেড়ালের মধ্যেও ভয়, আনন্দ, দুঃখ, রাগ ইত্যাদির অভিব্যক্তি দেখা যায়। আবেগ যে বিবর্তনের সৃষ্টি ওটিও তার একটি লক্ষণ। সদৃশ নানা প্রাণীর মধ্যে যা থাকে, একই প্রাণীর সবার মধ্যে যা থাকে, তা বিবর্তনে সৃষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এদের সবার মধ্যে একই আদি জিন বিস্তার ঘটেছে। নৃবিজ্ঞানীদের আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে নানা কালচারের মানুষের অনেক আচার অনুষ্ঠান একেবারে আলাদা হলেও মৌলিক আবেগ-গুলো সব মানুষের মধ্যে এক। তারা হয়তো নিজের

ভাষায় একে অন্য কিছু বলে আখ্যায়িত করে, কিন্তু অন্তরঙ্গ হয়ে আবেগগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় আসলে এগুলো সবার ক্ষেত্রে এক। আবেগের এই সর্বজনীনতাও দেখিয়ে দিচ্ছে যে এটি সুদূর অতীতে বিবর্তনের কালে বেঁচে থাকার সুবিধার কারণে সৃষ্টি হয়েছিলো। এর কোন কোনটি সৃষ্টি হয়েছিলো শিকারি-সংগ্রাহক আদি মানুষের মধ্যে, কিছু কিছু তারো পূর্বসূরি অন্য আদি প্রাণীদের মধ্যে, যাদের থেকে আজকের সব মানুষ এই আবেগ পেয়েছে; আজকের অন্য কিছু প্রাণীও সেটি পেয়েছে।

এক একটি আবেগের থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে কী সুবিধা ওরা তখন পেয়েছিলো সেটি আমরা নানা পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে আন্দাজ করতে পারি। এই কাজে বিভিন্ন আবেগকে বিভিন্ন ভাবে বিবেচনা করতে হবে কারণ বিস্তারিত বিষয়ে গিয়ে প্রত্যেকটির জন্য আলাদা রকমের সুবিধা পাওয়ার কথা। উদাহরণ স্বরূপ ভয়ের আবেগের থেকে যে ধরনের সুবিধা সেদিন পাওয়ার কথা, সুখের আবেগের থেকে একই রকম সুবিধা পাওয়ার কথা নয়। কাজেই আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত আবেগগুলোকে কয়েকটি দলে ভাগ করে ফেলে আলাদা ভাবে বিবেচনা করতে হবে। তবে তার আগে বিভিন্ন আবেগ কোন্ কোন্ পথে কাজ করে বেশিদিন বাঁচার ও বেশি সন্তান দেয়ার (বিবর্তনে যা প্রয়োজন) সুবিধা করে দিতে পারে সেটি এক নজরে দেখা যায়, কারণ সব আবেগের ক্ষেত্রেই কমবেশি এই পথেই সুবিধাগুলো আসে।

প্রথমেই দেখা যাক আবেগ কীভাবে প্রণোদনা দেবার কাজ করে। ভয় পাওয়ার আবেগটি ভয়ের কারণটির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রণোদনা দেয়। ভয় পাওয়াটাই তার মধ্যে রক্ষা পাওয়ার এমন সব প্রেরণা সৃষ্টি করে ভয় না পেলে যা এত প্রবল ভাবে হতোনা। অন্য দিকে সুখ উপভোগের যে প্রণোদনা তা সুখ স্থায়ী করার জন্য সঠিক কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এরকম প্রায় প্রত্যেকটি আবেগে দেখা যায় এটি এমন কোন না কোন লক্ষ্যে যেতে প্রেরণা দেয় যা বেঁচে থাকার সহায়ক হয়েছে। এমনিতে যতখানি গরজের সঙ্গে সে ওই লক্ষ্যের দিকে কেউ এগোতো আবেগে আপ্লুত হলে তার চেয়ে অনেক বেশি সংকল্পবদ্ধ হয়ে সে লক্ষ্যের দিকে এগোবে। আর যেহেতু লক্ষ্যগুলো সাধারণত বেশি বাঁচার জন্য সুবিধাজনক ছিল তাই এতে প্রণোদনা

দানকারী হিসেবে এক একটি আবেগের পক্ষে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব হয়েছিলো।

তারপর আসে মানুষে মানুষে যোগাযোগ প্রসঙ্গ। ভাষা আয়ত্ব হবার আগে তো বটেই এমনকি ভাষা আসার পরেও চট্ করে এই যোগাযোগের একটি বড় মাধ্যম হতে পারে আবেগ। আবেগে আপ্লুত যে কারো দিকে তাকানো মাত্রই অন্যরা তার অবস্থা অনেকখানি অনুমান করতে পারে, এবং এটি বিবর্তনের কালে টিকে থাকার জন্য সুবিধাজনক হবার কথা। বিশেষ করে জরুরী অবস্থাতে আবেগের চেয়ে ভাল যোগাযোগ আর কী হতে পারে? যোগাযোগে ভুল হওয়াটা অনেক সময় ভুল বার্তা দিয়ে জীবনের জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারতো, আবেগ সেই সম্ভাবনাকে অনেক কমিয়ে দেয়। একজন ভীত মানুষ বা ভীত যে কোন প্রাণী সহজে অন্যের সহায়তা লাভ করতে পারে। তেমনি রাগের আবেগ অন্যদেরকে সংযত করে দিতে পারে, তাতে সমস্যার সমাধান সহজতর ভাবে হতে পারে– নিজের জন্যও ক্ষতিকর শারীরিক সংঘাতে না জড়িয়ে।

যোগাযোগটি মানুষের ক্ষেত্রে অনেক সময় আরো গভীরতর স্তরে পৌঁছতে পারে। সেক্ষেত্রে আবেগের মাধ্যমে এমন কিছু চোখেমুখে ফুটে ওঠে যাতে অন্য মানুষ তার মনের ভেতরের কথা আন্দাজ করতে পারে। এটি সেই কগ্‌নিশন– অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা, যা সব পরিস্থিতিতে সহজ হয়না। কিন্তু যে মানুষ ভয় পেয়েছে, কিংবা সুখে টগবগ করছে, কিংবা যার মধ্যে স্পষ্ট বিতৃষ্ণা বা রাগ দেখা যাচ্ছে তাকে বোঝা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ। এতে বিবর্তনের কালে আবেগ আপ্লুত মানুষের টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে থাকবে। বিশেষ করে ছোট ছোট দলে ভ্রমণকারী সেদিনের শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের পরস্পরের মধ্যে ভাল বোঝাপড়া ছাড়া বেঁচে থাকাটি খুব কঠিন ছিল। একটি পর্যায় পর্যন্ত ভাষার অভাব সে কাজকে আরো কঠিন করে রেখেছিলো। সে ক্ষেত্রে আবেগে প্রকাশ যারা করতে পেরেছে জীবন সংগ্রামে তারা সুবিধা পেয়েছে বৈকি। বিশেষ করে পারস্পরিক উপকারের যে ব্যাপারটি আমরা দেখেছি তাতে আবেগের সৃষ্ট এই কগ্‌নিশনটি খুব জরুরী–

উপকারের প্রয়োজন বুঝতে এবং ফিরতি উপকার পেতে আস্থার ভাব আনতে।

এগুলো অবশ্য সাধারণভাবে প্রায় সব আবেগে বিবর্তনের সুবিধা কোন্ কোন্ দিক থেকে আসতে পেরেছিলো তার অনুমান। বিভিন্ন ধরনের আবেগ একটির থেকে অন্যটি এত আলাদা যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রত্যেকটির জন্য বিবর্তনের সুবিধার ধরন আলাদা ভাবে নির্ণয় করতে হয়েছে, প্রত্যেকটি জন্য কিছুটা আলাদা আলাদা তত্ত্বও খাড়া করতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এ কাজ যথেষ্ট এগিয়ে গেছে, অনেক ক্ষেত্রে এখনো বাকি। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ও এই তত্ত্ব খুব জরুরী। একমাত্র তখনই আবেগের মত জটিল বিষয়গুলোর ওপর আমাদের সত্যিকার বৈজ্ঞানিক দখল আসতে পারবে। আজকের জটিলতর জীবনে কিছু কিছু আবেগের যে মানসিক রোগে পরিণত হবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে তার কারণ নির্ণয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে এর উপশমেরও একটি সুরাহা হতে পারে। যে ওষুধ এরকম মানসিক রোগের জন্য আজকাল ব্যবহার হচ্ছে সেগুলো কতটা সঙ্গত, কতটা নিজেরাই ক্ষতিকর তা নির্ণয়ের জন্যও এটি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বহুল ব্যবহৃত উদ্বেগ দমনকারী বা বিষণ্নতা দমনকারী ওষুধ (এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট) সম্পর্কে এমন সমালোচনা রয়েছে। সাধারণভাবে যেটি বোঝা যাচ্ছে তা হলো বিবর্তনের কলে এক একটি আবেগ টিকে থাকার সুবিধা পেয়ে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়েছিল, আর তারই ফলশ্রুতিতে তা মস্তিষ্ক গড়নে অঙ্গীভূত হয়েছে। আমাদের 'প্রাচীন' মস্তিষ্ক তাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই আবেগ সৃষ্টির উপযুক্ত করে গড়া।

আবেগ সৃষ্টির মূল ব্যাপারটি মস্তিষ্কের এমিগডালা ও হাইপোথেলমাস নামের দুটি অংশের কাজ, যেগুলো মস্তিষ্কের হেড-কোয়ার্টার নামে পরিচিত যে কোর্টেক্স তার বাইরে। ওই দুই অংশ থেকে আবেগের সিগন্যাল সরাসরি হরমোন নি:সরণ অংশে চলে যায়; অথচ অন্যান্য ধরনের সিগন্যালগুলো সাধারণত এখান থেকে সেই হেড-কোয়ার্টার কোর্টেক্সেই যায়। হরমোনের কারণে আবেগের সেই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো দেখা দেয়– হৃৎস্পন্দন বাড়া, রক্তচাপ বাড়া, মুখমণ্ডলের পেশিতে টান-কুঞ্চন দেখা দেয়া ইত্যাদি। তাই আবেগের ফলশ্রুতি হলো মস্তিষ্কের উচ্চতর মহলের কোন বিবেচনা হতে

পারার আগেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসব শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হওয়া। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আবেগের খবরটি কোর্টেক্সেও যায়, তবে তা আবেগের রঙে রাঙানো অবস্থায়, একেবারে স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। তখন একটি বিবেচিত কিন্তু ব্যতিক্রমী, কখনো বা নাটকীয় কর্ম-পদক্ষেপ সৃষ্টি হতে পারে– যেমন খুশির কারণে উৎফুল্লতা, অনুরাগের কারণে ঘনিষ্ঠতা, বিরাগের কারণে এড়িয়ে চলা, ভয়ের কারণে পলায়ন কিংবা যুদ্ধ।

মস্তিষ্কের এই আচরণের ফলে আবেগের সৃষ্টি ও এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে একমত হয়েও আবেগ যে বিবর্তনের সৃষ্টি একথা কেউ কেউ মেনে নিতে চান্না। তাঁরা আজকের আবেগের সঙ্গে প্রাচীন আবেগের সম্পর্ক দেখেনেনা, বরং মনে করেন এগুলো আমাদের মস্তিষ্ক উপস্থিত মত নিজেই এক একটি ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রকাশ করে– যার ওপর স্থানীয় কালচারের প্রভাব অনেকখানি। এর পেছনে বড় যুক্তি হিসেবে তাঁরা দেখাবার চেষ্টা করেন যে এক এক কালচারে আবেগের অভিব্যক্তি এক এক রকম, এটি সর্বজনীন নয়। তাঁদের মতে এমন সব ছোট ছোট সমাজ রয়েছে যাদের কোন কোন আবেগ অনুভবের ও প্রকাশের অভ্যাস অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। এর জন্য তাঁরা ওই সমাজগুলোর ভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করতে বলেন। যেমন কোন সমাজের ভাষায় একটি আবেগের জন্য কোন শব্দই নেই। এর থেকে তাঁরা ধরে নেন যে তাদের মধ্যে ওই আবেগটিই নেই। অথবা এরকম সমাজের মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখা গেছে যে রাগের অভিব্যক্তিকে তারা প্রকাশ করছে 'ব্যথা' হিসেবে, অথবা এমনি অন্য কিছু হিসেবে। আসলে একটি অপরিচিত কালচারে কোন আবেগের জন্য বিশেষ কোন শব্দ আদৌ আছে কি নেই সে ব্যাপারটি নির্ণয় করা সহজ নয়। এটি ওদের ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতার জন্য হতে পারে, আবার যে দোভাষীর ওপর নির্ভর করে গবেষক এটি বোঝার চেষ্টা করছেন তাঁর সীমাবদ্ধতার কারণেও হতে পারে।

অনেক সময় কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার রীতিতে একটি আবেগকে যেভাবে প্রকাশ করা হয় তাতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে আবেগটি বুঝি তাদের মধ্যে অন্যভাবে আছে; কিন্তু আসলে তা মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যেমন উদাহরণ স্বরূপ চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার দিকে তাকাই যা

অনেকাংশে বাংলা থেকে ভিন্ন। বহুদিন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা না হবার ফলে মন খুব খারাপ হলে এ ভাষায় বলা হয় 'তার জন্য আমার পেট পুড়ছে' (বাংলা রূপান্তরে)। এ কথা শুনে নিশ্চয়ই কারো মনে হয়না যে চট্টগ্রামের মানুষের এই বিরহে মন খারাপ হবার আবেগটি পেটের জ্বালা-যন্ত্রণা হিসেবে দেখা দেয়। সবাই বরং ধরে নেন যে এটি চাটগেঁয়ে ভাষার একটি বাগ্‌ধারা মাত্র। তা হলে কেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ তাহিতির কোন মহিলা যখন তাঁর ভাষায় বলেন 'আমার স্বামী মারা গেছে, তাই আমার বমি পাচ্ছে'– সেটি থেকে কেন চট্ করে মনে করতে যাব শোকের আবেগ এক এক কালচারে এক এক রকম। আসলে গভীরতর গবেষণায় দেখা গেছে যে তাহিতির মানুষের শোক, আমাদের শোক এবং দুনিয়ার অন্য সব মানুষের শোকের আবেগ একই রকম। যা অভিন্ন নাও হতে পারে তা হলো সেটি ভাষায় প্রকাশ এবং এ নিয়ে বাইরের আচার অনুষ্ঠান।

অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দূরবর্তী কালচারের গবেষণায় তথ্য সংগ্রহকারী যে ভুল বুঝেছেন তার ভুরিভুরি উদাহরণ আছে। যেমন উত্তর মেরু অঞ্চলের একটি সমাজ উট্‌কো ইনুইটদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে রাগের আবেগটি নেই। কিন্তু একটু ভাল করে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন কথাটি যেখান থেকেই চালু হোক এটি সত্য নয়। যেটি হয়না তাহলো ওরা বাইরের মানুষের সামনে নিজেদের মধ্যেকার রাগ প্রকাশ করেনা। কিন্তু ইউরোপীয় আগন্তুকরা যখন রাগ করে তারা ঠিক তা বুঝতে পারে, নিজেদের স্লেজ গাড়ি টানা কুকুরগুলোকে যখন প্রশিক্ষণ দেয় তখন ঠিকই প্রয়োজনে রেগে মেগে তাদেরকে শাসন করে, এমনকি নিজেদের শিশুদেরকে শারীরিক শাস্তি দেয়। আমরা আগেই দেখেছি নৃ-বিজ্ঞানী মার্গারেট মীড প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ সামোয়ানদের মধ্যে অনেকগুলো আবেগের অস্তিত্ব নেই বলে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে কেউ কারো ওপর রাগতে দেখেননি, কারো কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে প্রতিহিংসাপরায়ন হতে দেখেননি, তেমন স্থায়ী কোন ভালবাসা বা শোকও দেখেননি– ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী নৃ-বিজ্ঞানীরা গভীরতর অনুসন্ধানে এর ঠিক উল্‌টোটাই দেখতে পেয়েছেন। এর

একটি ব্যাখ্যা হলো এ সমাজে বহিরাগতদের সামনে এসব আবেগ প্রকাশের রীতি নেই।

একেবারে উন্নত দুটি কালচারের তুলনামূলক পরীক্ষায় সাম্প্রতিক কালেও এমনটি দেখা গেছে। এক পরীক্ষায় গবেষকরা কিছু আমেরিকান ও জাপানী ছাত্রদের সঙ্গে এক সঙ্গে সিনেমার কিছু বীভৎস দৃশ্য দেখেছে এবং ওসময় তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কথা বলার সময় আমেরিকান ছাত্রদের চোখে মুখে ওই বীভৎস দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠছিলো। কিন্তু জাপানী ছাত্ররা খুব স্বাভাবিক ভাবে ভদ্রতা বজায় রেখে মৃদু হেসে কথা বলছিলো। পরে একই সিনেমা গবেষকদের অনুপস্থিতিতে এ দুদল ছাত্রকে নীরবে দেখতে দেয়া হলো এবং গোপনে তাদের মুখের অবস্থার ভিডিয়ো করা হলো, এবার কিন্তু আমেরিকান ও জাপানী উভয় ছাত্রের মুখে বীভৎস দৃশ্য দেখার আতঙ্ক ও বিতৃষ্ণা একই ভাবে ফুটে উঠতে দেখা গেলো। স্পষ্টত অন্যের সামনে নিজেদের কোন কোন আবেগ প্রকাশের অভ্যাস আমেরিকান ও জাপানীর এক নয়, কিন্তু উভয়ের আবেগ একই।

কাজেই নৃ-বিজ্ঞানের সাক্ষ্যগুলো আবেগের সর্বজনীনতা প্রমাণের ক্ষেত্রে এখন আর বাধা নয়। একই আবেগ যে মানুষ কখনো কখনো অদ্ভুত ভিন্নভাবে প্রকাশ করে একেও কেউ কেউ আবেগের তাৎক্ষণিক উৎসের প্রমাণ হিসেবে দেখান।যেমন অতিরিক্ত সুখের আবেগে অনেকে কেঁদে ফেলেন। এরকম ঘটনা দেখিয়ে তাঁরা বলেন আবেগ যদি বিবর্তনের নিয়ম মাফিক হতো তা হলে এই অদ্ভুত বৈচিত্র দেখা দিতনা। হাসার পরিস্থিতিতে কেঁদে ফেললে তো বিবর্তনের উদ্দেশ্যই সাধিত হতোনা। কিন্তু বিশেষ বিভিন্ন পরিস্থিতি, আবেগগ্রস্ত মানুষটির প্রবণতা ইত্যাদির কারণে আবেগের তীব্রতা এমনকি এর প্রকাশের বৈচিত্র সৃষ্টি করতে পারলেও এর মূল উৎসটি কিন্তু বিবর্তন। আমরা পরে দেখবো যে বিবর্তনের কালের জরুরী কোন আবেগ আজকের জটিলতর পরিবেশে ভিন্ন ফলাফল দিচ্ছে। ওই অতি সুখে কেঁদে ফেলার ব্যাপারটিও পরিস্থিতির কারণে এমনি একটি ব্যতিক্রম। তাছাড়া আমাদের প্রত্যেকটি আবেগ যে একেবারে বিশুদ্ধ মৌলিক রূপ নিয়ে দেখা দেয় তা কিন্তু নয়। রাগের সঙ্গে ভালবাসা, খুশির সঙ্গে ভয় এমন মিশ্র আবেগ বিরল নয়। অনেক

সময় সুখের সময় দু:খের দিনের কথা ভেবে কান্না চলে আসা এমনি মিশ্র আবেগের ব্যাপারও হতে পারে। কিন্তু আজকের এই মিশ্র আবেগের মধ্যে অবিমিশ্র সুখ, আর অবিমিশ্র দু:খ দুটিই কিন্তু সেই প্রাচীনকালে বিবর্তনের সুবিধার কারণে সৃষ্টি হয়ে এসছে এমন হতে কোন সমস্যা নেই।

সেদিনের ভয় থেকে আজকের ভয়

আমাদের অনেক রকম ভয়গুলোর পেছনে প্রায়ই অতীত মানুষের ভয়ের রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলো যে ভয়ের জিনিস তা নিয়ে কেউ আমাদেরকে সাবধান করেনি, এগুলো এড়াবার জন্য কেউ প্রশিক্ষণ দেয়নি। ভয়গুলো আমাদের মজ্জাগত, কারণ এগুলো বিবর্তনের সৃষ্টি। এমনকি আজ আর মোটেও ভয়ের ব্যাপার নয় এমন জিনিসও সেই মজ্জাগত ভয়ের মত একই ইঙ্গিত দিয়ে আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দেয়।বহুতলা ভবনের অনেক উঁচু তলার নিরাপদ ঘের দেয়া বারান্দা থেকে পড়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই– তবুও সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালে আমাদের ভয় লাগে, অনেক সময় তাকোতেও চাইনা। এই ভয়ের উৎস আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে উঁচু পাহাড়ের ভয় থেকে– বিশেষ করে পাহাড়ের কিনারার, হরিণের পিছু ধাওয়া করে ওখানে গিয়ে ভয় পেয়ে তাদের মধ্যে যারা থমকে দাঁড়িয়েছিলো এবং বেঁচে গিয়েছিলো, তাদের থেকে। আর এই ব্যাপারে বহুল ব্যবহৃত উদাহরণটি হলো সাপের ভয়; সাপতো বটে সাপের মত লিকলিকে যে কোন কিছুর ভয়। হয়তো বাংলাদেশের পাড়াগাঁয়ে এই ভয় অমূলক নয়। কিন্তু নিউয়র্কের শত তলা ভবনের মধ্যে জীবন কাটছে, কোনদিন সাপের গল্পও যে শোনেনি সেও ঠিক একই ভাবে সাপকে দেখলে বা এর মত যে কোন কিছুকে দেখলে ভয় পায়। সহজাত ভয়ের এরকম সর্বজনীনতা প্রমাণ করে এগুলো বিবর্তনের কালে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হয়েছিলো বলেই আমাদের মধ্যে এসেছে। যে ভয় পেয়েছে সেই বেশি বংশধর রেখে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, সেই বংশধরদের মধ্যেও তার ওই ভয়ের জিন ছিল এবং পরবর্তী সব প্রজন্মে উত্তরসূরিদের মধ্যে মস্তিষ্কের স্নায়ু বর্তনীতে এগুলো তখন থেকে গাঁথা হয়ে গিয়েছিলো।

ফলে এখনো আমরা ভয়ের সেই প্রাচীন কারণটির ইশারা মাত্র পেলেই ভয় পাচ্ছি; এমনকি সেই কারণটি আজকের যুগে সত্যিকার কোন ক্ষতি না করলেও। ভয়ের ফলশ্রুতি হিসেবে ওরা যা করতো আমাদেরও তেমনটি কাজ করার প্রবৃত্তি হয়, সত্যি সত্যি করি বা না করি। সেটি এক এক ভয়ের ক্ষেত্রে এক এক রকম। যদি উচ্চতার ভয়ে হয়, যেমন পাহাড়ের কিনারায়, তখন কাজটি হতো থমকে দাঁড়িয়ে একেবারে পাথরের মত স্থির হয়ে যাওয়া। আজও বহুতল ভবনে বারান্দায় গিয়ে নিচের দিকে তাকালে আমরাও জমে স্থির হয়ে যাই। সেদিন হিংস্র প্রাণীর অস্তিত্ব টের পেলে ভয় পেয়ে ওরা উল্‌টো দিকে দৌড় দিতো, আমরাও তাই করি। আজ এমন অভিজ্ঞতা আমাদের সচরাচর না ঘটলেও ওই কাজগুলোই ওদেরকে প্রায়শ প্রাণে বাঁচিয়ে দিতো।

ভয়ের আবেগ যে বিবর্তনের সৃষ্টি তার আরো ভাল প্রমাণ হলো অন্যান্য প্রাণীতে তার কার্যকারণ লক্ষ্য করে। চিড়িয়াখানায় জন্ম থেকে বড় হয়েছে এমন শিম্পাঞ্জিও জীবনের প্রথমবারের মত সাপ দেখে ভয়ার্তভাবে চেঁচামেচি, লাফালাফি করার প্রমাণ গবেষকরা বার বার পেয়েছেন। ল্যাবোরেটরিতে বিরল বানর টামারিন প্রজনন করান এমন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন মেঝেতে একটি রাবারের টিউব পড়ে থাকতে দেখলেই শিশু টামারিনরাও দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে– খুব সম্ভব টিউবটিকে সাপ মনে করে। অতীতে আফ্রিকার মরিশাস দ্বীপে কোন হিংস্র প্রাণী ছিলনা যা ওখানকার উড়তে-অক্ষম পাখি ডোডোর কোন ক্ষতি করতে পারতো। এদিক থেকে শত ভাগ নিরাপদ পরিবেশে ওখানে বিবর্তিত হওয়ায় হিংস্র প্রাণীর কোন ভয় ডোডোর মস্তিষ্কে স্থান পায়নি। শ-পাঁচেক বছর আগে ইউরোপ ও অন্যান্য জায়গা থেকে অভিবাসীরা যখন এই দ্বীপে প্রথম আসে তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো কুকুর এবং অন্যান্য কিছু প্রাণী যেগুলো ডোডোকে আক্রমণ করতো। এদেরকে কোন ভাবে ভয় করার প্রবৃত্তি ডোডোর ছিলনা, কারণ তার মস্তিষ্কেই এই ভয়টি ছিলনা। ফলে আত্মরক্ষার কোন চেষ্টার অভাবে ডোডো দলে দলে অসহায় ভাবে মারা পড়েছে এবং এখন থেকে শ'তিনেক বছর আগে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মরিশাসের বাইরে ডোডো কোথাও ছিলনা বলে এটি এখন

সারা পৃথিবীতেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত প্রাণী। এমন উদাহরণ চমৎকার ভাবে প্রমাণ করে যে সহজাত ভয়গুলো নতুন করে জন্মানো কঠিন, যদি না তা বিবর্তনের কাল থেকে মস্তিষ্কে থাকে।

আমরাও এমন নতুন ভয়গুলো সহজে আত্মস্ত করতে পারিনা– বিবর্তনের কালে যেগুলো ছিলনা। যে রকম দ্রুতগামী গাড়িতে ভর্তি বিপজ্জনক রাস্তা পার হতে গিয়ে আমরা ভয় পাই বটে কিন্তু তার জন্য অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছে। শিশুরা সহজে এ ভয় পায়না, একেবারে পাড়া-গাঁ থেকে প্রথম শহরে আসা মানুষও এ ভয় যথেষ্ট পায়না– কারণ তাদের অভিজ্ঞতা নেই, প্রশিক্ষণ নেই। বিদ্যুতের খোলা সকেটে হাত দেয়া, কিংবা রেল-লাইনের ওপর দিয়ে হাঁটা যে বিপজ্জনক কাজ এটি সবাইকে বোঝাতে সময় লাগে। কারণ এসব আধুনিক ও সাম্প্রতিক ব্যাপার; বিবর্তনের কালে না থাকায় এগুলো সহজাত ভাবে আমাদের মধ্যে নেই। সহজাত ভয় আর অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা থেকে জানা ভয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সহজাত ভয়ের জন্য শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়না, আমাদের মস্তিষ্কই এই ভয় ধারণ করে আছে জন্মগত ভাবে।

সহজাত নানা ভয়গুলোকে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নানা দলে ভাগ করা যায়। যে সব জিনিস অতীতে আমাদের পূর্বসূরিদের বাঁচার জন্য ক্ষতিকর হয়েছে সেগুলোর ভয়ই আমাদের কাছে এসেছে। এর মধ্যে অন্ধকার, ঝড়, বড় গভীর জলাশয়, উঁচু পাহাড়ের কিনারা, সংকীর্ণ জায়গায় আবদ্ধতা ইত্যাদি ভৌগলিক বিষয় ভয়ের কারণ হয়েছে। আবার হিংস্র অথবা বিষময় প্রাণী, অনেক রক্তপাত ইত্যাদি শিকারি-সংগ্রাহক মানুষের নিত্য ভয়ের জিনিস ছিল, অপরিচিত মানুষকেও ভয় করার কারণ ছিল। বিশ-ত্রিশ জনের ছোট ছোট দলে চলা এই যাযাবর মানুষরা হয়তো মাসের পর মাস অন্য কোন দলের সাক্ষাত পেতোনা। স্বাভাবিক ভাবে ওরকম ছোট দলেই ওরা স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো, শত শত মানুষ জড়ো হলে তাদের ভয় করতো– বেশি মানুষের ভীড়ে অনেক অঘটন, অনেক ক্ষতির কারণ হতে পারতো। একটু ভাবলে দেখা যায় আজো এগুলোই আমাদের সহজাত ভয়– অন্ধকার, সাপ, বাঘ, উচ্চতা, গভীর পানি, বদ্ধ জায়গা, শত শত অপরিচিত মানুষের ভীড়–

এইসব। এই সব কিছুতেই সেই প্রাচীন ভয়ের রেশগুলো রয়ে গেছে। অন্য রকম আরেক ভয় ওদের ছিল বিশাল প্রান্তরে একা হয়ে যাওয়া– এটা তাদের জন্য মারাত্মক হতে পারতো যে কোন সময় সেখানে দেখা দিতে পারতো ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী। আমাদের জন্য মারাত্মক নাও যদি হয়, এ ভয় আমাদেরো আছে– তাই একাকী বিশাল জায়গায় গা-ছম ছম ভয় করে আমাদের।

এ সব হলো প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা বিষয়ে ভয়; এর থেকে ভিন্ন রকমের ভয় হলো সামাজিক ভয়– যার সঙ্গে সম্পর্ক অন্য মানুষদের। এর মধ্যে আছে লোকলজ্জা, সমালোচনা, অপমান ইত্যাদি থেকে ভয়। সাধারণভাবে মনে হতে পারে এ ধরনের বিষয়গুলো বাঁচা-মরার ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ হতে যাবে কেন? কিন্তু যদি মানুষের ওই বিশ-ত্রিশ জনের ছোট ছোট দলগুলোর নিজেদের মধ্যে গভীর সহযোগিতার ভিত্তিতে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকার কথা চিন্তা করি তা হলে ওই দলের মধ্যে যে কোন বিরূপ ও অপমান-জনক পরিস্থিতি যে কাউকে একেবারে বিকল করে দিতে যথেষ্ট ছিল– কাজেই এরকম পরিস্থিতির ভীতিই একমাত্র তাকে সে অবস্থা এড়াতে সাহায্য করতে পারতো। আজ অধিকাংশ মানুষের জন্য ব্যাপারটি আর সে রকম নেই– তাদের জন্য লোকলজ্জা জীবন-মরণের প্রশ্ন হয়না। কিন্তু সেই ভীতিটি কিন্তু সবার মনেই রয়ে গেছে এবং তা আজকের দিনে অন্যান্য নানা রূপ লাভ করেছে। যেমন হল ভর্তি মানুষের দৃষ্টির সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে বাক-পটু মানুষকেও দেখা যায় এক রকম একটি ভীতির সম্মূখীন হতে যাকে আমরা বলি মঞ্চভীতি। বিবর্তন কালের টিকে যাওয়া সামাজিক ভীতির মধ্যেই খুব সম্ভব এগুলোর উৎস নিহিত রয়েছে।

বিবর্তনের কালে মানুষ এই সব কিছুতে ভয় পেয়েছে বটে কিন্তু সে জন্য এর সবকিছু বাদ দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার সুযোগ তাদের ছিলনা। জীবনের তাগিদেই তাদেরকে ভয়কে বেশ কিছুটা জয় করতে হয়েছিলো। তাই উচ্চতার ভয় সত্ত্বেও তাকে হরিণকে ধাওয়া করে পাহাড়ে উঠতে হয়েছে, পানির ভয় সত্ত্বেও নদীতে নেমে মাছ ধরতে হয়েছে, ঝড়ের ভয় সত্ত্বেও ফলমূল সংগ্রহে বের হতে হয়েছে। এর অনেকটা তারা করতে পেরেছে

অন্যদেরকে ভয়কে কিছুটা অগ্রাহ্য করেও বাঁচতে দেখে। এভাবে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভয়কে কিছুটা অগ্রাহ্য করতে পারাটাও বিবর্তনের অংশ হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের মধ্যে ভয় পাওয়ার জিন যেরকম আছে ভয়কে অগ্রাহ্য করার জিনও তেমনি আছে। এখন আমরা দেখছি সহজাত ভয়গুলোতে শিশুরাই বেশী ভীত হয়। তারপর বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা যত বাড়ে ভয়ের কারণগুলোর সঙ্গে পরিচিতি বাড়ে, ওর মধ্যেই কাজকর্ম করতে হয়। তখন ভয়গুলোর চরম আকারটি অনেকটা কমে যায়। ভয়কে কিছুটা অগ্রাহ্য করার জিন তখন কার্যকর হতে পারে বলেই এমনটি ঘটে। তবে সহজাত ভয়টি থেকে যায় যার ফলে পরে অগ্রাহ্য করলেও প্রথমে বুক ধক্ করে ওঠে, ভয়ে আঁৎকে উঠতে হয়, একটি প্রচ্ছন্ন ভয়ের মধ্যেই সবকিছু করতে হয়। ভয় পাওয়ার জিন ও ভয়কে অগ্রাহ্য করার জিন উভয়টির যুগপৎ কাজের ফল এটি। কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে ওই ভয় অগ্রাহ্য করার জিনটি কোন কোন ভয়ের ক্ষেত্রে দুর্বল ভাবে কার্যকর হয়। ফলে তাঁরা সহজাত ওই ভয়কে অগ্রাহ্য করতে পারেননা, এই ব্যাপারে তাঁরা অনেকটা চির শিশুর মত। তাই সারা জীবন তাঁদেরকে ভয়টিকে একটি অযৌক্তিক চরম আকারে রেখে দিতে হয় যাকে বলা যায় 'ফোবিয়া' বা আতঙ্ক। উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ বয়স্ক মানুষ যখন উচ্চতার একটি প্রচ্ছন্ন ভয় নিয়েও ওপরে সব সময় ওঠেন, সংকীর্ণ স্থানে থাকতে অস্বস্থি বোধ করলেও ভীড়ের লিফ্‌ট ব্যবহার করেন, একটি বিচ্ছু বা মাকড়সা দেখলে বিতৃষ্ণা দেখিয়েও একে হাতে ঝেড়ে ফেলেন, সেসব পরিস্থিতিতেই ওই অস্বাভাবিক ফোবিয়াগ্রস্ত মানুষ উচ্চতায় ওঠা অসম্ভব মনে করেন, আতঙ্কের কারণে বিমান ভ্রমণ করতেই পারেননা; ছোট গাড়িতে বা লিফ্‌টে অন্যদের ভীড়ে দু'মিনিট থাকতে হলে বদ্ধ জায়গায়র ভয়ে দম হয়ে যাবার মত অবস্থা বোধ করেন; বিচ্ছু বা মাকড়সা দেখলে আতঙ্কে চেঁচিয়ে মূর্ছা যাওয়ার যোগাড় করেন।

ভয় অগ্রাহ্য করার জিনটির দুর্বল কার্যকারিতাও ওই মানুষদের মস্তিষ্কে গাঁথা থাকে। একটি ভয় কীভাবে ফোবিয়ার আকার নেয় মস্তিষ্কবিদ্যায় তার এক ধরনের ব্যাখ্যা আছে। ধরা যাক মামুলি একটি লম্বা পোকা থেকে মস্তিষ্কে

আবেগের অংশ এমিগ্‌ডালা ও হাইপোথ্যালমাসে শুরুতে একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হলো; যার ফলে সাধারণ বিক্রিয়ায় মুখচোখে একটি বিতৃষ্ণার ভাব দেখা গেলো। কিন্তু তাৎক্ষণিক এটুকু করার পর এ অংশগুলো যখন বার্তাটি মস্তিষ্কের হেড-কোয়ার্টার কোর্টেক্সে পাঠায় তখন এই ক্ষেত্রে একটু বাড়তি ভয়ের আবেগের বার্তা সেখানে পাঠায়। ফলে কোর্টেক্স পুরো বিষয়টি বিবেচনা করে কাজের এমন নির্দেশ দেয় যেটি ওই মামুলি পোকার উপযুক্ত নয় বরং সাপের মত ভয়ঙ্কর কিছুর জন্যই যথাযথ। এমিগ্‌ডালা-হাইপোথ্যালমাস আর কোর্টেক্সের এই বার্তা ও নির্দেশের চক্র বার বার হতে থাকে আর প্রত্যেক বার ভয়টি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে– ওই মুহূর্তের মধ্যে। এভাবেই এটি ফোবিয়ায় পরিণত হয়। কোর্টেক্সের শারীরিক প্রতিক্রিয়ার নির্দেশও তখন আর মামুলি পোকাকে বিতৃষ্ণা দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং তা ভয়ে চেঁচিয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে আতঙ্কগ্রস্তের মত হয়। এই সব ফোবিয়ার অবশ্য চিকিৎসা আছে। এর একটি হলো মস্তিষ্কের এই প্রবণতাকে কমিয়ে দেয়ার জন্য ধাপে ধাপে ভয়ের এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে দিয়ে অভ্যস্ত করা– এক ধরনের প্রশিক্ষণের মত। অন্যান্য নানা চিকিৎসাও আছে।

যে সব ভয় সহজাত নয় সেগুলো কখনো ফোবিয়াতে পরিণত হয়না। হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের লাইনের প্রতি কেউ ফোবিয়াগ্রস্ত হয়েছে এমন নজির নেই– কারণ এর ভয় আধুনিক, এটি আমাদের মস্তিষ্কে নেই, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভয় করতে শিখেছি মাত্র। এমনকি দেখা গেছে যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক সম্পর্কে যে বলা হয়– গোলার শব্দ শুনলে সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়, সিনেমায় যুদ্ধের গোলাগুলির দৃশ্য দেখলে হল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়, এসব অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। এগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ বলে এভাবে ফোবিয়ায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সুখ-দু:খের আবেগ

সুখের আবেগ সবার কাম্য; এর মানে সবাই মস্তিষ্কে এক ধরনের সুখানুভূতি পেতে চায় যার কারণে তার চোখেমুখে ও আচরণে এই আবেগের চিহ্নগুলো ফুটে ওঠে। এর আপাত কারণটি হলো যে মস্তিষ্কে একটি সুখ-কেন্দ্র আছে

খুশির বা সুখের কোন কিছু ঘটলে যাতে একটি 'পুরস্কার'-পাওয়ার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। পুরস্কার পাওয়ার এই অবস্থাটি বিবর্তনেরই একটি ফসল। তাই সুখের আবেগেরও চূড়ান্ত কারণটি হলো বিবর্তনের কালে এটি মানুষের টিকে থাকার সহায়ক হয়েছিলো। অন্যদিকে সুখের বিপরীতে রয়েছে দু:খ। এটিও বিবর্তনের কালে টিকে থাকার জন্য সহায়ক হওয়ার জন্য এসেছে– তবে সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাক্রমে। সুখের আবেগের ভেতর দিয়ে সেদিন যে মানুষ গিয়েছে সে ওটি স্থায়ী করতে চেয়েছে, বার বার পাওয়ার জন্য চেষ্টা নিয়েছে যে কাজগুলো প্রেরণা ও উদ্যমের জন্য সহায়ক। এদিকে দু:খের আবেগের মধ্য দিয়ে যে গিয়েছে সে এটি স্থায়ী করতে চায়নি, এ আবেগ যেন আর না আসে সেটিই তার চেষ্টা ছিল। তাও জীবনের জন্য সহায়ক হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনে দুঃখের আবেগও নির্বাচিত হয়েছে যাতে দু:খ দূর করে সুখ আসতে পারে। আসলে দু:খের সঙ্গে তুলনা করেই সুখের মাত্রা ঠিক হয়। সুখের যে উপভোগ ও সুফল দু:খের বিপরীতে না দেখলে তা ঠিক মতো কাজ করতোনা। আসলে সুখ ও দু:খ একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

এখনকার সুখ-দু:খ যদি আমরা দেখি, যার সব আছে– অর্থ, বিত্ত, সম্মান, তারতো একটানা সুখের কোন সীমা থাকার কথা নয়। কিন্তু কাছে থেকে দেখতে পারলে দেখি তারও দু:খের পরিমাণ সাধারণ ছা-পোষা মানুষের চেয়ে কম নয়, এমনকি কখনো তাদের চেয়ে বেশিও হতে পারে। এর কারণ সুখ স্থির হয় আশা কী ছিল, আর কতখানি তা পূর্ণ হলো– এই দুইয়ের তুলনায়। আশা পূর্ণ না হলেই দেখা দেয় দু:খ। বিভিন্ন মানুষের সেই আশায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য হতে পারে কিন্তু যার যার আশা পূরণ হলে সুখটি কিন্তু প্রত্যেকের কাছে একই রকমের, আর পূরণ না হলে দু:খটিও প্রায় একই রকমের। সবার ক্ষেত্রেই সুখ কাজ করার উদ্যম, শক্তি, ইচ্ছা এনে দেয়। দু:খ তা দমিয়ে দেয়, তাই দু:খের থেকে দূরে থাকার জন্যও সে সচেষ্ট হয়। বিবর্তনের কালেও তাই হয়েছিলো।

যেখানে আশার সঙ্গে প্রাপ্তি কিছুতেই মেলেনা সেখানে স্থায়ী হতাশার সৃষ্টি হতে পারে। সে হতাশার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ অনেক কিছুই করে। কেউ কেউ সহজতর পথ বেছে নিয়ে মাদকের সাহায্য নেয়; এর কারণ

মাদক কৃত্রিম ভাবে মস্তিষ্কের সুখ-কেন্দ্রে 'পুরস্কারের' ব্যবস্থা করে দেয়। এই কৃত্রিম পুরস্কারে মাদক নেয়া মানুষটির হতাশা কেটে যায়, সুখের আবেগের অনুভূতি হয়। কিন্তু এর সবই মেকি; মেকি বলেই তার তীব্রতা সহজে বাড়ানো যায় ফলে এটি ক্রমে আসক্তির সৃষ্টি করে আরো বেশি বেশি পুরস্কারের লোভে। সে অবস্থায় মস্তিষ্ককে বিকল করে ফেলাটাই হয় শেষ পরিণতি।

ঠিক সাধারণ অর্থে সুখ না হলেও কিছু কিছু জিনিস বিবর্তনকালে মানুষের একরকম আকর্ষণ ও সমীহ উদ্রেক করতো, এবং সঙ্গে সঙ্গে এর পরে পরে যা ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য তৈরি হবার সুযোগ দিত। এই আকর্ষণের অদ্ভুত আবেগ ও পরবর্তী প্রস্তুতি দুটি মিলে সে সময়ের পরিস্থিতিতে একেবারে প্রকৃতির কোলে থাকা ওই মানুষগুলোর জন্য বাঁচার সহায়ক হয়েছিলো। যেমন ধরা যাক সূর্য ডোবার সময় আকাশের দৃশ্য ও ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামার অনুভূতি। এটি একটি গম্ভীর, আকর্ষণীয় ও সমীহ উদ্রেককারী আবেগ সৃষ্টি করতো এবং জানিয়ে দিত এরপর সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবে– যা গুহাবাসী সেই মানুষের জন্য খুব প্রতিকূল সময়, যার জন্য নানা রকম প্রস্তুতি প্রয়োজন। এমনি ভাবে গুরু গুরু মেঘের ডাক ও মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে আসা এক রকম আবেগের সৃষ্টি করতো– যার পরেই বৃষ্টি ও ঝড়ের জন্য তৈরি হবার ব্যাপার ছিলো। বনের দাবানল তাদের জন্য ছিল একটি আকর্ষণীয় দৃশ্য– বড় একটি ঘটনা যা পরিবেশের অনেক পরিবর্তন আনে। অনেক পশুপাখি আগুনের তাড়া খেয়ে বের হয়ে আসতো, দিতো শিকারের প্রচুর সুযোগ। পোড়া জায়গা থেকে খাওয়ার উপযুক্ত শেকড় ইত্যাদি সংগ্রহের সুযোগ বেড়ে যেতো, চলাচলেরও সুবিধা হতো। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় অনেক বনজ সম্পদ নষ্টও হতো। এই ব্যতিক্রমী আবেগ তাদেরকে পরবর্তী কাজ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তৈরি করতো। এ ধরনের জিনিসগুলো তাদের জীবনকে এত প্রভাবিত করেছে, এদের নিয়ে আবেগ জীবনের জন্য এমন কিছু সুবিধা করে দিয়েছে যে সেগুলো বিবর্তনের অংশ হয়ে আমাদের কাছে চলে এসেছে। তাই সব সমাজের সব মানুষকে এ ঘটনাগুলো এখনো আপ্লুত করে– সন্ধ্যা নামা, বজ্র-বৃষ্টি ইত্যাদি। যদিও এগুলো নিয়ে এখন সেই

দিনের মত চ্যালেঞ্জ নেবার ব্যাপার তেমন নেই (দাবানল ছাড়া) তবুও মুগ্ধতার আবেগ বয়ে গেছে।

সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীর নানা জায়গার, নানা কালচারের, নানা বয়সের নারী-পুরুষ মানুষের মধ্যে একটি জরিপ চালানো ভয়েছে। সেখানে সবাইকে একটি প্রশ্নই জিজ্ঞেস করা হয়েছে– যদি সুযোগ হতো পছন্দমত যে কোন জায়গায় মনের মত একটি বাড়ি তৈরি করে সেখানে বাস করার সুযোগ হতো, তা হলে কী রকম পরিবেশের জায়গা বেছে নিতেন তিনি। জরিপ করা মানুষদের মধ্যে উন্নত দেশের মানুষ যেমন ছিলেন তেমনি ছিলেন গরীব দেশের, এমনকি গহীন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষও। তাঁদের অনেকে এখন নগরীর ইট-পাথরের মধ্যে বহুতল ভবনে থাকেন, কেউ মরুভূমির মরুদ্যানে, কেউ বা আবার ঘন বনাঞ্চলে, কিংবা বরফের দেশে। কিন্তু সুযোগ পেলে তাঁরা তাঁদের স্বপ্নের বসতটি কোথায় করতেন সে কথা অকপটে বলেছেন সবাই। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই বসতের পরিবেশ বর্ণনা প্রায় সবার ক্ষেত্রে মোটামুটি একই। সবার স্বপ্নের বসতটি হবে ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত জায়গায় যাতে শুধু মাঝে মাঝে থাকবে অনুচ্চ ঝোপ আর গাছ, সামনে দৃষ্টির ভেতর থাকবে হ্রদ বা নদী। এর মধ্যে অল্প বিস্তর হরিণ, গরু এগুলো চরবে, হ্রদের পানিতে মাছেরা খেলা করবে, কিছু দূরে সীমিত বন থাকলেও মন্দ নয়। মজার ব্যাপার হলো এরকম সব মানুষের স্বপ্নের বসতের সঙ্গে মানব-বিবর্তনের মূল আবাস-ভূমি আফ্রিকার সাভানা তৃণ-ভূমির সেদিনের দৃশ্য অনেকটা মিলে যায়। বিবর্তনের কালে এই সাভানার পরিবেশ মানুষকে টিকে থাকতে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলো; একে পছন্দ করে এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে সারা জীবন গড়তে পেরেছে তারাই আমাদের মত অসংখ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে পেরেছে। একই রকম স্বপ্নের বসতের প্রতি এই যে অনুরাগের আবেগ তার বিস্ময়কর সর্বজনীনতা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে এর উৎস বিবর্তনে– ওই আফ্রিকার সাভানায়।

সহজাত কিছু বিরাগও আবার বিবর্তনেই সৃষ্টি হয়েছে– যেমন মানুষের মল; এক্ষেত্রে শুধু বিরাগ নয় রীতিমত ঘেন্না। এই মানব-বর্জ্য কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা এত বেশি যে এর রোগ সৃষ্টিকারী ভূমিকা এড়াতে এই ঘেন্না

তাদেরকে সাহায্য করেছে– তাই সত্যি সত্যি শুধু মল নয় ওই রঙের, ওই আকৃতির, স্পর্শের সব কিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা বিবর্তনে টিকে গেছে। এমনি কথা নানা বিষময় পোকা-মাকড় ইত্যাদির ক্ষেত্রেও সত্য। সেই তখনই বাঁচার সুবিধার জন্য এদের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা তৈরি হয়ে গিয়েছিলো যা আজ অবধি সবাই অনুভব করে। সব কীটপতঙ্গ বিষময় ছিলনা। তবুও যেখানে সম্ভব সবগুলোকে বর্জন করা নিরাপদ বলে এই বিতৃষ্ণা সবগুলোর প্রতি বিস্তৃত হয়েছিলো। তাই এখনো অনেক সমাজে কোন কীটপতঙ্গ খাওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা, যদিও এদের অধিকাংশ খাদ্য হিসেবে চমৎকার। অবশ্য বাধ্য হয়ে অনেক সমাজে আবার মানুষকে এই বিতৃষ্ণা জয় করতে হয়েছে। এটি এতো সফলভাবে তারা করেছে যে একে বরং প্রিয় খাদ্যে পরিণত করেছে। কিন্তু দেখা যায় যেখানে খাদ্য হিসেবে বড় প্রাণীর অভাব রয়েছে শুধু সেই জায়গার মানুষই এ বিতৃষ্ণাকে জয় করেছে, অন্যত্র সেই আদি বিতৃষ্ণা রয়েই গেছে।

সুখের সঙ্গে জড়িত আর একটি আবেগ আমাদের মধ্যে কাজ করে– সেটি হলো উদ্বেগ। দেখা যায় যে উদ্বেগের অনেকখানিই আসে মন স্থির করার ক্ষেত্রে একটি দোদুল্যমানতা থেকে– এখুনি যে সুখটি পাওয়া যাচ্ছে তা লুফে নেবো, না পরে আরো বড় সুখের খাতিরে এটিকে বিলম্বিত করবো। এ নিয়ে নিজের মনের মধ্যে যে যুদ্ধ সেটিই উদ্বেগের আবেগটি। বিবর্তনের কালেও এই যুদ্ধ ছিল। বরং সে সময় অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সুখকে লুফে নেবার ঝট্‌তি ইচ্ছাকে দমন করে বিলম্বিত সুখের দিকে যেতে পারাটি অনেক ক্ষেত্রে জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেছে। তার জন্য উদ্বেগের প্রয়োজন ছিল। এর একটি উদাহরণ নেয়া যাক। সে সময় যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহক মানুষকে প্রায়ই এক জায়গার বসত তুলে নিয়ে অন্য ভাল জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হতো। এ কাজটি মোটেই সহজ অথবা আরামদায়ক ছিলনা– সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতায় ভুগতে হতো। বর্তমান বসতে বড় শিকার কমে গেলেও ছোট শিকার এখনো পাওয়া যাচ্ছে; এগুলো মারা অপেক্ষাকৃত সহজ, কাজেই কিছুটা আরামদায়ক বর্তমান বসতে থেকে যাওয়াটাই তাৎক্ষণিক সুখ। কিন্তু দূরের ওই যে লোভনীয় বড় শিকারের জায়গার কথা শোনা যায়

এখন ভাল আবহাওয়ায় না গেলে আগামী মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ইতোমধ্যে বর্তমান জায়গায় খাবারের অভাব দেখা দিতে পারে। অথচ পথ অনিশ্চিত, পথে খাবার অনিশ্চিত, ওখানে পৌঁছার পরও বসত স্থাপনের অনেক ঝক্কি। ঝট্‌তি ইচ্ছাটা হলো আগের জায়গাতেই থেকে যাওয়া, কিন্তু যৌক্তিক কাজটি হবে বেরিয়ে পড়া; তাই উদ্বেগের সীমা নেই। উদ্বেগটি যদি না থাকতো তা হলে ঝট্‌তি ইচ্ছা পূরণটাই হতো অবধারিত। কিন্তু তা টিকে থাকার ক্ষেত্রে ইতিবাচক হতোনা। উদ্বেগের আবেগটি তাই বিবর্তনে নির্বাচিত হয়েছিলো। আজো সে কারণে এটি আমাদের সঙ্গে আছে।

দৈনন্দিন নানা কাজের মধ্যে তাৎক্ষণিক সুখ আর বিলম্বিত সুখের মধ্যে দোদুল্যমানতা আমাদের মধ্যে নিত্য উদ্বেগের আবেগ সৃষ্টি করছে। সাধারণ একটি উদাহরণ নেয়া যাক। দাওয়াতে গিয়ে লোভনীয় মিষ্টিগুলো খেতে দারুণ লোভ; ঝট্‌তি ইচ্ছেটা হলো এখনই মুখে পুরে দিই দু'একটা। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা এভাবে বার বার অগ্রাহ্য করতে থাকলে নিজের ডায়াবেটিস আক্রান্ত শরীর ভাল রাখার দূরবর্তী সুখটি আর আমার কাছে ধরা দেবেনা। খাব, কি খাবনা, এ নিয়ে যে উদ্বেগ এটি চোখেমুখে খুব স্পষ্ট– চাপা দেবার উপায় নেই। বিবর্তনের কালের সেই উদ্বেগ থেকে আজকের এই উদ্বেগ– তখন যেমন জীবনের সপক্ষে কাজ করেছিলো এখনো করছে, কমবেশি। তবে যেটি এখন হচ্ছে তা হলো অসংখ্য ক্ষেত্রে ঝট্‌তি ইচ্ছেটারই জয় হচ্ছে সব উদ্বেগ সত্ত্বেও। মিষ্টিটি টপ্ করে খেয়ে ফেলছে তাৎক্ষণিক সুখ চরিতার্থ করে; যেটি বিবর্তনের কাম্য ছিলনা। আজ এত মানুষ এই উল্‌টো কাজটি কেন করছে তার কোন সহজ উত্তর পাওয়া যায়না।

অপরের সঙ্গে জড়িত আবেগ

বেশ কিছু আবেগ রয়েছে যেটি শুধু একজন মানুষের ব্যাপার নয়, এতে অন্যরা জড়িত থাকে , অন্তত আর একজন থাকে। এজন্য এগুলোকে সামাজিক আবেগ বলা হয়। মানুষে মানুষে সম্পর্কের এই আবেগগুলো অপেক্ষাকৃত জটিল প্রকৃতির, এদের ব্যাখ্যাও তাই কঠিন। সামাজিক আবেগের বৈচিত্র অনেক– ভাল লাগা, ভালবাসা, গর্ব, অপরাধ-বোধ, লজ্জা,

সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা, রাগ, ঘৃণা, হিংসা, ঈর্ষা– সবই এর মধ্যে পড়ে। এদের সবগুলোকে একটি সাধারণ তত্ত্বের আওতায় ব্যাখ্যা করার চমৎকার কাজটি সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। এটিও বিবর্তনের মাধ্যমেই যে এদের উৎপত্তি তা প্রমাণ করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এসব সামজিক আবেগের কোন কোনটি অপরকে সহায়তা দেয়– যেমন ভালবাসা, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। আবার কোন কোনটি অপরের ক্ষতি করে– যেমন রাগ, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদি। তারপরও সবগুলো একই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে, সেটিই চমকপ্রদ।

সামাজিক আবেগের এই তত্ত্বের ভিত্তি হলো পারস্পরিক উপকার তত্ত্ব, যা আমরা আগেই দেখেছি। এতে একজন আরেকজনের উপকার করে এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করে, তার থেকে উপকার ফেরৎ পাবে বলে। এই ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে আস্থা, এতে ঠক্‌বার আশঙ্কা, এসব থেকেই সামাজিক আবেগগুলো সৃষ্টি হয়। কেন অন্যকে সাহায্য করার আবেগ সৃষ্টি হয়, আবার কেনই বা অন্যের ক্ষতি করার মত আবেগ সৃষ্টি হয়, সে সব প্রশ্নের জবাবও ওখানেই মেলে। পারস্পরিক উপকারকে যেমন আমরা বিবর্তনের সৃষ্টি বলে দেখেছি, তারই সূত্র ধরে এই আবেগগুলোও বিবর্তনেরই সৃষ্টি।

একটি উপমা দিয়ে অনেক সময় ব্যাপারটি সহজে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, যাকে বলা হয় 'কারাবন্দীর উভয়-সংকট'। দুজন কারাবন্দীকে কারাগারে আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে। পৃথক ভাবে পুলিশ যখন তাদের এক একজনকে আলাদা ভাবে জেরা করে তখন প্রত্যেকে বলতে পারে দুজনের কেউই অপরাধটি করেনি; সেক্ষেত্রে তাদেরকে কিছু শাস্তি ভোগ করতে হবে, কিন্তু সাক্ষীর অভাবে বড় কোন শাস্তি দেয়া যাবেনা। যদি দুজনেই বলে উভয়ে মিলে অপরাধ করেছে তখনো শাস্তি কিছুটা লঘুই হবে, দোষ স্বীকারের জন্য। কিন্তু যদি একজন বলে যে সে নিরপরাধ, অন্যজনই অপরাধটি করেছে এবং সে এর সাক্ষী দিতে রাজী আছে; তা হলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, অন্যজনের বড় শাস্তি হবে। দু'জনের প্রত্যেকে তাই ভয়ে ভয়ে থাকে এই ভেবে যে অন্যজন সহযোগিতা করছে, নাকি বিশ্বাস-ভঙ্গ করছে নিজের স্বার্থে। যদি

তারা উভয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করে তা হলে দু'জনেরই লাভ। যদি একজন বিশ্বাস-ভঙ্গ করে তাহলে অন্যজনের বিপদ ঘটে, সে মুক্ত হওয়ার পর এর প্রতিশোধ নিতে পারে। তাই বিশ্বাস-ভঙ্গের আগে দুজনকেই এই প্রতিশোধের সম্ভাবনাটিও বিবেচনায় রাখতে হয়। সহযোগিতা না বিশ্বাস-ভঙ্গ– এটিই হলো কারাবন্দীর উভয়-সংকট।

পারস্পরিক উপকারের ক্ষেত্রেও এই উভয়-সংকট কাজ করে। যার উপকার করলাম সে ফিরতি উপকার দিয়ে আমার উপকার করবে কিনা। যদি করে তাহলে দুজনের সহযোগিতা রইলো, যদি না করে তা হলে বিশ্বাস-ভঙ্গ হলো। বিবর্তনের কালে মানুষকে সামাজিক বোঝাপড়ার ওপর এমনভাবে নির্ভর করতে হতো যার ব্যত্যয় অনেক সময় জীবন-মরণ সমস্যা এনে দিতে পারতো। বিবর্তন তাই সহযোগিতাকে নির্বাচন করেছে, বিশেষ করে পারস্পরিক উপকারের ক্ষেত্রে। এর মানে বিবর্তন মস্তিষ্কে এমন সব আবেগ সৃষ্টি করেছে যাতে সহযোগিতাটি অটুট থাকতে পারে, বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রবৃত্তিটি সহজে দেখা না দেয়। কৃতজ্ঞতা, ভাল লাগা ইত্যাদি এমনিতরো আবেগ। যার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ তার সঙ্গে সহযোগিতা না করার প্রশ্ন ওঠেনা তার উপকারের প্রতিদান না দেয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুর সঙ্গে সহযোগিতা বজায় থাকাইতো স্বাভাবিক। ওই ভাল লাগার আবেগটিই স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেই পথ করে দেয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে একেবারে হয়না তা নয়। ভাল লাগার আবেগ সত্ত্বেও দুই বন্ধুর মধ্যে বিশ্বাস-ভঙ্গের ব্যাপারটি কখনো কখনো ঘটে। যখন বিশ্বাস-ভঙ্গের ফলে লাভটি এত বেশি মনে হয় যা বন্ধুত্বের টানকে অগ্রাহ্য করতে পারে, তখনই তা ঘটে।

কিন্তু আবেগটি যদি হয় ভালবাসা তা হলে বিশ্বাস-ভঙ্গের সম্ভাবনা অনেক কম, প্রায় নেই বল্লেই চলে। সে কারণেই বিবর্তনে ভাল লাগা ছাড়াও ভালবাসার মত আরো ভিন্ন এবং আরো তীব্র আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা আরো কঠিন হয়ে যায়। বিশেষ করে একেবারে ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই সহযোগিতাটি বজায় রাখা সেই পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য একেবারেই জরুরী ছিল। কাজেই সেখানে সৃষ্টি হয়েছে শুধু

ভাল লাগা নয়, ভালবাসা– স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, প্রেমিক-প্রেমিকার ভালবাসা, বাবা-মা আর সন্তানের মধ্যে ভালবাসা; এ ভালবাসা এক অদ্ভুত টানের আবেগ। টানটি এত অদ্ভুত হবার কারণ হলো ভালবাসা যুক্তি মানেনা, এটি অন্ধ। তাই মায়ের কাছে তার সন্তানের কোন দোষই চোখে পড়েনা, তাকে মনে হয় দুনিয়ার সব চেয়ে মূল্যবান সন্তান। দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসীকেও প্রেমিকার মনে হয় অতি স্বজ্জন ব্যক্তি যার প্রেমে পাগল হতে হয়। এগুলো কোন যুক্তি-তর্ক মানেনা, তাই এক্ষেত্রে সহযোগিতাটি শর্তহীন, সেটি ভাঙ্গার সম্ভাবনা খুব কম। সহযোগিতার গ্যারান্টি দেবার জন্যই ভালবাসার মত আবেগ বিবর্তনে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই একে অন্যের ওপর নিশ্চিন্তে আস্থা রাখতে পারে– উভয়-সংকট এড়িয়ে।

স্পষ্টত সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য সৃষ্ট সামাজিক আবেগগুলো বোঝা গেল, কিন্তু বাকিগুলো এলো কেন? যেমন ধরা যাক রাগ, এটি তো সহযোগিতা বাড়াবেনা। কিন্তু অন্যভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় এগুলোরও সৃষ্টি পরোক্ষভাবে সহযোগিতা বাড়াবার জন্যই। আমরা সহযোগিতার বিপরীতে বিশ্বাস–ভঙ্গের ব্যাপারটি দেখেছি। কেউ যদি এভাবে বিশ্বাস-ভঙ্গ করে, তা হলে পরস্পর উপকার করার যে বন্ধন তৈরি হয়েছিলো তা ভেঙ্গে যাবে; বিবর্তনের কালে সে রকম অবস্থা বাঁচার জন্য সহায়ক ছিলনা। কাজেই তার চেয়ে ভাল ছিল এমন কিছু আবেগ সৃষ্টি করা যা বিশ্বাস-ভাঙ্গার সম্ভাবনা দেখা দেয়ার পরও সেই সম্ভাবনাকে কমিয়ে দিয়ে কোন না কোন ভাবে সহযোগিতাকে বজায় রাখতে পারে। সেখানেই চলে আসে রাগের (কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমানের) মত অন্য সব সামাজিক আবেগের গুরুত্ব।

দু'বন্ধুর পরস্পরকে ভাল লাগার আবেগটি একপেশে হতে পারে একজনের যতটা ভাল লাগে অন্য জনের ততটা লাগেনা। ফলে পরস্পর উপকারগুলোও একপেশে হতে পারে– একজন যতটা উপকার করে অন্যজন তার থেকে কম প্রতিদান দেয়। তবুও মন্দের ভাল হিসেবে ঠকে যাওয়া বন্ধুটি বন্ধুত্ব ভেঙ্গে দেয়না, এটি বজায় রাখে। এর মধ্য দিয়ে অবশ্য দু'জনের প্রত্যেকের মধ্যে ভিন্ন দুটি নতুন আবেগের জন্ম হতে পারে। যে ঠকাচ্ছে তার মধ্যে অপরাধ-বোধ, আর যে ঠকছে তার মধ্যে গর্ব। অপরাধ-বোধের কারণে প্রথমজন

হয়তো সম্পর্কে কিছুটা সমতা আনার চেষ্টা করবে, আর গর্বের কারণে দ্বিতীয়জন কিছুটা কম পেয়েও সম্পর্ক চালিয়ে যাবে। এভাবে এই দুটি আবেগ সহযোগিতাকে ভারসাম্যে আনতে সাহায্য করবে, টিকিয়ে রাখতেও।

ভারসাম্য বেশি নষ্ট হলে সহযোগিতা নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। তাই ওই অপরাধ-বোধ ও গর্বের মত আবেগগুলো বিবর্তনে নির্বাচিত হয়েছিলো সহযোগিতার স্বার্থেই, কারণ বেঁচে থাকতে গেলে সে সহযোগিতা দরকার ছিল। এভাবে একপেশে ভালবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। পারস্পরিক উপকারে অন্য এক ধরনের সম্পর্কেও এরকম কিছু ভিন্ন আবেগ সমতা আনতে সাহায্য করে। একজনের মধ্যে এ আবেগ সহানুভূতি হলে অন্য জনের ক্ষেত্রে এটি হয় কৃতজ্ঞতা। দ্বিতীয় জন উপকারের পুরো প্রতিদান নাও যদি দিতে পারে কৃতজ্ঞতা দিয়ে একরকম সমতা আনতে পারে, যা সহযোগিতাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্য করেছিলো, এবং করছে।

একপেশে উপকার অন্য ক্ষেত্রে আরো অপ্রিয় রূপ নিতে পারে। ধরা যাক এক পক্ষ ক্রমাগত ঠকিয়ে যাচ্ছে, তার কারণ যেটুকু সে দিচ্ছে তাতেই অন্য পক্ষকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে সহযোগিতা একেবারে বন্ধ না করার ইচ্ছায়। এরই সুযোগ নিচ্ছে প্রথম জন। কিন্তু এভাবে ঠকার কারণে দ্বিতীয় জনের মধ্যে রাগের আবেগের সঞ্চার হয়। রাগ জিনিসটি একটি স্বাভাবিক আচরণ নয়, নিজের মধ্যে এই আবেগ বেশি দেখা দিলে মানুষ অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে রাগের পাত্রটিকে আক্রমণ করে, তার ক্ষতি করতে পারে। এই ভাবে রাগের সম্ভাবনা যেই পক্ষ ঠকাচ্ছে তাকে সাবধান করে দেয় যাতে সে ঠকানোর মাত্রাকে সংযত করতে পারে। তাই ক্ষতিকারক হলেও এর ভূমিকাও সহযোগিতাকে রক্ষা করা, তাকে ভেঙ্গে দেয়া নয়। তাই বিবর্তনের কারণে রাগের আবেগটিও নির্বাচিত হয়েছিলো।

খুব সম্ভব অনেকটা এই একই রকম কারণে সহযোগিতা রক্ষার জন্য ঘৃণা, ঈর্ষা, হিংসা ইত্যাদিও নির্বাচিত হয়েছিলো। কেউ তাকে ঘৃণা করুক এটি কারো কাম্য নয়, তাই এটিও ওই রাগের মত কাজ করেছে। ভালবাসার ক্ষেত্রে যখনই ঠকার প্রশ্ন উঠেছে তখন ঈর্ষার আবেগ সৃষ্টি হয়েছে– এটিও

ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সহায়তা দিয়েছিলো বলে। একজন ঠকিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে, তার স্বার্থত্যাগ কম, সম্পদ সঞ্চয় বেশি– এসব অন্যজনের মনে হিংসা উদ্রেক করবে এটিই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও চরম অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত এই অপ্রিয় আবেগটি ভারসাম্য আনতে সহায়তা করেছিলো। কিন্তু চরম অবস্থায় যখন গিয়েছে, তখন এই সব আবেগগুলো আর সতর্কতার সাবধানবাণী দিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি, কারণ ইতোমধ্যে পরস্পর উপকারের সম্পর্কটাই পুরাপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। তখন রাগ, ঘৃণা, ঈর্ষা ইত্যাদিও চরম রূপে আবির্ভূত হয়েছে; যেমন হিংসা পরিণত হয়েছে প্রতিহিংসায়। সহযোগিতাকে এ চরম অবস্থায় না নেয়ার জন্যই বিবর্তন আবেগগুলো সৃষ্টি করেছিলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগগুলো তাতে সফল হয়, সব ক্ষেত্রে না হলেও।

আবেগ যখন অসুখ

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি প্রায় প্রত্যেকটি আবেগের একটি উপকারী ভূমিকা আছে, অন্তত বিবর্তনের কালে ছিল। আর সেই ভূমিকার জন্যই সেগুলো বিবর্তনে নির্বাচিত হয়েছিলো; এমনকি যে সব আবেগ নিজের মধ্যে কষ্ট বা বেদনার সৃষ্টি করে সেগুলোও। পরে দেখা গেছে এর মধ্যে যে কোন আবেগ অস্বাভাবিক তীব্রতায় অথবা তার তাৎক্ষণিক কারণের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তীব্রতায় চলে গেলে তা মানসিক অসুখের পর্যায়ে চলে যায়। যেমন ভয় স্বাভাবিক আবেগ হলেও ফোবিয়া বা আতঙ্ক তা নয়। তেমনি অতিরিক্ত উদ্বেগ, হাসি, কান্না, রাগ, গর্ব, লজ্জা, সবই অসুখ হিসেবে দেখা দিতে পারে। বিবর্তনের কালে নির্বাচিত হবার সময় এগুলো এই পর্যায়ে যাওয়ার জন্য নির্বাচিত হয়নি, কিন্তু আজকের পরিবর্তিত পরিবেশ এবং অন্য কিছু জিনের যুগপৎ প্রভাব সব মিলে কারো কারো ক্ষেত্রে এ অসুখ তৈরি হচ্ছে। আবার এর সম্পূর্ণ উল্‌টো চিত্র হলো যে পরিস্থিতিতে যে আবেগ সৃষ্টি হওয়ার কথা তা বিন্দুমাত্র না হওয়া। এটিও এক ধরনের অসুখ বলে বিবেচিত হতে পারে– যেখানে ভয় পাওয়ার কথা সেখানে তা না পাওয়া, যেখানে অপরাধ-বোধ জাগার কথা সেখানে তা না জাগা, যেখানে শোক, দু:খ, অথবা আনন্দ প্রকাশ

করার কথা সেখানে তা না করা। এরকম আবেগের অভাব বিবর্তনের কালে যেমন ক্ষতিকর ছিল এখনো তাই আছে। এভাবে আবেগের বাড়াবাড়ি অথবা আবেগের অভাব উভয় অসুখই অবহেলা করার মত নয়। আজকাল এগুলোর চিকিৎসা আছে। মনোবিজ্ঞানীরা নানা রকম চিকিৎসার চেষ্টা করছেন। কোন কোনটির জন্য ওষুধও আছে। মস্তিষ্কে আবেগের জন্ম কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থের (নিউরোট্রান্সমিটার) প্রভাবে হয় জানার ফলেই এগুলো বাড়াবার অথবা কমাবার ওষুধ তৈরি সম্ভব হয়েছে। যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা ইত্যাদি কমাবার ওষুধ (এন্টি-ডিপ্রেসেন্ট) আজকাল নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে।

আমরা অবশ্য এখানে সব আবেগের অসুখে পরিণত হবার ব্যাপারটি নয়, তার মধ্যে যে ক'টি যতটা না আবেগ হিসেবে তার চেয়ে বেশি অসুখ হিসেবে বিবেচিত সেগুলোকে শুধু দেখবো। এর মধ্যে বিষণ্নতার নামটি সবার আগে আসে। এটি আজকাল মানুষকে ভাবাচ্ছে বেশি, কারণ আজকের জটিল জীবন ও তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে দেশে দেশে এটি ব্যাপক হারে দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনকে এবং দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে এটি এতটাই বিকল করে দিতে পারে যে অসংখ্য ক্ষেত্রে এর পরিণতি আত্মহত্যায় গিয়ে গড়ায়। আসলে আত্মহত্যার সব কারণের মধ্যে তীব্র বিষণ্নতাই বড় কারণ। বিষণ্নতার লক্ষণ হলো জীবনের সব কিছু থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে নিজের দু:খ-চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে থাকা। শেষ পর্যন্ত এর ফলে রোগী নিজের জীবনের অর্থ হারিয়ে ফেলতে পারে।

এমন যেই বিষণ্নতা এটিও কি বিবর্তনের কালে জীবনের জন্য উপকারী কোন আবেগ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলো? সেটি কি সম্ভব? এর ওপর একটি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব কিন্তু একথাই বলে, টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়েছিলো বলেই এটি এসেছে। কেমন করে সেই সুবিধা তা এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছে। তত্ত্বটির নামেই তার ইঙ্গিত আছে– 'খাপ খাইয়ে নেয়ার জাবর-কাটা তত্ত্ব'। জাবর-কাটা কথাটি অবশ্য চিন্তার জাবর-কাটার অর্থে। বিবর্তনের কালে পরিবেশের প্রতিকূলতায় বিশেষ কোন খারাপ সমস্যার সম্মূখীন হওয়া মানুষদের মধ্যে যারা এতে বিষণ্ন হয়ে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে ওই সমস্যার চিন্তায় মগ্ন হয়েছে তাদের জন্য সমস্যাটি সমাধানের পথ বের করা সহজ

হয়েছে। কারণ সর্বক্ষণ তারা এরই জাবর কেটেছে, এই সমাধানের উপায় নিয়ে চিন্তা করেছে; সেটিই তো বিষণ্নতার লক্ষণ। এর ফলে সমস্যাটার সঙ্গে তারাই নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, আর তাই বিষণ্নতা বিবর্তনে টিকে গিয়েছে।

বিষণ্নতার এই তত্ত্বটি আধুনিক মস্তিষ্কবিদ্যার দ্বারাও এক ভাবে সমর্থিত। মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের চিন্তাকে একটানা কিছুক্ষণ একটি বিষয়ের ওপর ধরে রাখতে সাহায্য করে তাকে বলা হয় 'কার্যকর স্মৃতি'; যেটি আপাতত তুলে রাখা 'দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যখন কোন বিষয়ের ওপর চিন্তা সচল থাকে তখন এই কার্যকর স্মৃতিই এ সম্পর্কে সব তথ্য ধরে রাখে এবং চিন্তার মধ্যে ব্যবহার করতে দেয়। এ প্রক্রিয়ার জন্য বিষয়টির প্রতি একটানা মনোযোগ দরকার, অন্য কোন দিকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলে চলেনা। বিষণ্নতা তাই এ কাজে খুব যুৎসই। বিষণ্নতার মধ্যে একাকী থাকার, ক্ষুধা নষ্ট হওয়ার, ঘুম না হওয়ার যে উপাদান আছে তার সব কিছুই এরকম নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ নিশ্চিত করে; কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতে না হওয়ার, খাওয়ার বিরতিও না নেয়ার, এমন কি ঘুম এসেও যেন চিন্তায় ঘটাতে না পারে সে ব্যবস্থা করার।

কিন্তু এতই যদি সুবিধাজনক আবেগ হিসেবে বিবর্তিত হবে আজ কেন বিষণ্নতা অসুখে পরিণত হলো। এক্ষেত্রে এ তত্ত্বের সমর্থকরা আজকের জটিল জীবনকে দায়ী করেন– যেখানে পরিমিত পরিমাণ বিষণ্নতা নয়, তীব্র বিষণ্নতাই নিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞানী এই জাবর-কাটা তত্ত্বটিই মানতে চান্না। তাঁরা বলেন বিষণ্নতা যে বেছে বেছে কিছু মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সবার মধ্যে সমান ভাবে নয়, তার থেকে মনে হয় এটি সরাসরি বিবর্তনের সৃষ্টি নয়। তাঁদের মতে এটি অন্য কোন জিনের মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট একটি অসুখ। এই মিউট্যাশন হওয়া জিন নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যেতে পারে বলে যাদের মধ্যে এর প্রবণতা থাকে তাদের পরিবারে অন্যান্য কারো কারো মধ্যেও এটি থাকতে দেখা যায়– যে কোন জেনেটিক অসুখে যেমনটি হয়। তবে জাবর-কাটা তত্ত্ব না মানলেও

পরিমিত পরিমাণে বিষণ্নতা যে এখনো সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয় একথা অস্বীকার করা যাবেনা।

এবার আমরা আর এক ধরনের আবেগজনিত অসুখের দিকে তাকাই। এগুলো উদ্বেগের সঙ্গে জড়িত অসুখ। আমরা দেখেছি তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু চরিতার্থ করার ঝট্‌তি ইচ্ছা থেকে উদ্বেগের জন্ম হয়। এই অসুখগুলো অনেকটা সেরকম ঝট্‌তি ইচ্ছার ব্যাপার। এদেরকে আরো স্পষ্ট করে বলা হয় 'বাতিকগ্রস্ত- বাধ্যতাধর্মী অসুখ' (অব্‌সেসিভ-কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, সংক্ষেপে ওসিডি)। ওই যে ঝট্‌তি ইচ্ছা এটি সব সময় মাথায় ভর করে থাকে মনে হয় রোগী এই বিষয়ে বাতিকগ্রস্ত। আর এটি করার জন্য রোগী যে রকম বাধ্যতা অনুভব করে তাতে মনে হয় এটি না করার কোন উপায় তার নেই। এভাবেই এই আবেগগুলো অসুখে পরিণত হয়েছে।

ওসিডির যে উদাহরণটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এবং যথেষ্ট বিব্রতকর ও ক্ষতিকর হয় তাকে আমরা বলি শুচিবাই। এতে রোগী সবখানে ময়লা দেখতে পায়, মনে করে জীবাণু গিজ গিজ করছে, ঘন ঘন হাত ধোয়ার ও গোসল করার বাধ্যতা অনুভব করে, যথাসম্ভব অন্যদের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি এড়িয়ে যেতে চায়। এর অতিরিক্ত বাতিকগুলো হলো সবকিছু বারবার পরিষ্কার করা, বার বার গুছিয়ে রাখা, বার বার যাচাই করা ইত্যাদি, এটি প্রায়ই এমন পর্যায়ে চলে যায় যে রোগীর জন্য ও অন্যান্যদের জন্য জীবন বেশ দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এবং সামাজিক ভাবেও খুব বিসদৃশ আচরণ হয়ে দাঁড়ায়। বিষণ্নতাকে যেই অর্থে বিবর্তনের সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা যায় এক্ষেত্রেও তা করা যায়। পরিবারে কারো এ রোগ থাকলে পরিবারের অন্য কোন কোন সদস্যেরও এর সম্ভাবনা বাড়ে। এর থেকে বোঝা যায় যে এর জেনেটিক ভিত্তি রয়েছে। শুচিবাই রোগটি বিবর্তনের কালে বাঁচার ক্ষেত্রে সুবিধা না পেলেও পরিস্কার–পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসটি এই সুবিধা পেয়েছিলো। সে সময় প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ সব রকমের দূষণ পদার্থে আর বর্জ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে থাকাটি স্বাভাবিক ছিল– মানব-বর্জ্য, প্রাণী-বর্জ্য, শিকারের বর্জ্য, গুহার বা অন্য বসতের চারিদিকে এগুলো জমে জমে। মস্তিষ্কে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি প্রবণতা, এমনকি এর প্রতি খানিকটা বাতিক বাঁচার জন্য সুবিধাজনক ছিল

বৈকি। তার ধারাবাহিকতায় এই অভ্যাসটি এখনো সকলের মস্তিষ্কে থাকা স্বাভাবিক। তাই বলে আজকের যে সব জায়গায় ও আবাসে দূষণ ও সংক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম সেখানেও কারো রীতিমত রোগীর মত শুচিবাইগ্রস্ত হওয়াটির ব্যাখ্যা এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়না। পরিচ্ছন্নতা প্রবণতার মূল জিনটির মিউট্যাশন অথবা অন্য কোন জিনের প্রভাব কারো কারো মধ্যে এই অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। তাই এটি আর দূষণের বিরুদ্ধে সতর্কতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, সারাক্ষণ মাথায় ভর করেছে, আর বাধ্যতা অনুভব করার মত কাজে পরিণত হয়েছে। যেহেতু অসুখটি উদ্বেগজনিত, তাই উদ্বেগ কমাবার ওষুধ দিয়ে ও অন্যান্য ভাবে এর চিকিৎসা সম্ভব।

ওসিডি'র আরো কিছু উদাহরণ ব্যাপক ভাবে দেখা যায় যদিও এগুলো গুরুতর রূপ ধারণের সম্ভাবনা কম, ক্ষতির সম্ভাবনাও কম। এর একটি হলো বিপদ হতে পারে মনে করে কোন বিষয়ে অনর্থক বার বার নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা। একবার নিশ্চিত হবার কিছুক্ষণের মধ্যে সেটি ভুলে নিশ্চয়তার ব্যাপারে সন্দেহ অনুভব করেই এটি ঘটে। এখানেও সেই মাথায় ভর করা আর বাধ্যতা অনুভব করার ব্যাপার। বাসা থেকে অনেকদূর চলে আসার পর দরজা বন্ধ করার ব্যাপারে অথবা চুলাটি নেভাবার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আবার ফিরে যাওয়া এমনি অসুখের একটি মৃদু লক্ষণ। কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বার বার ঘটতে পারে। এরকম সাধারণ ব্যাপার থেকে শুরু করে জটিল ব্যাপার যেখানেই সন্দেহ সেখানেই বার বার তা নিরসনের চেষ্টায় প্রচুর সময়, শক্তি, ও ধৈর্য বিসর্জন দিতে হয়– যাকে অসুখ বা বাতিক বলা ছাড়া উপায় থাকে না। পরিমিত মাত্রায় এ ধরনের সতর্কতার উপকারী দিক রয়েছে, বিবর্তনের কালে হয়তো সেটি আরো বেশি ছিল, জীবন মরণের ব্যাপার ছিল। যেমন গুহার মুখের সামনে যে আগুনটি রাতে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল হিংস্র প্রাণীকে দূরে রাখার জন্য তা সারা রাত জ্বল্‌ছে কিনা বার বার উঠে দেখা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই একটু খুঁতখুঁতে মন বাঁচার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিলো। তবে আজকের অসুখটির পর্যায়ে আসতে তাতে জিন-বৈকল্যের প্রয়োজন

হয়েছে যা শুধু কারো কারো মধ্যে গেছে, এবং তার ভেতরও আরো সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যেই শুধু অস্বভাবিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এমনি আরেকটি উদ্বেগজনিত অসুখ হলো বছরের পর বছর টুকটাক সব জিনিস জমিয়ে রাখার অভ্যাস আছে কোনদিন এর কোনটি কাজে লাগে। বিবর্তন কালের অভাবের দিনে দরকারী অস্ত্র, হাতিয়ার, তৈজস হাত বাড়ালেই পাওয়া যেতনা, সেগুলো যতই সাধারণ জিনিস হোক না কেন। তখন এমনি সঞ্চয় যুক্তিসঙ্গত হলেও আজ তা মোটেই নয়। এখন প্রায়শ এটি একটি বাতিক মাত্র, অন্য ক'টা বাতিকের মতই সৃষ্টি হওয়া একটি ওসিডি।

ঘর কৈঁলু বাহির বাহির কৈঁলু ঘর

জিনের প্রকাশের গোলক ধাঁধাঁ

এ পর্যন্ত আমরা প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, নানা আচারণকে জিনের কাজ হিসেবে বোঝার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই আরো একটি বার্তা পেয়ে গেছি– সেটি হলো এক একজন মানুষের মধ্যে এ আচরণ কতখানি দেখা যাবে তা তার জিন ছাড়াও অন্য কিছুর ওপরও কিছুটা নির্ভর করে। আচরণের জিন-নির্ভরতা নিয়ে যে গবেষণাগুলোর কথা বলেছি তার মধ্যেই এই অন্য কিছুর ব্যাপারটিও এসেছে। আচরণের ওপর জিনের প্রভাব বুঝতে এসব গবেষণায় কোন অস্বাভাবিক আচরণ একই পরিবারে অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিবারে একাধিক সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে কিনা তার অনুসন্ধানটি প্রাধান্য পেতে আমরা দেখেছি। তাছাড়া গুরুত্ব পায় দত্তক নেয়া সন্তান আর নিজের সন্তানের আচরণের পার্থক্য রয়েছে কিনা তা; অথবা অভিন্ন যমজদের মধ্যে আচরণের মিল বা অমিল কী রকম তা দেখা। এই সব উপায়ে আচরণটিতে জিনের প্রভাবটি কতখানি তা কিছুটা বোঝা যায়। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রটি যদি নিই, আমরা দেখেছি বিভিন্ন আচরণের জন্য অভিন্ন যমজের দু'জনের মধ্যে মিল পাওয়ার সম্ভাবনাটি ৫০% থেকে ৬০%। দুজনের জিনের মিল ১০০% হওয়া সত্ত্বেও আচরণের মিল কেন ১০০% নয় সেটিই প্রশ্ন। তা হলে বাকি শতাংশগুলোতে কিসের অবদান আচরণের ওপর থাকে?

ওই বাকিটুকুকে সবাই এক কথায় বলেন 'পরিবেশের' অবদান। যা বোঝানো হয় সেটি হলো বাইরের সব কিছু– যার মধ্যে আছে আলো-বাতাসের মত প্রাকৃতিক পরিবেশ; পারিবারিক ও সামাজিক আবহ; শৈশবে ও কৈশোরে লালন-পালন, যত্ন, শিক্ষা ইত্যাদিও। এক সময় মনোবিজ্ঞানীরা আচরণকে প্রধানত এগুলোরই ফলশ্রুতি মনে করতেন, যার ফলে সেই সাদা খাতার ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছিলো। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য প্রায় সবাই একই

সঙ্গে আচরণের ওপর জিনের সহজাত প্রভাবকেও স্বীকার করেন, এবং 'নেচার' বনাম 'নারচার' অর্থাৎ জিন বনাম পরিবেশ এই বিতর্কটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন– কোন্‌টির প্রভাব বেশি আর কোনটির কম সেটিই প্রতিপাদ্য। অনেকে বিতর্কটি এমনভাবে তোলেন যেন জিন আর পরিবেশ এই দুটি দুই বিপরীত মেরুতে রয়েছে: জিন হলো একজন মানুষের নিজস্ব ভেতরের (ঘরের) জিনিস; আর পরিবেশ হলো বাইরের জিনিস। এই দুইয়ের দুই আলাদা আলাদা প্রভাব আচরণের ওপর পড়ে এবং তাদের টানাটানিতে আচরণ ঠিক হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এখন বুঝতে পারছে ব্যাপারটি তা নয়। আচরণ সৃষ্টি হয় জিন আর পরিবেশ (আসলে বিশেষ বয়সের ও বিশেষ রকমের পরিবেশ) এই দুইয়ের এক ঘনিষ্ঠ পারস্পরিক ক্রিয়ায়– যেখানে ঘর আর বাহির একাকার হয়ে যায়। এ অধ্যায়ে আমরা সেই প্রক্রিয়াটিই দেখবো বলে এই অধ্যায়ের শিরানাম দিতে গিয়ে অনেক দিন আগের বাংলার কবি দ্বিজ চন্ডীদাসের 'প্রেমমুগ্ধা' কবিতার একটি পংক্তি ব্যবহার করেছি যেখানে ঘর বাহির হয়ে যাচ্ছে আর বাহির ঘর হয়ে যাচ্ছে।

যা আমরা জন্মগত ভাবে পেয়েছি সেই জিন আমাদের দেহমনে সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে একথা সত্য বটে, কিন্তু পুরো সত্য নয়। না হবার কারণ হলো জিন যেমন নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি নিজেও নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই নিয়ন্ত্রণটি আসে জিনের প্রকাশের তারতম্য থেকে। জিন থাকা এক জিনিস, এর প্রকাশ হওয়াটা অন্য জিনিস। জিন প্রকাশিত হয়ে তার কাজ কতখানি করতে পারবে, আদৌ প্রকাশিত হবে কিনা, সেসবকে নিয়ন্ত্রণের একটি জটিল ব্যবস্থা ডিএনএ'র মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু সে ব্যবস্থার ভেতরেই পরিবেশেরও একটি ভূমিকা থাকে। আসলে আচরণের ওপর পরিবেশের প্রভাবের অনেকটাই আসে এই পথে– জিনের প্রকাশের নিয়ন্ত্রণে হাত রেখে।

জিনের বার্তা কতখানি প্রকাশ হবে কি হবেনা তার নির্দেশনা আসে এই জিনের বাইরে থাকা ডিএনএ'র অন্য একটি অংশ থেকে, অথবা অন্য একটি জিন থেকে। এমনি সব বাইরের অংশ বা অন্য জিন তৈরি করে 'ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর' নামের কিছু প্রোটিন। এই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টরের কাজ যেন মূল জিনটির সুইচ 'অন' করা অর্থাৎ একে কার্যকর করা। মূল জিনের যে প্রান্তিক

অংশকে আগে আমরা ‘প্রমোটার’ হিসেবে দেখেছি তারও কাজ জিনকে প্রকাশিত হতে দেয়া, কিন্তু সেজন্য তাকে এই ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর প্রোটিনের সাহায্য নিতে হয়। ফলে প্রমোটার জড়িত হয়ে আছে অন্য জিনের সঙ্গে। শুধু তাই নয় ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর প্রমোটারকে খুবই সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। এর মানে প্রমোটারে খুব সামান্য পরিবর্তন ঘটলে জিনের প্রকাশে আকাশ-পাতাল তারতম্য হতে পারে। আর পুরো ব্যাপারটি নির্ধারিত হয় জটিল একটি ঘটনা পরম্পরায়ের মাধ্যমে। এসবে এক দিকে কিছু অন্য জিনের দ্বারা মূল জিনের প্রকাশিত হওয়াটি উচ্চকিত হচ্ছে, আবার অন্যদিকে আরো কিছু অন্য জিনের দ্বারা তা অবদমিত হচ্ছে। সব মিলে কী হবে তা একটি গোলক ধাঁধাঁর মত– কী মাত্রায় কোন্ জিন প্রকাশিত হবে এই গোলক ধাঁধাঁ তা স্থির করবে। ডিএনএ’র সহজ পাঠের খাতিরে আমরা যে বলেছি জিনের বার্তা যদি হয় ‘বীজ কুঁচকানো হও’, তা হলেই বীজ কুঁচকানো হবে; ব্যাপারটি কিন্তু অতটা সোজাসাপ্টা নয়। এই বার্তাকেও কমবেশি জিনের প্রকাশের ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। বার্তা যদি মানব আচরণের মত জটিল বিষয় নিয়ে হয় তা হলে তো কথাই নেই।

ওই যে দেখলাম প্রমোটারে সামান্য পরিবর্তন হলে তা অনেক ঘটনা প্রবাহের জন্ম দিতে পারে, তার সার্বিক ফলশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হয়। এমনটি হবার একটি উদাহরণ নেয়া যাক। বিবর্তনের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটেছে অতি ধীরে এবং তাও অতীতে। সেগুলোকে চাক্ষুষ করা যায়না। তাই বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে না নিয়ে উদাহরণটি নেয়া যাক আজকের দিনের প্রাণী প্রজননকারী মানুষদের ব্যবহৃত পদ্ধতি কৃত্রিম নির্বাচন থেকে। নানা গুণ সম্পন্ন কবুতর, কুকুর ইত্যাদি প্রজনন করিয়ে থাকেন এমন মানুষরা সুনির্দিষ্ট গুণ সম্পন্ন ওই প্রাণীকে বাছাই করে সেগুলোর মধ্যে প্রজনন করান। এরকম কেউ কেউ শেয়ালের খামার গড়ার জন্য এমন শেয়াল প্রজনন করাতে চেয়েছেন যাদের স্বভাব হবে অপেক্ষাকৃত নম্র ও পোষ মানা– অনেকটা কুকুরের মত। এ জন্য তাঁরা বন্য শেয়াল থেকে বেছে বেছে এরকম নম্র স্বভাবের কিছু বেছে নিয়ে ওদের মধ্যে প্রজনন করিয়েছেন, এবং প্রত্যেক প্রজন্মে আবারো একই ভাবে বাছাই করতে করতে অনেকটা নম্র ও পোষমানা

স্বভাবের শেয়াল পেয়ে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো শুধু নম্র স্বভাবের জন্য বাছাই করেই তাঁরা এসব প্রজননকৃত শেয়ালের মধ্যে আরো কিছু গুণ ফাউ হিসেবে পেয়ে গেছেন। যদিও সেসব গুণের জন্য আদৌ বাছাই করা হয়নি তবুও এসব শেয়াল চেহারা আর অবয়বের দিক থেকেও অনেকটা পোষমানা কুকুরের মত হয়ে পড়েছে– গায়ের লোমে, চোয়াল অনেকটা চাপা হওয়াতে, লেজ ওপরের দিকে বাঁকা হওয়াতে, কান নিচের দিকে ঝুলে পড়াতে ইত্যাদি। এতে বোঝা যাচ্ছে যে নম্র স্বভাব বাছাই করতে গিয়ে এমন কিছু ব্যতিক্রমী প্রমোটার বাছাই হয়ে গেছে যে যার প্রভাব শুধু ওই নম্র হবার জিনের ওপর নয় আরো অনেক জিনের ওপর পড়ে সেগুলোর প্রকাশকে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে– যেমন লোমের জিনকে এক ভাবে প্রকাশিত হতে দিয়েছে, অন্য ভাবে দেয়নি; চোয়ালের জিনকে এমন ভাবে প্রকাশ করেছে যে তাকে বেশি সামনের দিকে বাড়তে দেয়নি, যথাযথ জিন প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে লেজকে শুধু ওপরের দিকে আর কানকে শুধু নিচের দিকে বাড়তে দিয়েছে ইত্যাদি। প্রমোটারে সামান্য পরিবর্তন যে কীভাবে অন্য নানা ঘটনা প্রবাহের জন্ম দিয়েছে তা এই উদাহরণে একেবারে চাক্ষুষ দেখা গেল।

জিনপ্রকাশ ব্যবস্থার একটি অদ্ভুত গুণ হলো এটি বিভিন্ন জিনের সুইচ কখন অন্ হবে, কখন অফ্ হবে, কত সময় অন্ বা অফ্ থাকবে এসবের সময় নির্ধারিত করে দিতে পারে। যেমন নম্র স্বভাবের শেয়াল প্রজননের উদাহরণে যে রকম শেয়াল শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে এক কথায় তাকে বলা যায় যে পূর্ণ বয়স্ক শেয়ালের চেহারাতে ও স্বভাবে বাচ্চা শেয়ালের বৈশিষ্টগুলো রক্ষিত হয়ে রয়ে গেছে, বদলিয়ে বয়স্কের মত হয়নি। সেই ঝুলে পড়া কান, চাপা চোয়াল, ফুর্তি করে খেলাধূলা ইত্যাদি বাচ্চার বৈশিষ্ট হলেও এক্ষেত্রে এই বয়স্ক শেয়ালেও তাই রয়ে গেছে। নম্র স্বভাব বাছাই করতে গিয়ে বয়স্ক হবার এসব লক্ষণের জিনপ্রকাশের তথা বৈশিষ্ট বদলাবার গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে বাচ্চার বৈশিষ্ট থেকে গেছে বলেই এমন হয়েছে।

জিনের প্রকাশের এরকম সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি মানুষের বিবর্তন সম্পর্কেও কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর এনে দিয়েছে। খুবই সম্প্রতি মানুষ ও শিম্পাঞ্জির সম্পূর্ণ ডিএনএ উদ্ঘাটনের পর দেখা যাচ্ছে উভয়ের মধ্যে জিনের পার্থক্য

অত্যন্ত কম– মাত্র ১.২%। প্রাণী জগতের একই শাখা থেকে উভয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে, ৫০-৬০ লক্ষ বছর আগে। তাই একই পূর্বপুরুষের জিন উভয়ে ধারণ করছে, খুব একটি পৃথক হতে পারেনি। অথচ এই প্রায় অভিন্ন জিনের মোট ফলটি কিন্তু শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য নিয়ে এসেছে। এই পার্থক্য ঘটিয়েছে জিনের নয়, বরং জিনের প্রকাশের ভিন্নতা– যা ঘটেছে ওই প্রমোটার ইত্যাদির দৈবাৎ পরিবর্তনে। সেটিই সৃষ্টি করতে পেরেছে পৃথক মানব গুণাগুণের এরকম সুদূরপ্রসারী ফলাফলের। জিন প্রকাশের বিষয়গুলো এখন ক্রমে উদ্ঘাটিত হচ্ছে।

জিন প্রকাশের পরিবর্তনগুলো জিনের পরিবর্তনের মত নয়, কারণ ডিএনএতে A,C,T,G, এই চারটি বেইসের কোন্‌টির পর কোন্‌টি আছে সেই বেইসক্রমের কোন পরিবর্তন এতে হয়না। যা ঘটে তা অন্য ভাবে হয়, তাই একে বলা হয় 'এপিজেনেটিক'। শব্দটির মানে হলো জেনেটিকের অতিরিক্ত। এপিজেনেটিক ব্যবস্থাগুলোও সন্তান বাবা-মা থেকে পেতে পারে, কিন্তু তা জিনের মত সন্তানের মধ্যে অপরিবর্তিত থাকবে, বা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মোটামুটি একই থাকবে এমন কথা নেই। বরং মায়ের গর্ভে সন্তান ভ্রূণ অবস্থা থেকে ভূমিষ্ঠ হবার আগে পর্যন্ত, জন্মের পর শৈশবে, এমনকি কিছু পরিমাণ তারও পরে এতে পরিবর্তন ঘটতে পারে। আর এই পরিবর্তনগুলো জিনের প্রকাশে যথেষ্ট তারতম্য আনতে পারে যাতে করে চূড়ান্ত ফলে গিয়ে প্রচুর এদিক-ওদিক হতে পারে। এটি অবশ্য সবচেয়ে বেশি ঘটে মায়ের গর্ভে।

মায়ের গর্ভে একটি মাত্র কোষ বিভাজিত হয়ে হয়ে যখন ভ্রূণ গড়ে সে পর্যায়ে কোন জিনের সুইচ অন্‌ থাকা এবং কোন জিনিসের অফ্‌ থাকা যে অপরিহার্য তা আমরা দেখেছি। শরীরে সব কোষে সব জিন থাকে, কিন্তু সব অঙ্গে সব জিন চালু রাখা উচিত নয়। প্রথম পর্যায়ে ওই অল্প কিছু কোষে সব একই রকম থাকে– কোনটি হাতের, কোনটি পায়ের, কোনটি মস্তিষ্কের কোষ সেভাবে বিভাজিত থাকেনা (তাই সেগুলোকে বলা হয় স্টেম সেল)। কিন্তু এর পর পরই ভ্রূণ তৈরি হতে ওই রকম বিভাজনের প্রয়োজন হয়। তখন মস্তিষ্কের কোষে শুধু মস্তিষ্কের জিনগুলোকে অন্‌ রাখতে হয় লিভারের বা

হার্টের জিন নিশ্চয়ই সেখানে কাজ করেনা তাই সেগুলোকে অফ্ রাখতে হয়। এপিজেনেটিক ব্যবস্থায় জিনকে অফ্ করার উপায় হলো কিছু 'দমনকারী' (সাপ্রেসর) প্রোটিনের জিনটির প্রান্তিক অংশে থাকা 'নীরবকারীর' (সাইলেন্সার) ডিএনএ'র সঙ্গে যুক্ত হওয়া। আর ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর প্রোটিন কীভাবে 'প্রমোটারের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুইচ্ অন্ করে তা আমরা আগেই দেখেছি। অন্যান্য ক্ষেত্রে পুরো অন্ বা পুরো অফ্ না করে জিনকে নানা মাত্রায়ও প্রকাশ করা হয়।

ভ্রূণ গঠনে কোন্ কোষে কোন্ কোন্ জিন প্রকাশিত হবে তা সুনির্ধারিত হলেও জিন প্রকাশে যে পরিবর্তন এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ায় ঘটে থাকে তার অধিকাংশ ইতস্তত দৈবক্রমেই ঘটে, কোন স্পষ্ট কারণ ছাড়াই– নেহাত একটি চান্সের ব্যাপার। ওই যে অভিন্ন যমজের দু'জনের মধ্যে জিন শত ভাগ এক হওয়া সত্ত্বেও এমনকি পরিবেশও প্রায় একই হওয়া সত্ত্বেও যে আচরণ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু কিছু অমিল দেখা যায় তার অধিকাংশ এরকম দৈবাৎ এপিজেনেটিক পরিবর্তনের ফল– এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক দিকে। এর অধিকাংশই ঘটে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন।

দেখা যাক যাকে এপিজেনেটিক পরিবর্তন বলছি তা কোথায় কী ভাবে ঘটে। প্রধানত দুটি রূপে এই পরিবর্তন ঘটে– একটি হলো জিনের ডিএনএ'র সঙ্গে একটি রাসায়নিক পদার্থর সংযোগে, বিশেষ করে মিথাইল গ্রুপের সংযোগে; অন্যটি হলো ক্রোমোজোমে হিস্টোন নামে যে প্রোটিনের আশ্রয়ে ডিএনএ বান্ডিল আকারে গুটিয়ে থাকে তাতে পরিবর্তনে। মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হয়ে যা হয় তাকে বলা হয় মিথাইলেশন। বেইস চারটির মধ্যে A এবং C এর সঙ্গে মিথাইল গ্রুপ নানা কারণে যুক্ত হয়, আবার নানা কারণে তা খসেও যায়। অর্থাৎ নানা কারণে মিথাইলেশন বাড়ে, আবার মিথাইলেশন কমে। উভয়েরই গুরুত্ব অনেক। যেমন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মিথাইলেশন লোপ পেতে দেখা যায়। মিথাইলেশনের পরিমাণ থেকে বয়স আন্দাজ করা যায়। একটি বাবার থেকে ও একটি মায়ের থেকে পাওয়া প্রত্যেক জিনের যেই দুটি কপি থাকে মিথাইলেশন অনেক ক্ষেত্রে কোন্‌টি বাবার আর কোনটি মায়ের তার জন্য দুটিতে দুই পৃথক রকমের ছাপ রেখে যেতে পারে। মিথাইলেশনের কিছু কিছু

প্রভাব এজন্যও আসে। অন্য দিকে হিষ্টোন প্রোটিনের তারতম্যের কারণে একটি জিন ক্রোমোজোমের কোন্ অংশে আছে সেই তথ্যটি তার প্রকাশে প্রভাব রাখতে পারে। দেখা গেছে যে অংশে জিনগুলো গা ঘেঁষাঘেষি করে ঘন ঘন পর পর আছে সেসব ক্ষেত্রেই ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থানটি প্রকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়। মিথাইলেশন হোক আর হিষ্টোন তারতম্য হোক এগুলো সব সময় শুধু দৈবাৎ না হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে পরিবেশের ওপরও নির্ভর করে– সেটি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন পরিবেশের ওপর সব চেয়ে বেশি, তবে জন্মের পরেও কিছুটা। ক্রমেই যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো পরিবেশের নানা সিগন্যাল মানুষের জিনপ্রকাশ ব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে আচরণের জৈব রাসায়নিক সিগন্যালে অবদান রাখে। ডিএনএ'র এপিজেনেটিক ঘটনাগুলোর মধ্যস্থতাতেই শুধু তা সম্ভব।

পরিবেশের প্রবেশ একই গোলক ধাঁধাঁ দিয়েই

আগে যখন মনে করা হতো যে আচরণের জন্য পরিবেশই দায়ী তখন কিন্তু কী ভাবে দায়ী তার উত্তর হতো খুব ভাসা ভাসা। এখন আমরা জানি যে পরিবেশের সীমিত ভূমিকা এতে আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে পরিবেশটি কাজ করে জিনের এবং এপিজেনেটিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই। এর অর্থ জিনের ও পরিবেশের প্রভাব পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। জিনপ্রকাশের গোলক ধাঁধাঁর মধ্য দিয়েই পরিবেশের প্রবেশ ঘটে। সন্তানের মধ্যে আচরণ সৃষ্টিতে দুটি পর্যায়ে বাইরের পরিবেশ এভাবে ভেতরে আসতে পারে– একটি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন, অন্যটি ভূমিষ্ঠ হবার পর বাকি জীবনে। প্রথম পর্যায়টির গুরুত্ব অবশ্য অনেক বেশি। সেই প্রথম পর্যায়ে গর্ভের ভেতরের স্থানগত পরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি মায়ের পুষ্টি, তাঁর খাদ্য পানীয়ের ধরন এবং আরো বেশি তাঁর মানসিক অবস্থা ও জীবনযাপনের ধরন ইত্যাদিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিক অবস্থায় সব কিছু সাধারণ ভাবেই থাকে বটে কিন্তু যখন এসব পরিবেশে বড় রকমের খারাপ কিছু ঘটে– যেমন গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির দারুণ অভাব, অথবা তাঁর ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ, অথবা তাঁর ধূমপান বা মাদক ব্যবহারের মত ক্ষতিকর অভ্যাস, অথবা গর্ভকালীন গ্রহণ

করা কোন ওষুধের খারাপ প্রভাব– এসবের ফলে, সেগুলো গর্ভস্থ সন্তানের এপিজেনেটিক জিন প্রকাশে দারুণ ব্যত্যয় ঘটায়।

এসব আমরা জানতে পেরেছি এরকম ঘটনার শিকার অনেক মানুষের ওপর সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে পরীক্ষা চালিয়ে। বিভিন্ন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত পুরো সময়ে নানা দেশে বিপুল সংখ্যক গর্ভবর্তী মা চরম অপুষ্টি, আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদিতে ভুগেছে। তাদের পরিস্থিতির একটি গড়পড়তা হিসেবে তখন রাখা হয়েছিলো। ওই সময়ে গর্ভে থাকা বহু সন্তানকে পরে তাদের জীবনে বহু বছর ধরে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের আওতায় রাখা হয়েছিলো। দেখা গেছে যুদ্ধের ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা বহুদিন আগেই কেটে গিয়ে যথেষ্ট শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যেই এই সন্তানরা বড় হয়েও স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হারে স্থূলতা, হার্টের অসুখ ইত্যাদিতে ভুগেছে, সেই সঙ্গে মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও মানসিক রোগের হারও ছিল অনেক বেশি। পরবর্তী জীবন স্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও গর্ভকালীন ওই দুর্যোগ তাদের পিছু ছাড়েনি। আধুনিক উন্নত গবেষণায় দেখা গেছে যে সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মায়ের এরকম পরিস্থিতি ঘটলে সন্তানের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠায় অপরিহার্য একটি জিনে (গ্রোথ ফ্যাক্টর জিন) মিথাইলেশন অনেক কম হয়। এই অপর্যাপ্ত মিথাইলেশনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সন্তান অনেক বড় হবার পর কারণ তা জিনের প্রকাশে দীর্ঘ-মেয়াদী ক্ষতি সাধন করে রেখেছে। এক্ষেত্রে মায়ের 'পরিবেশটি' স্পষ্ট ভাবে দায়ী, কিন্তু সেটি কাজ করেছে সন্তানের এপিজেনেটিক ব্যবস্থায় বাগড়া দিয়ে; জিন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়।

জন্মের পরও পরিবেশের যে সব জিনিস পরবর্তী জীবনে প্রভাব রাখে তার মধ্যে থাকে ভৌত পরিবেশ, দূষণ, ক্ষতিকর ওষুধ, পরিবারে সমাজে বা কর্মস্থলে অতিরিক্ত মানসিক চাপ ইত্যাদি। গর্ভস্থ অবস্থার থেকে এই প্রভাব কম, তবে এগুলোও জিনের প্রকাশকে পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেই কাজ করে। জেনেটিক ভাবে উচ্চ ঝুঁকির মানুষ (যাদের পরিবারে ওই সমস্যা আছে), এবং নিম্ন ঝুঁকির মানুষকে (যাদের পরিবারে ওই সমস্যা নেই) একই পরিবেশে পেলে তাদের ওপর পরিবেশটির প্রভাবের তুলনা করে এটি বোঝা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ অপরাধী কিশোরদের সংশোধনী কেন্দ্রের অস্বাভাবিক

চাপের পরিবেশে দীর্ঘদিন এক সঙ্গে কাটিয়েছে এরকম নানা ছেলের ক্ষেত্রে পরে একটি মানসিক বৈকল্য দেখা দেবার হার তুলনা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে একজন উচ্চ ঝুঁকির ও অন্য জন নিম্ন ঝুঁকির দু'জন কিশোর-অপরাধী যাদের কেউ ওরকম কঠিন সংশোধনী কেন্দ্রে কখনো থাকেনি, সেক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে দু'জনের কারো ওই মানসিক সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখন দুজনেই সংশোধনী কেন্দ্রে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে তখন উচ্চ ঝুঁকির ছেলেটির মধ্যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছে, নিম্ন ঝুঁকির ছেলেটির মধ্যে তা দেখা দেয়নি। এর অর্থ হলো প্রতিকূল পরিবেশের সহায়তা না পেলে মানসিক সমস্যার জিন থাকা না থাকায় কোন তফাৎ ঘটছেনা– ওই জিন কার্যকর হচ্ছেনা। অন্যদিকে পরিবেশ যখন জিনের প্রকাশকে সহায়তা দিয়েছে তখন যার সেই জিন আছে তার মধ্যে এটি কার্যকর হয়েছে।

অভিবাসী মানুষদের দ্বিতীয় প্রজন্মের তরুণরা নতুন দেশে যে মানসিক চাপের সম্মূখীন হয় তার ওপর চালানো কিছু পরীক্ষায়ও ব্যাপারটি ধরা পরেছে। আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ক্যারিবীয়ান অঞ্চলের মানুষরা এক সময় বিপুল সংখ্যায় বৃটেনে অভিবাসী হয়েছিলো। এরকম অভিবাসীদের ওপর এবং নতুন দেশে জন্ম নেয়া তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানদের ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদী পরীক্ষা চালানো হয়েছিলো। দেখা গেছে বিসদৃশ আচরণ করার যে মানসিক অসুখ এর হার এই অভিবাসীদের মধ্যে যতখানি ছিল স্থানীয় বৃটিশ বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও প্রায় সম পরিমাণেই রয়েছে। কিন্তু নতুন দেশে জন্ম নেয়া তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের সন্তানরা বড় হওয়ার পর তাদের মধ্যে এই হার অনেক বেশি দেখা গেছে। এর কারণ মূল অভিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিক হারটিই দেখা গেছে যা যে কোন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে একই পরিমাণে দেখা যায়। এই অভিবাসীদের অধিকাংশের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তাদের মাতৃভূমিতে স্বাভাবিক অবস্থায়, অভিবাসনের সময় তারা জানতো যে তাদেরকে বিজাতীয় পরিবেশ ও বৈষম্যের মধ্যে থাকতে হবে এ নিয়ে তাদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ ছিলনা। তাই অভিবাসী হবার পরও অসুখের এ হারটি স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের পুরো শৈশব কেটেছে বিজাতীয় পরিবেশে নানা বৈষম্যের টানাপোড়েনে; স্থানীয় শিশুদের কাছাকাছি থেকে বড় হওয়াতে এটি

তারা মানতেও নারাজ ছিল তাই তাদের ছিল প্রচণ্ড মানসিক চাপ। তাছাড়া প্রথম শৈশবের পারিবেশিক চাপগুলোই এপিজেনেটিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশি কাজ করে। আগের প্রজন্মের সঙ্গে একই জিন-বৈচিত্রের অধিকারী হয়েও তাই পরিবেশের চাপ তাদের জিন-প্রকাশে বিঘ্ন ঘটিয়েছে, মানসিক অসুখটির হার বাড়িয়েছে। এসব হয়েছে জিন আর প্রতিকূল পরিবেশের বিক্রিয়ায়– একা জিনে এমনটি হতোনা, একা পরিবেশেও হতোনা।

জিন আর পরিবেশের বিক্রিয়া প্রমাণে আরো কিছু পরীক্ষণের কথা উল্লেখ করতে পারি। একটি বিসদৃশ আচরণের জন্য পরীক্ষণে কিছু মানুষকে উচ্চ ঝুঁকির (তাদের পরিবারে আচরণটি দেখা গেছে বলে) ও নিম্ন ঝুঁকির (পরিবারে দেখা যায়নি বলে) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আবার দেখা গেছে যে আচরণটি ধূমপায়ীদের মধ্যে অধূমপায়ীদের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে ধূমপান বিরোধী কার্যক্রমে সর্বসাধারণের জায়গায় ধূমপান নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে দেখা গেল এই বিসদৃশ আচরণের মানুষের সংখ্যা ওখানে হ্রাস পেয়েছে, ধূমপানের সুযোগ কমে যাওয়াতে। কিন্তু আচরণটি কমতে দেখা গেছে প্রধানত উচ্চ ঝুঁকির মানুষের মধ্যে, নিম্ন ঝুঁকির মানুষে এটি আগে যা ছিল তাই রয়ে গেলো। ধূমপানের সুযোগ কমাটি উচ্চ ও নিম্ন ঝুঁকি উভয়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সমান ভাবে ঘটেছিলো তা হলে নিম্ন ঝুঁকির মানুষে পরিবর্তন হলো না কেন? এর কারণ নিম্ন ঝুঁকির মানুষে ওই আচরণের জিনের প্রভাব কম বলে ধূম পান কমার পরিবেশের সঙ্গে তার বিক্রিয়াও কম। কাজেই পরিবেশ তাদের ওপর প্রভাব রাখেনি জিনের কারণেই। পরিবেশ এখানে জিনের প্রভাবটিকে (যা আছে উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে) কমবেশি করতে পারছে।

আবার অন্য পরীক্ষণে আমরা দেখি জিন পারছে পরিবেশের প্রভাবকে কমবেশি করতে। পরীক্ষণে পাওয়া কিছু ফলাফল বলছে যারা শৈশবে শারীরিক-মানসিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের বড় হয়ে অসামাজিক হবার প্রবণতা বেশি। তবে এটি সবার ক্ষেত্রে হচ্ছেনা, হচ্ছে শুধু তাদের ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে একটি বিশেষ নিউরোট্রান্সমিটারের জিন বেশি প্রকাশ পায়। যাদের মধ্যে এই জিন কম প্রকাশ পায় তারা শৈশবে নির্যাতিত

হয়েও বয়স্ক হবার পর অসামাজিক হয়না। জিনের প্রকাশ ভিন্নতা এখানে একটি পরিবেশের (শৈশবে নির্যাতন) প্রভাবকে বদলে দিচ্ছে।

জিন-প্রকাশের ব্যবস্থাটি সত্যি খুব জটিল। এ যেন অনেক ক'টি পরস্পর নির্ভর নিয়ন্ত্রকের সমন্বিত একটি বর্তনীজাল। ধরা যাক একটি জিনের কোন একটি নিয়ন্ত্রক এমন কিছু করলো যাতে জিনটির প্রকাশের মাত্রা বেড়ে গেল। এভাবে ভাল ভাবে কার্যকর হয়ে এই জিনটির কাজের মাধ্যমে যে প্রোটিন তৈরি হলো তা আবার আরেকটি জিনের প্রকাশের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো– যা আবার হয়তো অন্য একটি জিনের প্রকাশকে দমিয়ে দিলো। এই যে জিনের নানা নিয়ন্ত্রক অন্য কিছু জিন, তারা তাদের প্রত্যেকটির কাজের ঘটনা পরম্পরায়ে গোলক ধাঁধার মতই ব্যাপার সৃষ্টি করছে। সাধারণ অবস্থায় এই প্রত্যেক নিয়ন্ত্রকের প্রকাশমাত্রা যেন একটি জায়গায় নির্দিষ্ট করে দেয়া থাকে– যেভাবে আমরা এয়ার-কন্ডিশনিঙে ঘরের তাপমাত্রা এক জায়গায় সেট্ করে দিই অনেকটা সেভাবে। কিন্তু মানুষটি যখন বড় ধরনের কোন পরিবেশ-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় তখন এই সেটিংগুলোর কোন কোনটিকে তা বদলে দিতে পারে। ফলে জিনপ্রকাশের ঘটনা পরম্পরায়ে কিছু পরিবর্তন এমনভাবে আসতে পারে যাতে মূল জিনটির প্রকাশের মাত্রায় পরিবর্তন আসতে পারে। এটি এখনও হতে পারে অথবা পরে কোন নির্দিষ্ট সময়ে। এ যেন পুরানো একটি সেতারের তারগুলোকেই পরিবেশের অভিজ্ঞতা নতুন ভাবে বেঁধে দিচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে সেতারে তোলা সঙ্গীতের ওপর। এ ভাবেই আমরা দেখছি আচরণকে প্রভাবিত করার জন্য পরিবেশ জিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছেনা, বরং ওই জেনেটিক গড়নের মধ্য দিয়েই জিনকে কমবেশি কার্যকর করছে। পরিবেশ থেকে যে অভিজ্ঞতা মানুষ পায় তার কোন কোনটি সারা জীবন প্রভাব রেখে বিশেষ আচরণকে বাড়াতে কমাতে পারে। কোন কোনটি জীবনের বিশেষ বিশেষ সময়ে তা করতে পারে। আবার বেশির ভাগই গোড়াতে একটি সময় নিয়ন্ত্রকগুলোকে স্থায়ী ভাবে এমন সেট্ করে দেয় যে সারা জীবন পরিবেশ যতই বদলাক ওই আচরণ আর বদলায়না।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে জিন আর পরিবেশ

যেই বাবা-মা পাঁচটি সন্তানকে বড় করেছেন তাঁদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানেন না ব্যক্তিত্ব-বৈচিত্র কী জিনিস। পাঁচ জনের সবাই তাঁদের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও, সবাই একই ছাদের নিচে একই পরিবারিক বন্ধনের ভেতর বেড়ে ওঠা সত্ত্বেও, বাবা-মা হাড়ে হাড়ে টের পান যে ওদের সবার ব্যক্তিত্ব এক নয়। ভাইবোনদের মধ্যে জিনের অনেক মিল থেকেও ব্যক্তিত্বের জিনে যথেষ্ট তফাত থাকতে পারে, আর জেনেটিক ও এপিজেনেটিক তারতম্যের কারণে একই পরিবেশের প্রভাবও তাদের সবার ওপর সমান ভাবে দেখা দেয়না। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উপাদানের যে সব জিনের এক একটি সেট বিশেষ ডিম্বকোষ আর শুক্রকোষ থেকে এক এক সন্তান পেয়েছে, তাই মোটামুটি তার ব্যক্তিত্বকে অনেকটা সুনির্ধারিত করে দেয়। তবে কোন কোন বিরল ক্ষেত্রে গর্ভে থাকাকালীন এপিজেনেটিক পরিবর্তন এতে বড় অবদান রাখে। জন্মের পর অবশ্য আর কোন কারণে ব্যক্তিত্ব বড় একটা বদলাতে দেখা যায়না। কোন সময় যদি এ সন্তানকে অন্য পরিবারে, অন্য পরিবেশে লালন পালনও করা হয় মূল ব্যক্তিত্বে তেমন পরিবর্তন ঘটেনা।

একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয় ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন মাত্রার প্রত্যেকটিতে তার অবস্থানের সমন্বয়ে গড়া একটি সার্বিক মিশ্রণ অনুযায়ী। এরকম পাঁচটি মৌলিক মাত্রাকে সাধারণভাবে চিহ্নিত করা হয় যাকে এক কথায় আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বলা হয় ওশেন– ওপেন্‌নেস (খোলা মন), কনসাইন্সাসনেস (বিবেক), এক্‌স্ট্রোভার্শন (বহির্মুখিতা), এ্যাগরিবলনেস (গ্রহণযোগ্যতা) এবং নিউরোটিসিজম (অস্থিতিশীল মানসিকতা)। একজন মানুষের মন কত খোলামেলা ও অন্যের মতামতের প্রতি আগ্রহী, তাঁর বিবেকের ও বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োগ কতখানি, তিনি কতটা বহির্মুখি বা অন্তর্মুখি, অন্যের সঙ্গে কাজ করার মানসিকতা ও তাদের সঙ্গে কেমন মানিয়ে নিতে পারেন, এবং তাঁর মানসিকতার ও আবেগের স্থিতিশীলতা কতখানি; এই সব কিছু মিলিয়ে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। এই মাত্রাগুলোর প্রত্যেকটিকে পরস্পর স্বাধীন মনে করা হয়, অর্থাৎ এদের একটির অবস্থা অন্য কোনটিকে প্রভাবিত করেনা। তাই উদাহরণ স্বরূপ যথেষ্ট অস্থিতিশীল মানসিকতা (নিউরোটিসিজম) নিয়েও

কোন মানুষ অন্যদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্য হতে পারেন। বোঝাই যাচ্ছে এত কিছু নিয়ে যে ব্যক্তিত্ব তার গড়ন একটি জিনের কাজ নয়। এমনকি এর ওই যে পাঁচ মাত্রা তার কোনটিও একটি জিনের সৃষ্টি নয়, বেশ কিছু পৃথক জিনের মিলিত সৃষ্টি। একথা এখন বেশ ভাল ভাবেই প্রমাণিত যে ব্যক্তিত্ব অনেকটা জিনেরই সৃষ্টি। অভিন্ন যমজের দু'জনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রায় হুবহু মিল, সাধারণ যমজের মধ্যে যথেষ্ট মিল, সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বৈচিত্র সত্ত্বেও বেশ কিছু মিল, এবং দত্তক নেয়া ভাইবোনের মধ্যে খুব কম মিল ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে জিনের গুরুত্ব ভালভাবেই প্রমাণ করেছে। ঠিক কোন্ জিনগুলো ব্যক্তিত্বের জন্য দায়ী তা এখনো খুব বেশি উদ্ঘাটিত না হলেও কিছু উদ্ঘাটিত জিনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক দেখা গেছে। এরকম একটি জিনের উদাহরণ দেয়া যাক।

দেখা গেছে যে BDNF নামের একটি জিনের খুব সামান্য হেরফেরে ব্যক্তিত্বের মধ্যে অস্থিতিশীল মানসিকতার পরিমাণে বড় রকমের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। এই জিনটিতে মোট ১,৩৩৫টি বেইসের মধ্যে ১৯২ তম বেইসটি হলো G। কিন্তু দেখা গেছে যে প্রায় ২৫% মানুষের ক্ষেত্রে এই বেইসটি G এর বদলে A হয়। এর ফলে এই জিনটির গড়া প্রোটিনে এখানকার এমাইনো এসিডটি (যা এই বেইস সহ পর পর তিনটি বেইস দিয়ে নির্ধারিত) সাধারণ ক্ষেত্রে ভ্যালাইন (ভ্যাল) হলেও ওই ২৫% ব্যতিক্রমী মানুষদের ক্ষেত্রে তা বদলে গিয়ে মেথিওনাইন (মেথ) হয়ে যায়। যেহেতু প্রত্যেকের কাছে এ জিনের দুই কপি থাকে, তাই যে কোন মানুষের BDNF জিনটি তিন রকম রূপের একটি হতে পারে– দুটি কপিই সাধারণ (ভ্যাল-ভ্যাল), একটি কপি সাধারণ ও অন্যটি ব্যতিক্রমী (ভ্যাল-মেথ), অথবা দুটি কপিই ব্যতিক্রমী (মেথ-মেথ)। দেখা গেছে অস্থিতিশীল মানসিকতা (নিউরোটিসিজম) থাকার সম্ভাবনা সব চেয়ে কম হয় ভ্যাল-ভ্যাল যাদের থাকে তাদের মধ্যে, ভ্যাল-মেথ থাকা মানুষদের মধ্যে এর সম্ভাবনা তার চেয়ে কিছু বেশি, আর মেথ-মেথ থাকা মানুষে এটি যথেষ্ট বেশি। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ঐ ব্যতিক্রমী BDNF জিনকে নিউরোটিসিজমের জিন বলা

যাবে; তবে সম্পর্কটি বেশ স্পষ্ট। অবাক কাণ্ড হলো ১,৩৩৫টি বেইসের মধ্যে একটি মাত্র বেইসের পরিবর্তন ব্যক্তিত্বে এতটা অঘটন ঘটাতে পারে।

ব্যক্তিত্ব গড়াতে জিনের গুরুত্ব যে এতখানি তা কিছুদিন আগেও অনেকে মনে করতেন না। বরং মনে করা হতো সুখী পরিবার, যত্নশীল ভালবাসার মধ্যে লালন-পালন ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুর ভাল ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়; আর মা-বাবার ঝগড়ার সংসার, মায়ের অবহেলা, বাবার দু:শাসন ইত্যাদিই পরে নানা ব্যক্তিত্বের বৈকল্যের জন্য দায়ী। এখন আমরা জানি ব্যাপারটি তা নয়। তবে পারিবারিক আবহের ও ভাল লালন-পালনের পরোক্ষ গুরুত্ব ঠিকই রয়েছে। পরিবার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে না বটে, তবে এর মধ্যে সুখের ও নিরাপত্তার আবহ যার যার সহজাত ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য একটি অনুকূল মঞ্চ দিয়ে থাকে। মঞ্চটি ন্যূনতম পর্যায়েও না থাকলে ব্যক্তিত্ব ঠিকমত বিকশিত না হতে পেরে তাতে বৈকল্যের ভাব আসতে পারে।

তবে প্রয়োজন শুধু ন্যূনতম পারিবারিক আবহটির। ওই ন্যূনতম অবস্থায়ও একটি পরিবারে যদি শিশু গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে তা যথেষ্ট। পরিবারটি যদি বেশি স্বচ্ছল না হয়, বেশি সুখী না হয়, তাতে যদি সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকে তাতেও এই বিকাশে খুব বিঘ্ন ঘটেনা। কিন্তু ওই ন্যূনতম আশ্রয়টি না থাকলে তখনই শুধু বিঘ্ন ঘটে। তাই কেউ সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে এসেছে, গরীব বা প্রান্তিক অবস্থার পরিবার থেকে এসেছে, সমস্যা-ক্লিষ্ট পরিবার থেকে এসেছে, এ জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশ কম হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। অন্য দিকে খুবই সুখী, সফল বা ধনী পরিবার থেকে আসলেই কেউ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব নিয়ে আসবে তাও নয়। একে ভিটামিন সি'র প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। শরীরের জন্য ন্যূনতম যে ভিটামিন সি প্রয়োজন তা না পেলে নানা অনর্থ বাধে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সামান্যটুকুর অতিরিক্ত গ্রহণ করলে বাড়তি লাভ বড় একটা হয় না। কারণ জিনই আসলে ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে নির্ধারণ করে।

ন্যূনতম পারিবারিক আশ্রয়টুকু না থাকলে ব্যক্তিত্বের ক্ষতি কেন হয়? পরিবেশের চাপ যখন একটি উর্ধ্ব সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন সাধারণত

পরিবেশের প্রতি নির্লিপ্ত এপিজেনেটিক ব্যবস্থা আর নির্লিপ্ত থাকেনা। জিন-প্রকাশে তারতম্য ঘটিয়ে এটি ব্যক্তিত্ব বিকাশে তখন বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এই এপিজেনেটিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারটি কিন্তু অহরহ ঘটেনা, খুবই ব্যতিক্রমী পারিবেশিক চাপের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে– কোন রকম একটি পারিবারিক বন্ধনে বড় হতে না পারা সে রকমই একটি ব্যতিক্রমী চাপ। তা ছাড়া গর্ভে থাকাকালীন মায়ের ওপর কোন প্রচণ্ড মানসিক চাপ, বা খুব ছোটবেলায় নিজের ওপর প্রচণ্ড চাপও এরকম ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে।

কোন্ বৈশিষ্ট কতখানি বংশগত আর কতখানি অন্যকিছুর প্রভাবে সৃষ্ট সেটি কী ধরনের প্রশ্নের উত্তর থেকে জানা যায়? যেমন আমরা যদি জানতে চাই কোন একজন ব্যক্তি এত লম্বা কেন– কতখানি বংশগত কারণে, আর কতখানি পুষ্টি, ব্যায়াম ইত্যাদির কারণে, সেটি সঠিক ভাবে নির্ণয় করা সহজ হবেনা। কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি একটি বড় দলের সব মানুষদের মধ্যে লম্বা-বেঁটে হবার যে বৈচিত্র তার কতখানি সেই মানুষদের জিন-বৈচিত্রের ওপর নির্ভর করেছে সে উত্তরটি অনেকটা নিখুঁত ভাবে দেয়া সম্ভব ওদের ওপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে। এসব গবেষণা সাধারণত হয় ওই দলের মধ্যে অনেক অভিন্ন যমজ, অনেক সাধারণ যমজ, অনেক সাধারণ ভাইবোন, এবং অসম্পর্কিত মানুষের মধ্যে লম্বা হবার মিল-অমিলের তুলনা করে; অনেক পরিবারে বাবা-মার নিজের সন্তান ও পোষ্য সন্তানদের মধ্যে সে রকম তুলনা করে; এবং এ ধরনের আরো যে সব গবেষণা আমরা দেখেছি তার মাধ্যমে। এসবের গড়পড়তা ফলাফল থেকে ওই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়। এতে লম্বা হবার বৈচিত্রটির কত শতাংশ বংশগতির বৈচিত্রের কারণে হয়েছে তা জানা যায়, আর তাকে বলা হয় লম্বা হবার ক্ষেত্রে 'বংশগতির অনুপাত' (হেরিটেবিলিটি)। এই অনুপাত যত বড়, বংশগত প্রভাবের অবদান তত বেশি। যে কোন বৈশিষ্টের বংশগতির অনুপাত এভাবে বের করা যায়।

একজন মানুষের কোন বৈশিষ্টে বংশগতির কত শতাংশ অবদান এই তথ্য, আর দলের মধ্যে এর 'বংশগতির অনুপাত' কত এই তথ্য এক জিনিস নয়। একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি দেখা যাক। আমাদের দুই হাতে আঙ্গুলের সংখ্যা যে দশ সেটি বিবর্তন থেকে পাওয়া জিনের ব্যাপার। অন্য কোন

কারণে এই সংখ্যা দশ হয়না। তাই যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমার দশ আঙ্গুলের জন্য জিনের প্রভাব কত শতাংশ, নির্দ্বিধায় বলবো ১০০%। কিন্তু সব মানুষের আঙ্গুলের সংখ্যার বৈশিষ্টের বংশগতির অনুপাত যদি আমরা জরিপ চালিয়ে বের করি দেখবো এক্ষেত্রে জিন-বৈচিত্র খুবই কম, কারণ জিন-বৈচিত্রের কারণে (জন্মগত ভাবে) আঙ্গুলের সংখ্যা দশের বদলে অন্য কিছু হবার ঘটনা খুবই বিরল। কিন্তু দুর্ঘটনা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি কারণে দশের কম আঙ্গুল হবার ঘটনা সে তুলনায় নেহাৎ কম নয়। আঙ্গুল সংখ্যার এই বৈচিত্র জিন-বৈচিত্রের কারণে তেমন ঘটেনা বলে এর বংশগতির অনুপাত হবে অল্প কয়েক শতাংশ মাত্র। দুটি প্রশ্নের উত্তর একেবারে বিপরীত ফল দিচ্ছে। সব বৈশিষ্টের ক্ষেত্রেই জিনের অবদান জানতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো বংশগতির অনুপাত। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই অনুপাত প্রায় ৫০% এর কোঠায় বলে প্রমাণিত হয়েছে– যেটি যথেষ্ট উচ্চ।

যে বৈশিষ্ট একটি জিনের সৃষ্টি না হয়ে অনেক জিনের সৃষ্টি তার বংশগতির অনুপাত বেশি হয়– সে কারণেও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটি উচ্চ। কোন বৈশিষ্ট যদি সরাসরি জিনের সৃষ্টি নয় বরং তার একটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় তখনো এর বংশগতির অনুপাত কিছুটা গুরুত্বে দাবী রাখে। অপরাধ-প্রবণতা এমনি একটি বৈশিষ্ট। এটি সরাসরি ব্যক্তিত্বের অংশ নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের একটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পরিবারের মধ্যে একের অপরাধ-প্রবণতা থাকার সঙ্গে অন্যের মধ্যে এর থাকার সম্ভাবনাকে সম্পর্কিত করা যায়না। কিন্তু সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে দেখলে একটি দলের মধ্যে বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের জেনেটিক বৈচিত্রের সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার বৈচিত্রের সম্পর্ক দেখা যায়। এমন কিছু বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা বংশগত বা অন্য কারণে কারো থাকলে তার অপরাধ-প্রবণ হবার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এর কারণ ওই ধরনের ব্যক্তিত্বের মানুষ সুযোগ পেলে অপরাধ করতে প্রলুব্ধ হয়; অবশ্য সুযোগ না পেলে সেটি ঘটতে পারেনা– যেমন আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় কড়াকড়ি থাকলে। ওই বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের এপিজেনেটিক কারণ আবার চরম ক্ষেত্রে পরিবেশের ওপর নির্ভর করে– যেমন গর্ভাবস্থায় মায়ের চরম অপুষ্টি বা মানসিক চাপ, নিজের ড্রাগ ঘটিত মানসিক চাপ, ইত্যাদি। অবশ্য চরম ক্ষেত্র

ছাড়া বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্বের ওরকম পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সাধারণ জিন-বৈচিত্রের ব্যাপার, পরিবেশের নয়।

আর একটি আচরণ আমরা এখানে আলোচনা করবো যা সরাসরি ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়েনা কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি বরং সচরাচর দেখা যাওয়া একটি মানসিক অসুখ 'স্কিজোফ্রেনিয়া'। আগোছালো চিন্তা, আজগুবি চিন্তা, অন্যকে অকারণ সন্দেহ, চিন্তা-আবেগ-আচরণ এসবের পরস্পর সম্পর্কহীনতা ইত্যাদি লক্ষণ নিয়ে আসা এই অসুখকে 'বিভক্ত-মন'ও বলা হয়। দেখা গেছে যে প্রায় সব জাতিগোষ্ঠিতে একশ' জনের মধ্যে এক জন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় নানা তীব্রতায়। এর বংশগতির অনুপাত খুবই বেশি, প্রায় ব্যক্তিত্বের মতই। তবে এই ক্ষেত্রে পারিবেশিক প্রভাবটিও খুব জোরালো। অনেকেই মনে করেন জিন আর পরিবেশ এই দুইয়ের সমন্বিত কাজের উদাহরণ হিসেবে বিভক্ত-মনের তুলনা হয়না। প্রধানত বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্বের প্রভাবে এক সময় মনে করা হতো যে শৈশবে ভগ্ন পরিবার মায়ের অযত্ন, বাবার অত্যাচার ইত্যাদিই পরে বিভক্ত-মন অসুখটির সৃষ্টি করে। এর ওপর ভিত্তি করেই ফ্রয়েড ওই অপ্রিয় স্মৃতিগুলোকে সামনে এনে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু এখন আধুনিক বিজ্ঞান এই ব্যাখ্যা বা এই পদ্ধতিকে সমর্থন করেনা কারণ এ ধরনের অসুখের জন্য দায়ী যে প্রধানত জিন তা ভাল ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। আর অন্য যে জিনিসগুলো দায়ী তা পরিবেশের অন্য কিছু উপাদান– শৈশব নির্যাতন বা অযত্ন নয়। শৈশবে দারুণ অযত্ন বা নির্যাতনের মত গুরুতর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেলে স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা নানা ভাবে বাধাগ্রস্ত হয় বটে, তবে তা বিভক্ত-মনের মত মানসিক অসুখ সৃষ্টি করে না। এ অসুখের জন্য পরিবেশের দিক থেকে যে জিনিসগুলোর প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে তার মধ্যে আছে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের ওপর প্রচণ্ড মানসিক চাপ, শৈশবে কোন কোন রোগের সংক্রমণ, কোন কোন ওষুধের গুরুতর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, এবং অবশ্যই মাদকের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। তবে পরিবেশের এই জিনিসগুলোর কোনটিই নিজের থেকে এ অসুখ সৃষ্টি করতে পারেনা যদি না অসুখটির জিন বংশগতির মাধ্যমে মানুষটির মানসিকতায় ইতোমধ্যে জাল

পেতে না রাখে। পরিবেশের ওই প্রভাবগুলোকে জটিল জিন-প্রকাশ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়– তাকে জালই বলি আর গোলক ধাঁধাই বলি।

অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা হয়েছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ইতিহাস গড়া প্রতিভাবান ব্যক্তিকে জীবনের কোন পর্যায়ে বিভক্ত-মন অসুখটিতে ভুগতে দেখা গেছে। পূর্ণরূপে এই অসুখে না ভুগলেও অন্তত অস্থিতিশীল মানসিকতার উচ্চ মাত্রাতে তাঁদেরকে দেখা গেছে। অন্য কিছু প্রতিভাবানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা হয়েছে যে তাঁদের অনেকের নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় এই অসুখ দেখা গেছে– যেমন সাহিত্যিক জেমস জয়সের, বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের, দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নিকটাত্মীয়ের এ অসুখ ছিল। এতে মনে করার কারণ আছে যে প্রতিভাকে উচ্চকিত করে যে জিন আর বিভক্ত-মনের জন্য দায়ী জিনের মধ্যে কোন দিকে কোন একটি সম্পর্ক আছে। অধিক সৃজনশীল ও প্রতিভা সম্পন্ন মানুষের মধ্যে জরীপে বিষয়টি বেশ ধরা পড়েছে। নানা জরীপের সমন্বয়ে দেখা যায় বড় মাপের কবিদের ৮৭% (বিখ্যাত উদাহরণ জন ক্লেয়ার), চিত্রশিল্পীদের ৭৩% (ভ্যান গগ), ঔপন্যাসিকদের ৭৭% (হেমিংওয়ে), সুরকারদের ৬০% (বীটাফোন), বিজ্ঞানীদের ২৮% (নিউটন) এই মানসিক রোগে কমবেশি জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ভুগেছেন। প্রতিভার সঙ্গে বিভক্ত-মন অসুখের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করার জন্য সম্প্রতি একটি তত্ত্ব কিছুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মতে বিভক্ত মনের জন্য দায়ী জিনগুলো আসলে কিছু জিনের উপকারী মিউট্যাশন। এগুলোর সঠিক সমন্বয় তাই কাউকে প্রতিভাবান করে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু এই জিনগুলোর প্রকাশ আবার অনেক বেশি তীব্রতায় গেলে এবং একজনের মধ্যে এসে ভীড় করলে এগুলোর সমন্বিত ফল নেতিবাচক হতে শুরু করে। সৃজনশীল চিন্তা তখন আজগুবি চিন্তায় পরিণত হয়, চিন্তার আত্মকেন্দ্রিকতা দেখা দেয়, চিন্তা-আবেগ-আচরণ তাদের সমন্বয় হারায়; যার সবই বিভক্ত-মনের লক্ষণ। এই অবস্থায় পৌঁছার সঙ্গে তুলনা করা যায় যখন পর্বতারোহী ক্রমেই উঠতে উঠতে পর্বতের বিপজ্জনক কিনারায় এসে উপস্থিত হন– এর পরেই পতন।

মেধা, পরিবেশ, শিক্ষা

বুদ্ধিমত্তার প্রশ্ন যখন ওঠে তখন জন্মগত মেধা আর অনুকূল পরিবেশ এই দুইয়ের তুলনামূলক গুরুত্বের কথা বার বার উঠতেই থাকে। বিশেষ করে স্কুলে সাফল্যের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাল ফলে হলে কখনো মেধাকে, আবার কখনো পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশকে কৃতিত্ব দিতে দেখা যায়; আবার অতিরিক্ত খারাপ ফল হলে এই দুটিকেই খারাপ বলে দায়ী করা হয়। আসলেও ফলাফলের ওপর উভয়ের যে প্রভাব আছে সে কথা ঠিক, তবে যেভাবে মনে করা হয় ঠিক সেভাবে নয়। অন্যান্য বৈশিষ্টের মত বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রেও একই সব পদ্ধতিতে বংশগতির অনুপাত বের করা হয়েছে এবং তাতে বংশগতির উচ্চ প্রভাব দেখা গেছে। অবশ্য ব্যক্তিত্বের ওপর জিনের যত প্রভাব বুদ্ধিমত্তার ওপর প্রভাব তার চেয়ে কম। মেধার গুরুত্ব স্পষ্ট। কিন্তু মেধা ছাড়া এতে অন্য নানা রকম জিনিসের গুরুত্ব যেটি যেভাবে আসে তা খুব সোজাসাপ্টা নয়। তার মধ্যে আমরা অন্তর্ভূক্ত করতে পারি পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা, চর্চা ইত্যাদিকে। ব্যক্তিত্বের মত অধিক সহজাত বৈশিষ্টের তুলনায় বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে জিন-বহির্ভূত এই শেষোক্ত জিনিসগুলোর গুরুত্ব স্পষ্টত অনেক বেশি হলেও তার কোন্টি কীভাবে এবং কতখানি অবদান রাখে তা এখনো ভাল করে জানা যায়নি। এর যেটুকু জানা গেছে তাও তুলনামূলক গবেষণার মাধ্যমে। একই রকম জিনের অধিকারী (যেমন অভিন্ন যমজে) দু'জন যখন খুবই ভিন্ন পারিবারিক পরিবেশ, যত্ন ও শিক্ষার মধ্যে বড় হয় তখন বুদ্ধিমত্তার ও স্কুলে সাফল্যের দিক থেকে তাদের তুলনা করে এসবের প্রভাব কিছুটা জানা সম্ভব।

বুদ্ধিমত্তার পরিমাপের ক্ষেত্রে আই কিউ পরিমাপটিকে সাধারণ বুদ্ধির একটি নির্দেশিকা হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এবং এর এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আছে। দেখা গেছে আই কিউ বৈচিত্রতে বংশগতির অনুপাত যথেষ্ট। তেমনি স্কুলে বিভিন্ন পর্যায়ে সাফল্যের ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র তার সঙ্গে ওখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের জিন-বৈচিত্রের একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক সম্পর্ক আছে। তবে বুদ্ধিমত্তার জিন বলা যায় এমন কোন জিন উদ্ঘাটনের চেষ্টা এখনো তেমন সফল হয়নি। এরকম ক্ষেত্রে সাধারণত যেই জাতীয় গবেষণার সাহায্য

নেয়া হয়, তা বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে জানতে খুব সহায়ক হয়নি। যেমন বুদ্ধিমত্তার কোন জিন খুঁজে পাওয়ার একটি উপায় হতে পারতো বুদ্ধিপ্রতিবন্ধীদের মিউট্যাশন হওয়া বিকল জিনটি উদ্ঘাটন করে, তার থেকে এর সুস্থ প্রতিরূপটি পাওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এ পর্যন্ত সে রকম সম্ভাব্য নানা বিকল জিনে নানা ভিন্ন রূপের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার কোন হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়নি। আরেকটি অনুমান করা হয়েছে যে মস্তিষ্কে স্নায়ুকোষের মধ্যে যে বার্তা চলাচল তার গতি নির্ধারক জিনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার একটি সম্পর্ক থাকতে পারে। এক্ষেত্রেও সে রকম সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। একটি জিনের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু সম্পর্ক দেখা গেছে সেটি হলো মস্তিষ্কে গ্রে-ম্যাটার (ঘিলু) নামে পরিচিত অংশের আনুপাতিক আয়তনের নির্ধারণকারী জিনের সঙ্গে।

অবশ্য জেনেটিক প্রভাবের অতিরিক্ত এপিজেনেটিক প্রভাবটিও বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন গর্ভে থাকার সময় মায়ের মারাত্মক অপুষ্টি, শারীরিক ও মানসিক দুর্যোগ এবং প্রচন্ড মানসিক চাপ সন্তানের বুদ্ধিমত্তায় নেতিবাচক প্রভাব রাখতে দেখা গেছে। দেখা যাচ্ছে পরিবেশের প্রভাবটি এক অর্থে জন্মের আগেই শুরু হয়ে যায়। জন্মের পরের পরিবেশের প্রভাবও আছে, তবে তা যে মোটেই সরল রৈখিক নয় তাও বেশ প্রমাণিত। এর মানে এটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ শুধু প্রান্তিক পর্যায়ে যেখানে পরিবারে আদৌ খেয়েপরে টিকে থাকার ও সন্তানকে শিক্ষার মধ্যে রাখার প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয় সেখানে। এরপর পারিবারিক আবহের স্বচ্ছলতা ও গুণগত মানের বৃদ্ধি বুদ্ধিমত্তার বিকাশকে সাহায্য করলেও তা আর তত গুরুত্বপূর্ণ থাকেনা– ওসব দ্বিগুণ হলে যে বুদ্ধিমত্তা যে দ্বিগুণ হবে বা পাঁচ গুণ হলে বুদ্ধিমত্তা পাঁচগুণ হবে তা মোটেই নয়। বরং একবার ন্যূনতম একটি পরিবেশ পাওয়ার পর বুদ্ধিমত্তার সহজাত জিনসৃষ্ট প্রবণতাটি যথারীতি কাজ করতে পারে, এবং সেটিই প্রাধান্য পায়। তাই মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সমৃদ্ধতর জীবন, উচ্চতর সুযোগ এবং আরো শিক্ষানুরাগী পরিবেশ সন্তানদের সাফল্য শুধু কিছুটা বাড়ায়– বিশাল পরিবর্তন ঘটায়না। এই কারণে নেহাতই সাধারণ সংগ্রামী পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে উল্লিখিতদের সঙ্গে প্রায়

সেয়ানে সেয়ানে বুদ্ধির ও শিক্ষার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারে– এবং উভয় ক্ষেত্রে সাফল্যের বৈচিত্র প্রায় একই রকম দেখলে অবাক হবার কিছু নেই।

সমস্যা হয় সেই ন্যুনতম পরিবেশটুকু না পেলে। তাই দেশের সবার বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষার মান বাড়াতে হলে সব চেয়ে বেশি মনোযোগ এখানেই দিতে হয়– কেউ যেন এই ন্যুনতম থেকে বঞ্চিত না হয়। পরিবারকে যখন দুবেলা খাওয়া পরার জন্য, টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, দারিদ্র সীমার উপরে যাওয়া যখন কিছুতেই সম্ভব হয়না, শিক্ষার সুযোগ যখন একেবারেই তার নাগালের বাইরে থাকে, তখন আর সহজাত মেধা কাজ করেনা। জিনসৃষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ তখন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে সামান্য উন্নতি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি বয়ে আনতে পারে। এই বিষয়টি শুধু বুদ্ধিমত্তা বা শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, ব্যক্তিত্ব বিকাশ সহ আরো অনেক কিছুতে দেখা যায়। ন্যূনতম পরিবেশটি খুব জরুরী, তার ওপরে যত যাবে তত ভাল, কিন্তু তখন আর ওটি সমানুপাতিক ভাবে বাড়াবেনা। কম স্বচ্ছল ও কম সুবিধাভোগী পরিবারে এসবের বিকাশে তাই পরিবশেটাই গুরুত্বপূর্ণ; সেটি ন্যূনতম পর্যায়ে অর্জিত হলে তারপর মেধার জিন-বৈচিত্রটি ধরা পড়ে। অন্য দিকে মধ্যবিত্ত, স্বচ্ছল, সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারে পরিবেশের হ্রাস-বৃদ্ধি তেমন কিছু পরিবর্তন আনেনা– বরং জিন-বৈচিত্রই এখানে চূড়ান্ত ফলাফলে বেশি প্রতিফলিত হয়। তাই শিল্পোন্নত যে দেশগুলোতে প্রায় সব বাসিন্দাই মোটামুটি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত কোনদিক থেকে তেমন সুবিধাবঞ্চিত কেউ নয়, সেখানে বুদ্ধিমত্তার সাফল্য শুধু জিন-বৈচিত্রের ওপর নির্ভর করে, অন্য কিছুর ওপর তেমন নয়। অন্যদিকে যেখানে প্রচুর মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে সেখানে বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ জিন-বৈচিত্রের চেয়ে দারিদ্র দূরীকরণের ওপরেই বেশি নির্ভর করে।

বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গে আরো একটি জিনিস গবেষণায় ধরা পড়েছে। পরিবেশের প্রভাবটি বুদ্ধিমত্তার ওপর শুরুতে অনেক বেশি থাকে পরে কমে যায়। এটি সব চেয়ে বেশি থাকে মায়ের গর্ভে, যদি মাকে বড় রকম শারীরিক ও মানসিক সংকটের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। জন্মের পর বয়স যতই বাড়ে পরিবেশের প্রভাব ততই কমতে থাকে, বয়স্ক হবার পর থাকেনা বল্‌লেই চলে। এর

কারণটিও প্রায় একই রকম। খুব অল্প বয়সে, বিশেষ করে মায়ের গর্ভে থাকার সময় পরিবেশের সামান্য অবনতি অনেক বড় এপিজেনেটিক পরিবর্তন ঘটতে পারে, যা বেশি বয়সে আর পারেনা। অন্যদিকে জিনের প্রকাশে কোন স্থায়ী বিড়ম্বনা না ঘটলে জিনের প্রভাব কিন্তু সারা জীবন একই থাকে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ ইত্যাদির সময়ে যারা মায়ের গর্ভে ছিল, বা তখন যাদের প্রথম শৈশব কেটেছে, তাদের ওপর বেশ কিছু দীর্ঘমেয়াদী গবেষণায় কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। দেখা গেছে ওদের মধ্যে যারা ওই পরিস্থিতিতে মা-বাবা হারিয়ে যুদ্ধ-পরবর্তী কঠিন পরিবেশে অনাথাশ্রমে বড় হয়েছে বা সংকটে থাকা আত্মীয় বাড়িতে বড় হয়েছে তারা শৈশবে স্কুলের শিক্ষায় মোটেই ভাল করতে পারেনি। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাতে গিয়ে তারাই আবার আগের পিছিয়ে পড়াকে অতিক্রম করে বুদ্ধি- বৃত্তিক জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেকে প্রতিভার স্বাক্ষরও রেখেছে। স্পষ্টত পরিবেশেটি ছোটবেলায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেও বেশি বয়সে আর গুরুত্বপূর্ণ থাকেনি, তখন সহজাত মেধাই কথা বলেছে, যা তাদের অনেকের মধ্যে বরাবরই ছিল।

বুদ্ধিমত্তার জিনের ব্যাপারে ক্রমেই বোঝা যাচ্ছে যে এর সঙ্গে সম্পর্কিত সাফল্যের যে জিন তা সরাসরি বুদ্ধির নয়। বরং একে বলা যায় কোন বিশেষ ধরনের সাফল্যের জন্য এক প্রকার মানসিক চাহিদার জিন। তাই যে ছাত্র লেখাপড়ায় মেধার পরিচয় দিচ্ছে তার মধ্যে আসলে রয়েছে লেখাপড়া থেকে আনন্দ ও তৃপ্তি পাওয়ার এক রকম চাহিদা– সেই জিনের মাধ্যমে। এতে আনন্দ পায় বলেই সে এর প্রতি উদ্যম অনুভব করে, নিরলসভাবে এর চর্চায় তৃপ্তি পেয়ে সফলও হয়। কারো কারো সেই চাহিদার জিন দুর্বল হলে তারা আনন্দ পায়না বলেই খারাপ করে। ওই আনন্দ কারো কারো ক্ষেত্রে লেখাপড়ায় এতটা না হয়ে এথলেটিক্সে, খেলাধূলায়, সঙ্গীতে, চিত্রাঙ্কনে বা অন্য কোন অর্জনের দিকে সহজাত আকর্ষণের মাধ্যম হতে পারে– ভিন্ন চহিদার জিনের কারণে। সেই জিন তখন তাদের কাছে ওই বিষয়ের চর্চাকে তৃপ্তিকর করে তোলে, এবং ওতেই তাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। সহজাত মেধা বা দক্ষতা বলে যাকে আমরা জানি তা খুব সম্ভব এই চাহিদারই আর

এক নাম। স্বাভাবিক ভাবেই চাহিদার এই বৈচিত্র ঘটে থাকে। কিন্তু পরিবেশ এই চাহিদার জিনকে বড় রকমের সহায়তা দিতে পারে।

গত শ'খানেক বছর ধরে দুনিয়ার অধিকাংশ জায়গায় প্রজন্মের পর প্রজন্মে ছেলেমেয়েদেরকে ক্রমেই লেখাপড়ায় বেশি ভাল করতে দেখা যাচ্ছে। আগে যেই বয়সে তারা একটি সক্ষমতা দেখাত পরের প্রজন্মে আরো কম বয়সে তা দেখাচ্ছে। এর মানে এই নয় যে তাদের জিন পরিবর্তিত হয়ে গেছে; সেটি সম্ভব নয়। যে কারণে এটি হয়েছে তা হলো লেখাপড়ার সাফল্য ক্রমেই আরো ভাল ভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে। এ পুরস্কার আসছে অর্থ, ক্ষমতা, সম্মান, প্রচার, দেশে বিদেশে আরো বড় লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার সুযোগ ইত্যাদি নানা আকারে, যা আগে এতটা ছিলনা। এই প্রেরণাদায়ী পরিবেশে এর প্রতি চাহিদা বা আকর্ষণের জিন কাজ করতে পারছে ক্রমেই বেশি।

অন্য ধরনের চাহিদার একটি উদাহরণ নিয়ে বাংলাদেশে ক্রিকেটে এখন অনেক প্রতিভার সমাগম হবার ব্যাপারটি দেখা যাক। ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহ এদেশে বহু দিন ধরেই আছে, কিন্তু এতে ভাল করার আকর্ষণ ব্যাপক ভাবে আগে সৃষ্টি হয়নি। এ ধরনের খেলার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির জিন যদি থেকে থাকে তা বরাবর একই রকম ভাবে জনসংখ্যার মধ্যে বন্টিত ছিল এবং এখনো আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এই বিশেষ খেলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উচ্চ অর্থ, সম্মান, গ্ল্যামার, আন্তর্জাতিক পরিচিতি, মিডিয়াখ্যাতি ইত্যাদি যা সফল ক্রিকেটারের জীবনের মোড় একেবারে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম। এর আকর্ষণ দেশের অসংখ্য তরুণের মধ্যে ওই সহজাত সক্ষমতাকে উচ্চকিত করেছে, যেই সক্ষমতা বরাবরই ছিল। এর ফলেই অতি সাধারণ সব পরিবেশ থেকে অনেক ক্রিকেট-প্রতিভার সৃষ্টি হতে পারছে যা আগে হয়নি। এর মানে এই নয় যে জিনের গুরুত্ব কমে গেছে, পরিবেশেরটি বেড়ে গেছে। ওই জিনের উপস্থিতির কারণেই, তার বৈচিত্রের মধ্যে উচ্চ সক্ষমতারও উপস্থিতি আছে বলেই, নতুন সৃষ্টি হওয়া পরিবেশের সুযোগটি নেয়া যাচ্ছে।

দৈহিক ক্ষেত্রে জিন ও পরিবেশের বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ দেয়া যাক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগে অনেক দেশেই মানুষের গড়পড়তা উচ্চতা বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। স্পষ্টত এটি সর্বজনীন অধিক পুষ্টিরই ফল। কিন্তু তাই বলে কেউ বলবেনা যে এখন আর লম্বা-বেঁটে হওয়াটি জিনের ওপর নির্ভর করেনা। উচ্চতার বৈচিত্রটি চিরকালই জিন-বৈচিত্রের হাতে ধরা। জিন আর পরিবেশ যে একে অন্যের মধ্য দিয়ে কাজ করছে তা এ সব উদাহরণ বেশ স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

বুদ্ধিমত্তার এবং স্কুলের লেখাপড়ার বিষয়ে আবার ফিরে আসা যাক। শিক্ষার ব্যাপারটিকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এক রকম কন্ডিশনিঙের মত দেখা হতো– যেই কন্ডিশনিংকে আমরা 'পাভলভের কুকুরের' কল্যাণে ভাল ভাবেই জানি। এভাবেই শিক্ষার মনোবিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা হতো। একটি অজানা জ্ঞান যখন একটি জানা জ্ঞানের সঙ্গে এক সঙ্গে আসে জানাটির প্রভাবে আমরা অজানাটির সঙ্গে কন্ডিশন্ড হয়ে যাই– সেটি শিখতে পারি। একে একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক স্থাপন (এসোসিয়েশন) হিসেবে দেখা যায়। শিক্ষার এই ব্যাখ্যায় জিনের কোন ভূমিকা ছিলনা। কিন্তু এখন শিক্ষাকে এভাবে দেখা হয়না, অন্তত মূলধারার বিজ্ঞানীরা সেভাবে দেখেন না। বরং আমরা যে ইতোমধ্যেই জন্মগত ভাবে শিশুর মধ্যে যে স্বভাব-ভাষাবিদ, স্বভাব-গণিতবিদ, স্বভাব-বিজ্ঞানীকে দেখেছি শিক্ষার কাজটি ঘটে জিনের সৃষ্ট সেই সহজাত ক্ষমতাকে বিকশিত করার মাধ্যমে। শিক্ষার সফলতা অনেকটা ওই জিন এবং তার প্রকাশের ভাল-মন্দের ওপর (এপিজেনেটিক পরিবর্তন সহ) নির্ভর করে। মানুষের যাবতীয় পারদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা লাভের রঙ্গমঞ্চটি যেভাবে এই জিনের জগতের দ্বারা তৈরি হয়, শিক্ষার রঙ্গমঞ্চটিও সেভাবেই তৈরি হয়। এই রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন কী 'নাটক' কীভাবে অভিনীত হবে সেটি অবশ্য মস্তিষ্কের স্নায়ুবর্তনীর কাজের কিছু নিয়ম কানুন, কার্যকর স্মৃতি, দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ইত্যাদির কর্মপদ্ধতির ওপর নির্ভর করে।

এর সবই জিনের দ্বারা সুনির্ধারিত বটে কিন্তু তাই বলে নাটকের ক্ষেত্রে যেমন বলা হয় 'ষ্টেজে ওঠে বাজিমাত করা', শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটি করতে যাওয়ার বিপদ আছে। কথোপকথন মুখস্ত না করে, বার বার মহড়া না দিয়ে রঙ্গমঞ্চে

উঠে পড়লেই যেমন নাটক সফল হয়না, শিক্ষারও তাই শুধু জিনের জগতের ওপর নির্ভর করার উপায় নেই। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখক ষ্টিভেন পিনকার তাঁর নিজের দেশ যুক্তরাষ্ট্রের শিশু-শিক্ষার সমালোচনা করেছেন ঠিক এই দিকটিতেই। সেখানে শিশুদেরকে যখন সংখ্যার সঙ্গে পরিচিত করা হয় এবং যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শেখানো হয় তখন ধরে নেয়া হয় যে ওরা সবাই সহজাত বুদ্ধি দিয়ে এসবের মূল নীতি থেকেই সব কিছু বুঝে করতে পারবে। একবার ব্যাপারটি বলে দিয়ে এগুলো নিয়ে ভেবে কাজ করার দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়। যাদের সহজাত সক্ষমতা বেশি তারা এতে খুব উপকৃত হয় কারণ এটি অনেকটা গণিতবিদের মত কাজ, আদিতে বড় গণিতবিদরা যা করেছিলেন সেরকম যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় শিশুরাও করার চেষ্টা করে। কিন্তু হায় এটি করতে গিয়ে ক্লাসের অনেক শিশুকে যোগ-বিয়োগের মত একেবারে সাধারণ জিনিসেই চিরকাল অকার্যকর থেকে যাবার পথ করে দেয়া হয়। কারণ সব শিশুর মধ্যে সমান ভাবে সহজাত ক্ষমতার এতখানি প্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়।

অন্যদিকে পিনকার মনে করেন অন্য অনেক দেশে এই পর্যায়ে যে যোগ-বিয়োগ-গুণের নিয়মগুলোকে, এবং নামতাগুলোকে যে বার বার ব্যবহারের কসরতের মাধ্যমে একেবারে সারা জীবনের জন্য ধাতস্থ করে দেয়া হয় সেটিই বরং সবার জন্য কাজ দেয়– কারণ সেভাবে সবাই গণিতের পরবর্তী পর্যায়ে যেতে পারে, অন্তত এই ভিত্তিমূলক বিষয়ে নিরক্ষর থাকেনা। ঠিক একই ব্যাপার পড়ার, লেখার আর অংকের অন্য বিষয়ের জন্যও প্রযোজ্য– যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত সহজাত উপায়ে করাবার চেষ্টার বদলে, অন্যত্র নিয়ম করে, বানান করে বার বার করিয়ে এই ভিত্তিটি গড়ে দেয়া হয়। পিনকারের মতে গোড়াতেই সহজাত সক্ষমতার ওপরে বেশি নির্ভর করার কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিরাট জনগোষ্ঠি পড়ায়, লেখায় এবং অংকে নিরক্ষর থেকে যায়। এ কথা মানলে বলতে হয় নূন্যতম সহজাত মেধা না থাকলে শুধু শিক্ষা পদ্ধতির হেরফের করে যেমন সবকিছু করা যায়না, তেমনি শুধু জিনের ওপর অর্থাৎ সহজাত মেধার ওপর ভরসা করেও সব কিছু করা যায়না, চর্চায় ধাতস্থ হওয়াটিও প্রয়োজন। এখানেও ঘর আর বাহিরকে একত্র করে চলতে হয়।

মনের ওপর বাইরের ছাপ

১৯০৯ সালে অষ্ট্রিয়ার ছয় বছর বয়সের একটি ছেলে কনরাড প্রতিবেশীর কাছ থেকে সদ্য ডিম ফুটে বের হওয়া দুটি হাঁসের বাচ্চা উপহার পেয়েছিলো। সেই থেকে বাচ্চা দুটি অনেকদিন কনরাডকে অনুসরণ করে চলেছে। ওটি তখন তার কাছে একটি মজার খেলার মতই ছিল। কিন্তু পরে বয়স্ক কনরাড লোরেঞ্জ তাঁর সারা জীবন হাঁসের বাচ্চার এই আচরণের ওপর গবেষণা করে বিজ্ঞানকে বহু কিছু দিয়ে গেছেন, এবং অনেকটা এ ধরনের বিষয়ের ওপর 'ইথোলোজি' নামে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন।

১৯৩৫ সাল নাগাদ লোরেঞ্জ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে হাঁসের বাচ্চা ডিম থেকে বের হবার পর প্রথম যাকে নড়তে চড়তে দেখে তাকেই অনুসরণ করে। সাধারণত ওই প্রথম নড়াচড়ার লক্ষ্যবস্তুটি তার মা হয়, এবং সে জন্যই হয়তো মায়ের কাছে থাকার সুবিধার জন্য অভ্যাসটি বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মা না হয়ে সেটি যদি একটি বালক হয়, অথবা লোরেঞ্জের মত দাড়িওয়ালা একজন বিজ্ঞানী হয়, এমন কি কারো হাতের দস্তানাও হয় তাতেই সই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটিকে দেখলেন বাইরের ওই প্রথম দেখা জিনিসটির বা প্রাণীটির সঙ্গে হাঁসের মনের নিবদ্ধ হয়ে যাওয়া (ফিক্সেশন) হিসেবে এবং তার দ্বারা হাঁসের মনের ওপর একটি স্থায়ী ছাপ পড়া (ইম্‌প্রিন্টিং) হিসেবে। লোরেঞ্জ আরো লক্ষ্য করলেন যে এই ছাপ যে কোন সময় পড়তে পারেনা। ডিম ফুটে বের হবার পনরো ঘন্টা পর থেকে তিন দিন পর সময় পর্যন্ত সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি থাকে, তার আগে বা পরে থাকেনা। ওই সময়ের মধ্যে প্রথম যাকে নড়তে চড়তে দেখবে সেই তার মনে ছাপ ফেলবে– যেই ছাপ মোছা যায়না, অন্য কিছুর দ্বারা উল্‌টে দেয়া যায়না। জিন আর পরিবেশ একাকার হয়ে কাজ করার এটি একটি চমৎকার উদাহরণ। নির্দিষ্ট সময়ে এই পরিস্থিতি মনে যে ছাপ ফেলতে পারে এটি জন্মগত ভাবে নির্ধারিত– তাই জিনের ব্যাপার। কিন্তু কে সেই ছাপ ফেলবে সেটি জিনে নির্ধারিত নেই, সেটি বাইরের পরিবেশে ঘটার ব্যাপার। অথচ এই দুই এক না হলে ছাপ পড়ছেনা।

লক্ষ্য করা বিষয় হলো শুধু যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাপ পড়তে পারে এটিও জিনের প্রকাশ-ব্যবস্থায় নির্ধারিত করা আছে। এভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জিন যে সময়-নির্ধারিত কাজ করে সেটি আমরা এর আগে শেয়াল প্রজননকারীদের দ্বারা নম্র শেয়াল প্রজনন করার উদাহরণে দেখেছি। সেখানে দেখেছি জিন কীভাবে শৈশবের চেহারা ও আচরণকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকর করে রেখেছিল। জিনের সঙ্গে সময়ের সম্পর্কটি আমরা সব সময় মনে রাখিনা তাই কাজের দিক থেকে জিনের উপমা খুঁজতে গিয়ে সাধারণত ব্লু-প্রিন্ট বা নীল-নক্শার সঙ্গেই তার তুলনা করি। একটি ভবনের নীল-নক্শার মধ্যে ভবনের খুঁটিনাটি দেয়া থাকে যার অনুসরণ করে ভবনটি তৈরি হতে পারে, আর সেখানে জিনের সঙ্গে তার সাযুজ্য আছে একথা ঠিক। কিন্তু নীল-নক্শার মধ্যে কোথাও নির্দেশিত থাকেনা ভবন তৈরির কোন্ কাজটি কখন হবে, কংক্রীটের থামগুলো তৈরির কতদিন পর ছাদ ঢালাই করা যাবে ইত্যাদি। এদিক থেকে বরং জিনের জন্য রান্নার রেসিপির উপমা ব্যবহার করাই ভাল, কারণ রেসিপিতে বলা থাকে রান্নার তেল কতক্ষণ গরম করার পর তাতে মশলার মেশালটি ঢালতে হবে। জিনও ঠিক তাই করে– বিশেষ করে মায়ের গর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠার সময় এটি খুব সতর্ক ভাবে সময় ঠিক করে দেয় কখন হাত-পা ইত্যাদি সৃষ্টি হবে, কখন ক্ষুদ্র হার্টটি দেখা দেবে আর তার কাজ শুরু করবে, কোন অঙ্গটি কত সময় ধরে বাড়বে তারপর থামবে, ইত্যাদি। জন্মের পরও কখন নবজাতক শুধু উত্তেজনায় সাড়া দেয়া ছাড়া আর কিছু করবেনা, কখন সে অন্যের সঙ্গে চোখে-মুখে ভাব বিনিময় করতে পারবে, কখন তার মস্তিষ্ক শিক্ষণের জন্য তৈরি হবে, কখন কৈশোরের অস্থিরতা ছাড়িয়ে পরিপক্ক হবে ইত্যাদির সময়ও জিন-প্রকাশে মোটামুটি ঠিক করা আছে।

মনে ছাপ পড়ার ব্যাপারটি কিন্তু মোটেই হাঁসের বাচ্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষ সহ নানা প্রাণীর মধ্যেও তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। মানুষের শৈশবে ও কৈশোরে পরিবেশের অনেক বিষয় মনে এরকম ছাপ ফেলার উপযুক্ত থাকে– যেমন শৈশবেই বিশেষ খাবার ভাল লাগার ছাপ পড়া, নিজের কালচারের কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা পছন্দের ছাপ পড়া ইত্যাদি। কিন্তু

বয়স্ক হবার পর নতুন করে ছাপ পড়ার মত নমনীয়তা মনের থাকেনা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশব-কৈশোরে পড়া ছাপগুলো মনের মধ্যে সিমেন্ট শক্ত হবার মত স্থায়ী হয়ে যায় ওতে।

এভাবে ছাপ পড়ার কিছু চমকপ্রদ জিনিস হলো মানুষের মুখের ভাষা সংক্রান্ত। ছোটবেলায় দুই থেকে পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত সময়ে কোন নতুন ভাষার পরিবেশে গেলে কোন রকম চেষ্টা ছাড়া শিশু মাতৃভাষার মতই স্বচ্ছন্দ ভাবে সে ভাষায় কথা বলা শিখে যায়। এমনকি ইতোমধ্যে মাতৃভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এটি সম্ভব– উভয় ভাষাই আলাদা ভাবে সমান তালে বলার অভ্যাস বজায় থাকবে যদি উভয়টি বলার চর্চা থাকে। এর চেয়ে বেশি বয়সে নতুন ভাষার পরিবেশে গেলে এভাবে আয়ত্ব করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়, আর কৈশোরে ঢুকে যাওয়ার পর নতুন ভাষাটি বড়দের মতই রীতিমত চেষ্টা ও চর্চার মাধ্যমে শিখতে হয়, সহজাত ব্যবস্থায় নতুন ভাষার ছাপ আর পড়েনা, মনের সেই নমনীয়তাটা হারিয়ে যায়। শৈশবে মনের ওপর পড়া ভাষার এই ছাপ সারা জীবন বজায় থাকবে, তবে সেজন্য এর চর্চা অব্যাহত থাকা চাই।

শুধু নতুন ভাষা আয়ত্ব করা নয়, ওই ভাষার মূল ব্যবহারকারীরা যে অ্যাকসেন্ট বা টানের উচ্চারণে সেটি বলে সেটিও আয়ত্ব হতে পারে ওই সময় শুনে শুনে আত্মস্থ হবার মাধ্যমে, যদি শৈশবে কৈশোরে একটি বয়সের আগে মনের ওপর তার ছাপ পড়ে। যেমন বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে যারা কৈশোরের ওই সময়টি পর্যন্ত নিজের স্থানীয় উপভাষাতেই প্রায় সব কথা বলেছে, প্রমিত বাংলা শুধু লেখাপড়া ও আনুষ্ঠানিক কাজেই শুধু মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছে, পরে প্রমিত বাংলা সব সময় ব্যবহার করলেও তাদের উচ্চারণে উপভাষার টানটি থেকে যায়। এর কারণ কম বয়সে যে সময় মুখের ভাষার টানটি ছাপ ফেলার কথা সে সময় উপভাষাই সেই ছাপ রেখেছিল। সেটি স্থায়ী হয়ে যাওয়াতে প্রমিত বাংলায়ও সেই টান এসে পড়েছে। এটি দূর করা এর পর প্রায় অসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়; অন্তত অনেক কষ্টসাধ্য প্রশিক্ষণের ও চর্চার প্রয়োজন হতে পারে সে জন্য। কিন্তু বাড়িতে উপভাষা ব্যবহার সত্ত্বেও যারা ওই শৈশবে-কৈশোরে নানা জেলার বন্ধুদের সঙ্গে ক্রমাগত প্রমিত

উচ্চারণে প্রমিত বাংলায় কথা বলেছে তাদের ক্ষেত্রে ওই উপভাষার টান থাকেনা।

ছোটবেলায় যারা পরিবারের সঙ্গে বিদেশে অভিবাসী হয়েছে তারা ওখানকার ভাষা সহজে শিখেতো বটেই, স্থানীয়দের মত হুবহু অ্যাকসেন্টেই তারা সেটি বলতে শেখে। কিন্তু সেটি করতে পারার বয়স খুব সুনির্দিষ্ট বড় জোর তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত। এর দু'তিন বছর বড় বয়সে একই সঙ্গে একই পরিবারের সদস্য হিসেবে যারা অভিবাসী হয়েছে তাদের কিন্তু স্থানীয় অ্যাকসেন্টে ওই নতুন ভাষা শেখা হয় না। বয়স্ক হবার পর বিদেশী ভাষা শিখলে যেমন নিজের বিশেষ টানেই অথবা কোন টানহীন ভাবে সেই ভাষা বলাটি স্বাভাবিক, মাত্র দু'এক বছরের ব্যবধানের কারণে ওই তরুণ অভিবাসীরাও নিজের টানেই বিদেশী ভাষা বলতে শেখে, স্থানীয় অ্যাকসেন্টে নয়। রেডিয়োতে বা টেলিফোনে ফরাসী, জার্মান, ভারতীয় উপমহাদেশীয়, আফ্রিকান এরকম নানা অঞ্চলের মানুষের বলা খুব স্বচ্ছন্দ ইংরেজীও যাঁরা শোনেন বক্তাদের নিজ নিজ ভাষার টানে ইংরেজী বলার কারণে তাঁরা বুঝতে পারেন কার মূল দেশ কোথায়। কিন্তু শৈশবের ছাপ পড়ার সময়ে যাঁরা ইংরেজী মূল ইংরেজীভাষীদের পরিবেশ থেকে শিখেছে তাদের ক্ষেত্রে সেটি হবেনা। কাজেই এই সব ক্ষেত্রে ছাপ পড়বে কি পড়বেনা সেটি নির্ধারিত হবার জন্য শেখার সময়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আর নতুন অ্যাকসেন্ট গ্রহণের মত নমনীয়তা থাকেনা।

অতীতের উপনিবেশবাদের কারণে ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষীরা সারা দুনিয়ায় তাদের কিছু কিছু প্রাক্তন উপনিবেশে নতুন সব দোআঁশলা ভাষার জন্ম দিয়েছে। প্রথমে এগুলো দেখা দিয়েছে এক ধরনের বাজারি ভাষা হিসেবে। একে বলা হতো 'পিজিন' ভাষা– কোন ব্যাকরণের নিয়ম কানুনের ধার না ধেরে শুধু শাসকের ভাষা ও শাসিতের ভাষার কিছু সীমিত শব্দ মেশানো এটি কবুতরের (পিজিওন) বাক্ বাকুমের মত শোনাতো বলেই এই নাম। এগুলো সৃষ্টি হয়েছে বাজারে সাধারণ মানুষের মধ্যে মুখে মুখে কাজ চালাতে গিয়ে সেটি শাসক ও শাসিত উভয়ে সহজে আয়ত্ব করে ব্যবহার করতে পারতো; প্রজাশাসনেও বেশ কাজে আসতো। এ ভাবেই ইংরেজি

পিজিনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চাইনিজ পিজিন, হাইওয়ান পিজিন, পাপুয়ান পিজিন, নাইজেরিয়ান পিজিন ইত্যাদি। বাজারি ভাষা হিসেবে এগুলো বাজারে, আদালতে, সাহেবের দরবারে সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকতো– বাড়িতে আসতোনা, তাই সাধারণত শিশুদেরকে প্রভাবিত করতোনা। অথচ সহজাত ভাবে ভাষার মধ্যে নিজের মাথায় থাকা সর্বজনীন ব্যাকরণ প্রয়োগ করে তার নিয়ম-কানুন গড়ে তোলে সে ভাষার যে ব্যবহারকারীরা, তাদেরকে শৈশব থেকে এর ছাপ-পড়া মন দিয়ে ওটা করতে হয়। এটি হয়নি বলে পিজিনের কোন স্থায়ী ছাপ অধিবাসীদের মনের মধ্যে পড়েনি, এর ব্যাকরণের ও বলার কোন নিয়ম কানুনও তাদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবে গড়ে ওঠেনি।

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাগিদে শিশুরাও এটি আয়ত্ব করেছে, এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ শৈশব থেকে এটি ব্যবহার করেছে। আর তখুনি ব্যাপারটি অনেকটা বদলে গেছে। ছাপ পড়ার উপযুক্ত সময়ে এটি বলা আরম্ভ করাতে শিশুদের মনের মধ্যে এর স্থায়ী ছাপ পড়েছে, যার ফলে এর এক ধরনের নিয়ম কানুনও তাদের মধ্যে গড়ে উঠতে পেরেছে এক রকম পূর্ণাঙ্গ একটি ভাষা হিসেবে। ওই ছাপের কারণেই তারা বড় হয়ে একে তাদের একটি ভাষা হিসেবেই গ্রহণ করতে পেরেছে। এই পর্যায়ে উন্নীত এসব নতুন সৃষ্ট দো-আঁশলা ভাষাকে বলা হলো 'ক্রেয়োল'। এখন ইংরেজির সঙ্গে স্থানীয় ভাষা মেশানো যার যার ক্রেয়োল ভাষা বেশ কিছু দেশের একটি প্রধান আনুষ্ঠানিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন বাহামায়, গিয়ানায়, বেলিজে, সিয়েরা লিওনে– দেশের বিশাল জনগোষ্ঠি ওরকম ভাষায় কথা বলে। 'টক্ পিসিন' নামের ইংরেজি ভিত্তিক ক্রেয়োলটি পাপুয়া-নিউগিনির রাষ্ট্রভাষা। অন্যদিকে হাইতি, মরিশ্যাস, সীশেল ইত্যাদি দেশের ফরাসী ভাষা ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন রকম ক্রেয়োল ওসব জায়গায় প্রধান ব্যবহৃত ভাষা। শিশু মনে নতুন ভাষার ছাপ রাখার মধ্যেই রয়েছে 'পিজিন' থেকে 'ক্রেয়োল' হয়ে ওঠার মাহাত্ম্য।

নিকটাত্মীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে অনীহার আপাত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ছোট বেলায় মনে ছাপ পড়ার আর একটি অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কৃত হয়েছে। ওই অনীহাটি মানুষ ছাড়া অন্যান্য নানা প্রাণীতেও দেখা যায়;

স্পষ্টত অন্তর্প্রজননের ফলে বংশগত রোগের প্রকোপ এবং জিন-বৈচিত্র হ্রাস এড়াতে বিবর্তনই এই অনীহা সৃষ্টি করেছে। সেটি অবশ্য চূড়ান্ত কারণ। কিন্তু আপাত কারণ হিসেবে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এর সূত্রপাত হয় শিশুমনে একটি ছাপ পড়ার মাধ্যমে। শৈশবে যারা খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে একই পরিবারে থাকে তারা আত্মীয় হোক বা না হোক শিশুমনে একটি স্থায়ী ছাপ রাখে। ছাপটির কার্যকারিতা ফুটে ওঠে শিশু যখন বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যখন অন্য লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তখন। ওই শৈশবের ছাপ পড়া ঘনিষ্ঠ মানুষগুলোকে সে তখন ওভাবে আকৃষ্ট হবার দল থেকে বাদ দেয় এবং এই ব্যাপারে জোরালো অনীহা বোধ করে।

বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে বিভিন্ন জরীপমূলক গবেষণায়। যে সব সমাজে স্ত্রী-পুরুষরা নিজেরাই পছন্দ করে বিয়ে করে সেখানে এটি স্পষ্ট দেখা গেছে। শৈশবে একেবারে পরিবারের মত যারা একসঙ্গে থাকে সেখানে অনাত্মীয়ের ক্ষেত্রেও একই অনীহা কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ তাইওয়ানে চীনাদের মধ্যে ব্যাপক হারে শিশু সন্তান দত্তক নেবার রীতি রয়েছে যারা পরিবারে নিজস্ব সন্তানদের সঙ্গে একই ঘরে ঘনিষ্ঠভাবে থেকে বড় হয়; তাদের মধ্যে এটি দেখা গেছে। ইসরায়েলে একেবারে শৈশব থেকে নানা পরিবারের ছেলেমেয়েদেরকে হোষ্টেলের মত একটি আবাসিক ব্যবস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে এক সঙ্গে রেখে বড় করার একটি জাতীয় কার্যক্রম আছে, এই হোষ্টেলগুলোকে বলা হয় কিবুৎস। সেখানেও এই ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে পরস্পরকে বিয়ে করা থেকে দূরে থাকে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। মরক্কোতে খুব বড় একান্নবর্তী পরিবারে যে সব শিশু এক সঙ্গে বড় হয়েছে তাদের চিত্রটিও একই। কোন কোন সমাজে বাবা-মায়ের বা আত্মীয়স্বজনের আগ্রহে আয়োজিত বিয়ের ক্ষেত্রে শৈশবে ঘনিষ্ঠ থাকা এমন নারী পুরুষের বিয়ে হয়েছে, এমন কিছু মানুষের তথ্য গবেষকরা অনুসরণ করেছেন। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ বিয়ে শেষ পর্যন্ত খুব মসৃণ হয়নি, অনেকগুলো ভেঙ্গে গেছে এমন প্রমাণও মিলেছে। কাজেই বেশির ভাগ তথ্যই বলছে যে আত্মীয় বিয়ে না হওয়ার একটি আপাত কারণ হলো ঠিক আত্মীয়তা নয়– শৈশবে ঘনিষ্ঠভাবে

বসবাস। আসলে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রাইতো শৈশবে বেশির ভাগ ওভাবে থাকে, তাতেই মূল উদ্দেশ্যটিও পূর্ণ হয়।

শৈশবে ঘনিষ্ঠ ভাবে বসবাসের ঘটনাটি যে জিন-প্রকাশ ব্যবস্থায় একটি স্থায়ী ছাপ ফেলে সেটি বোঝা যাচ্ছে এর সময়টি খুব সুনির্দিষ্ট থাকার ব্যাপারটি দেখে। এটি ঘটে তিন বছর বয়সের মধ্যে ওরকম ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে। তিন বছর বয়সের পর কেউ পরিবারে এসে, বা হোস্টেল ইত্যাদিতে ঘনিষ্ঠভাবে থাকলে তার ছাপ যে পড়েনা সেটি বোঝা যায় পরবর্তীতে তাদের মধ্যে ওই যৌন অনীহা সৃষ্টি খুব বিরল হওয়াতে। চার বছর বয়সের পর এটি ঘটার সুযোগ একেবারেই কমে যায়।

অতি অল্প বয়সে ঘটার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুরো ব্যাপারটিই একেবারে সহজাত বিষয়– জন্মগত ভাবেই জিন প্রকাশের ব্যবস্থাটি ওভাবেই তৈরি হয়ে আছে। কারো সাথে ছোটবেলায় এক বাড়িতে এক সঙ্গে বড় হবার স্মৃতি রয়েছে কাজেই তাকে বিয়ে করা যাবেনা, ব্যাপারটি সে রকম অভিজ্ঞতার নয়; ব্যাপারটি জিনের। কিন্তু যেই মানুষটি অন্যের ওপর অনীহার ছাপটি ফেল্‌ছে সে কিন্তু পরিবেশের। এটিও জিন আর পরিবেশের একাকার হয়ে কাজ করার আরেকটি চমকপ্রদ উদাহরণ।

কালচারঃ বিবর্তনের বিলম্বিত রাগ

জিন ও কালচার

অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষকে অনেক সময় আলাদা করা হয় এই বলে যে মানুষের 'কালচার' আছে, অন্য প্রাণীর তা নেই। কথাটি সত্যি, তবে মানুষ যে অনন্য তা কালচার শুধু আছে বলে নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম জমিয়ে জমিয়ে এই কালচারকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করার যে ক্ষমতা মানুষের রয়েছে সেজন্যই। আমরা দেখবো কালচারের মত কিছু জিনিস মানুষের সঙ্গে কিছুটা সদৃশ অন্য দু'একটি প্রাণীতেও রয়েছে। কিন্তু মানুষ যেভাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে তথ্য সঞ্চালন করে বিবর্তনের এক পর্যায়ে প্রায় হঠাৎ করেই কালচারের ডানা মেলে ওড়াল দিয়েছে, সেটি আর কেউ পারেনি। এটিই মানুষকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। এই ওড়াল দেয়াতে বাইরের পরিবেশের অনেক সহায়তা আছে, তাই এক এক জায়গায় এটি এক এক ভাবে হয়েছে। কিন্তু কোথাও তা মানুষের সমৃদ্ধ জিন-সম্ভারের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে হয়নি।

ইতোমধ্যে আমরা পরিবেশের অনেক কিছুকে জিনের মাধ্যমে কার্যকর হতে দেখেছি। কালচারের ক্ষেত্রেও তা হয়েছে। 'কালচারের জিন' বলতে কোন কিছুকে হয়তো আমরা পাবোনা। কিন্তু মানুষের জিন-সম্ভার এবং জিন প্রকাশের ক্ষেত্রে তার কিছু বৈশিষ্টময় এপিজেনেটিক ব্যবস্থা মানুষকে কালচার আনার সুযোগ করে দিয়েছে। শিম্পাঞ্জির মধ্যে কালচারের মত কিছু কিছু জিনিস যে দেখা যায় মানুষের সঙ্গে জিনের এত বেশি মিলের কারণেই তা হতে পেরেছে। আবার শিম্পাঞ্জি যে সেই কালচার নিয়ে ক্রমে সমৃদ্ধতর কালচারে ওড়াল দিতে পারেনি– সেখানে মানুষের ওই এপিজেনেটিক অনন্যতাটি ধরা পড়ে; যেই অনন্যতাটি আমরা আগেই দেখেছি। এটিই মাত্র ১.২% জিন-পার্থক্য নিয়ে মানুষ আর শিম্পাঞ্জিকে আকাশ-পাতাল ভিন্নতা দিয়েছে।

আমরা যাকে স্থানীয় কালচারের ট্র্যাডিশন বলি, শিম্পাঞ্জির মধ্যে তার কিছু ছিটেফোটা দেখা যায়; এমনকি কিছু কিছু বানরের মধ্যেও। বিভিন্ন অঞ্চলের শিম্পাঞ্জির মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ ও তাকে খাওয়ার উপযুক্ত করে নেবার কিছু কৌশল নতুন উদ্ভাবন করে তা ছোটদেরকে শেখাতে দেখা গেছে। ক্রমে ওটা ওই অঞ্চলের শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে একটি কালচার ট্র্যাডিশনে পরিণত হয়েছে। তবে যা হয়নি তা হলো ওখান থেকে কালচারটি আর কোথাও বিস্তৃত হয়নি আর এর ওপর ভিত্তি করে কালচারকে ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হতে দেখা যায়নি। এমনি একটি কৌশল হলো একটি পাথরের ওপর বাদাম রেখে অন্য একটি পাথর দিয়ে তাকে বার বার আঘাত করে ভাঙ্গা। আবার অন্য অঞ্চলের শিম্পাঞ্জিদেরকে দেখা গেছে এভাবে বাদামে আঘাত করার ব্যাপারে গাছের শক্ত ডাল ব্যবহার করতে, কাছেই প্রচুর পাথর থাকা সত্ত্বেও। নেহাৎ স্থানীয় ট্র্যাডিশন বলে কথা।

একাধিক গোষ্ঠির শিম্পাঞ্জির মধ্যে দেখা গেছে গাছের থেকে পাতা-সহ সরু পাতার কাঠি ছিড়ে নিয়ে তাকে ডিবি থেকে উই পোকা তুলে আনার কাজে ব্যবহার করতে। এজন্য এরা কাঠিটি থেকে সযত্নে পাতা, পাতার বোঁটা ইত্যাদি ছাড়িয়ে নেয়। এরপর মসৃণ সরু কাঠিটি উইয়ের ডিবির একটি ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে কাঠি তোলার পর এতে লেগে থাকা উইগুলো খেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের শিম্পাঞ্জিরা এই একই কৌশল পৃথক ভাবে উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু এই কৌশলে উই খাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কালচারগত পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। পশ্চিম আফ্রিকার শিম্পাঞ্জিরা বেঁটে কাঠি বেছে নেয়; একে উইয়ের ডিবিতে অল্প একটু ঢুকিয়ে যে দু'একটি উই এর সংলগ্ন হয় তা পরে কাঠিটি মুখে ঢুকিয়ে সরাসরি সেখান থেকে খেয়ে নেয়। পূর্ব আফ্রিকার শিম্পাঞ্জিরা নেয় বেশ লম্বা কাঠি যা ডিবির ভেতর অনেকখানি ঢোকানো যায়। এটি ঢুকিয়ে তারা বেশ খানিক্ষণ অপেক্ষা করে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক উই এতে লাগতে পারে। এরপর কাঠিটি বের করে সব উইগুলোকে ছাড়িয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেয় এবং হাত থেকেই খায়। এখানে কি আমরা খাবার সংগ্রহ ও খাওয়ার রীতির ভিন্ন ভিন্ন কালচার লক্ষ্য করছিনা? এমনটিইতো আমাদের মধ্যেও আছে নানা কালচারে খাবারকে নানা কায়দায় খাওয়ার– যেমন মুখে

তোলার জন্য হাতের অথবা চামচের অথবা কাঁটা চামচের অথবা চপষ্টিকের ব্যবহারে।

আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের শিম্পাঞ্জির মধ্যে নিজের ডাক্তারি করার রেওয়াজ আছে। অন্ত্রে কৃমি বেড়ে যাওয়ার কারণে পেটে ব্যথা হলে এরা বিশেষ এক রকম পাতা গাছ থেকে ছিড়ে নেয় যেগুলোর গায়ে কাঁটা কাঁটা রোঁয়া আছে। এই পাতা ওরা পানের খিলি করার মত বেশ কয়েকবার ভাঁজ করে দলামোচড়া অবস্থায় গোটা খেয়ে নেয়। তাদের মলের সঙ্গে দেখা যায় যে পাতার প্রায় অক্ষত বড় বড় অংশে ওই রোঁয়ার সঙ্গে ছোট ছোট কৃমি আটকে বেরিয়ে গেছে। স্পষ্টত ইতস্তত নানা ভাবে করে করে দেখার মাধ্যমে পেট ব্যথার উপশমে এই পাতার ভাল ফল পাওয়ার থেকেই এই ডাক্তারি তারা শিখেছে ও নিজেদের মধ্যে অন্যদেরকে শিখিয়েছে। হয়তো একটি কালচার অভ্যাস হিসেবে একে তারা গ্রহণ করেছে। কিন্তু অন্যত্র শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে এর চল্ নেই। শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে এরকম প্রায় ৪০-৫০ রকমের কালচার ট্র্যাডিশন খুঁজে পাওয়া গেছে যা বিভিন্ন অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। প্রত্যেকটি গোষ্ঠিতে দেখা গেছে ছোটরাই এমন জিনিসগুলো বড়দের কাছ থেকে শেখে। নতুন কেউ বয়স্ক অবস্থায় বাইরে থেকে এসে গোষ্ঠিতে যোগ দিলে তারা কিন্তু আর এগুলো শিখতে পারেনা।

জাপানের সমুদ্র পাড়ের এক রকম বানরের গোষ্ঠির মধ্যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে একটি নতুন কালচার-ট্র্যাডিশন গড়ে ওঠতে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। গবেষণার খাতিরে এদেরকে নিয়মিত মিষ্টি আলু খাওয়ার জন্য সরবরাহ করা হতো। স্তুপ করে মাটিতে দিয়ে দেয়া এই মিষ্টি আলুতে বালি-মাটি ইত্যাদি লেগে যেতো। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল একটি বানর খাওয়ার আগে মিষ্টি আলু সমুদ্রের পানিতে ধুয়ে নিচ্ছে। ওখানে এরকম ঘটনা আগে কখনো দেখা যায়নি। ধীরে ধীরে দেখা গেল অন্য অল্প বয়সী কিছু বানর এভাবে ধুয়ে খাওয়া শিখে গেছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে দেখা গেলো এই গোষ্ঠির অধিকাংশ বানর নিয়মিত ভাবেই মিষ্টি আলু ধুয়ে খাচ্ছে। জেনেটিক দিক থেকে মানুষের কাছাকাছি প্রজাতিগুলোতেই শুধু এভাবে এক ধরনের 'কালচার' গড়া দেখা গেছে এর থেকে কালচার সৃষ্টিতে জিনের অবদানটি

বেশ বোঝা যায়। যারা ও ভাবে মানুষের কাছাকাছি নয় তাদের মধ্যে এটি দেখা যায়না।

তবে ওই যে কালচারের ক্ষেত্রে মানুষের বড় উল্লম্ফন– অন্য কোন প্রাণী তার ধারে কাছে আসতে পারেনি। মানুষের মস্তিষ্কের অনন্য কিছু ক্ষমতা এটি সম্ভব করেছে। কালচার সৃষ্টি, কালচারের বিস্তার এবং আগের সঙ্গে পরেরটি ক্রমাগত যোগ করে কালচার পূঞ্জীভূত করার কাজে মস্তিষ্কের এই ক্ষমতাগুলো অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে সেই কগ্নিশন– অন্যের চিন্তা আন্দাজ করার ক্ষমতা, যার মাধ্যমে মানুষ অন্যের চিন্তাকে নিজের চিন্তায় পরিণত করতে পারে। সেই সঙ্গে আরো একটি অভাবনীয় কাজ এই মস্তিষ্ক দিয়ে সম্ভব হয়েছে, তা হলো এক একটি মনগড়া প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে এক একটি আইডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে পারা। ভাষার মধ্যে মানুষ এটি অহরহ করছে– একটি ধ্বনি বা শব্দ দিয়ে কোন একটি জিনিস বা আইডিয়াকে বুঝিয়ে। ভাষার আগে যে অন্য রকম যোগাযোগ ছিল তাতেও সে এটি করেছে। এরকম প্রতীকের সুবিধা হলো যাকে যে প্রতিনিধিত্ব করছে সেটি চোখের সামনে না থাকলেও চলে, প্রতীক দিয়েই কাজ চলে। চোখের সামনে থাকার প্রয়োজনীয়তাটি যখন থাকেনা, তখন যে কোন সময় এটাকে নিয়ে ভাবার, একে বিস্তৃত করার সুযোগ থাকে। ওটা কী, সামনে কী হতে পারে, এসব নিয়ে কালচার সৃষ্টি করা যায়। যেহেতু ওই প্রতীকের মাধ্যমে ভাবনাটি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিতও করা যায়, তাই কালচার পূঞ্জীভূত করাতেও সেটি দারুণ অবদান রাখতে পারে।

আধুনিক গবেষণা বলছে হাতের কুশলতার সঙ্গে ভাষার একটি সম্পর্ক আছে। মনে করা হয় ভাষার পুরো ব্যাপারটিই প্রথমে শুরু হয়েছিলো হাত ও আঙ্গুল সঞ্চালনের মাধ্যমে। শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে ভাষার বিকল্প হিসেবে এই সঞ্চালনের ব্যবহার দেখা যায়। এর সঙ্গে জিনের যোগাযোগটিও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। FOXP2 নামের যে জিনের পরিবর্তনে শিম্পাঞ্জির হাত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, আর একই জিনের পরিবর্তনে মানুষের মুখমণ্ডলের নড়াচড়া ও মুখের শব্দ গঠনে ব্যাঘাত ঘটে। মনে হচ্ছে যে এই একই জিন শিম্পাঞ্জির এবং খুব সম্ভব অতীতে আমাদের পূর্বসূরি ভাষাহীন মানুষের হাত

সঞ্চালনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যোগাযোগের, এবং পরে আমাদের মুখের ভাষাকে, নিয়ন্ত্রণ করেছে। মূক-বধিরদের জন্য হাতের ইশারার যে ভাষা চালু রয়েছে নানা ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে একটি সর্বজনীনতা রয়েছে। এই সর্বজনীনতা নেহাত জোর করে তৈরি করা হয়নি; বরং মনে হয় এও মস্তিষ্কে মুখের ভাষার ব্যাকরণের মত অতীত থেকে গাঁথা রয়েছে। সব কিছু থেকে মনে হচ্ছে যে হাতের যেই অনন্য কুশলতা মানুষকে একদিন হাতিয়ার তৈরিতে সক্ষম করেছিলো, তাই খুব সম্ভব পরে তাকে ভাষার অধিকারী করেছে। এই দুটি সক্ষমতাই মানুষকে কালচারের ক্ষেত্রে সত্যিকার ডানা মেলার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো।

কালচার ক্রমেই বেশি বেশি করে আইডিয়ার জন্ম দিয়েছে এবং তার জন্য ক্রমাগত বেশি সংখ্যক প্রতীক সৃষ্টি করেছে। কালচারের এই ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা বড় মস্তিষ্কের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। জটিলতর কালচার টিকে থাকার ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি সুবিধা দিয়েছিলো বলেই হয়তো এই পর্যায়ে বড় মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছিলো। এই মত অনুযায়ী কালচার ও জটিল মস্তিষ্ক একই সঙ্গে বেড়ে ওঠেছে এবং পরস্পরকে সহায়তা দিয়েছে। অবশ্য এ সম্পর্কে একটি ভিন্ন মত হলো অন্য সব বিবর্তনগত কারণে মস্তিষ্কের বিকাশ শেষ হবার পরেই কালচার দেখা দিয়েছিলো; মস্তিষ্ক গঠনে কালচারের কোন হাত নেই, যদিও কালচার গঠনে মস্তিষ্কের হাত অবশ্যই আছে।

কালচারের একটি বড় অংশ হলো কল্পনা আর সৃজনশীলতা। টিকে থাকার জরুরী প্রয়োজনে মানুষের মস্তিষ্ক বড় হয়েছিলো বটে, কিন্তু তা একেবারে ওই প্রয়োজনের মাপ অনুযায়ী খাপে খাপে হয়নি। সেই প্রয়োজন মিটিয়েও মানুষ মস্তিষ্কের বাড়তি অংশের কিছু বিলাসী ব্যবহার করতে পেরেছে– তার মধ্যে রয়েছে কল্পনা আর সৃজনশীলতা। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। মানুষ ঘোড়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল, ঘোড়ার স্মৃতি তার মস্তিষ্কে ছিল। একই ভাবে মানুষ বড় পাখিকেও চিনতো এবং তাও তার মস্তিষ্কের স্মৃতিতে ছিল। যখন মানুষ নতুন কোন কিছু চিন্তা করে তার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতীক বা কোড স্নায়ু প্যাটার্ন রূপে মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয়। এরপর চিন্তা যত বিস্তৃত হয় এই কোড প্রতিলিপি হয়ে মস্তিষ্কের খানিকটা জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ও জায়গায়

কোডের প্রতিলিপিগুলোর একটি জটলা বা ‘কলোনির’ সৃষ্টি হয়। তবে প্রতিলিপিগুলো সৃষ্টি হবার সময় একটির থেকে অন্যটিতে ইতস্তত কিছু কিছু পার্থক্য ঘটে– কোড-কলোনিতে তাই কিছু বৈচিত্রও থাকে। এ সময় প্রাসঙ্গিক কোন পূর্ব-স্মৃতির সঙ্গে সামান্য বদলে যাওয়া এই প্রতিলিপিগুলোর কোনটা যদি এমন ভাবে মিলে যায় যে দুইয়ে মিলে একটি অনুরণন (রিজোনেন্স) সৃষ্টি করতে পারে, তার ফলে একটি মিশ্র আইডিয়ার জন্ম হতে পারে। এভাবে ঘোড়ার চিন্তার কোডের সঙ্গে বড় পাখির স্মৃতির অনুরণন ঘটায় উভয়ের নানা উপাদান মিশে ‘পঙ্খিরাজ ঘোড়া’র মত একটি নতুন কিছুর ধারণা মাথায় হয়তো সেদিন কারো কারো এসেছিলো। ওটি কিন্তু কল্পনা, এক ধরনের সৃজনশীলতাও বটে। কিন্তু কল্পনা হলেও পরে কালচারের মধ্যে ঢুকে পড়ে এটি ইন্দিয়ানুভূতি ছাড়াই মানুষের কাছে জ্বলজ্যান্তের মত হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের এই কল্পনার ক্ষমতাটি কালচার সৃষ্টিতে অনেক অবদান রেখেছে।

এভাবেই সৃষ্টি হতে পেরেছে রূপকথা, মীথ, সাহিত্য, অনুকরণীয় আদর্শ, চিত্র শিল্পীর চোখে ধরা পড়া ভিন্ন রকমের বাস্তবতা, আবিষ্কারের শুরুতে নতুন বৈজ্ঞানিক অনুমান ইত্যাদি। এগুলো শুধু সৃষ্টিই হয়নি, প্রজন্মের থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে পুঞ্জীভূত কালচার গড়েছে। সঞ্চারিত করার ক্ষমতা যত বেড়েছে কালচার তত জোরদার হয়েছে। এই সঞ্চারনের উপায় হিসেবে হাত সঞ্চালনের প্রাক্-ভাষা, যোগাযোগ, মুখের ভাষা, লিপি, মুদ্রণ ইত্যাদি একের পর এক এসে কালচারকে জোরদার করে গেছে। আজ ইন্টারনেটের যুগে কিছু কিছু কালচার যে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়তে পারছে পারছে সেখানেও এরই মাহাত্ম্য।

মস্তিষ্কের গঠন চূড়ান্ত হবার পরই কালচার আসতে পেরেছে এই মতের সপক্ষে একটি প্রমাণ দেখানো হয় এই বলে যে কালচার আসার বহু আগে প্রায় ২৫ লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বসূরি মানুষ প্রথম পাথরের ভাল হাতিয়ার তৈরির প্রমাণ রেখে গেছে; কিন্তু পরবর্তী লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সেই হাতিয়ারে তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। এমনকি মানব মস্তিষ্ক যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তখনো হাতিয়ারে পরিবর্তন আসেনি। এর কারণ হিসেবে বলা হয় কালচারের উল্লম্ফনটি তখনো ঘটে ওঠেনি বলেই এমনটি

হয়েছে। এই যুক্তিটির একটি চমৎকার উদাহরণ হলো ২০-২৫ লক্ষ বছর আগে থেকে চলে আসা পাথরের তৈরি হাত-কুঠার। অনেকটা অশ্রু-বিন্দুর আকৃতির এই হাতিয়ার বেশ চেপ্টা ছোট পাথর ওপরের দিকে প্রশস্ত গোল হয়ে এসে এসে নিচের দিকে সরু হয়ে তীক্ষ্ণ হয়েছে। কিনারা ধারালো ও অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হওয়াতে মুঠ করে ধরে আঘাত করে এর দ্বারা ছিদ্র করা, কাটা-চেরা করা সব কাজ হতো। আফ্রিকায় সর্বত্র লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানব বসতিতে এর অসংখ্য নমুনা পাওয়া গেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি– এর আকৃতি, আকার, ডিজাইন ও কার্যকারিতা একই রয়ে গেছে। উড্ডীয়মান কালচারের ক্ষেত্রে এমনটি হবার কথা নয়। কাজেই এই মত অনুযায়ী কালচার এসেছে আরো পরে, আর তখন হাতিয়ারেও দেখা দিয়েছে অনেক বৈচিত্র।

এই শেষোক্ত মত অনুসারীরা বরং বিভিন্ন ধরনের প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার মধ্যে কালচারের ইশারাগুলো লক্ষ্য করতে চেয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদদের কাজ ইউরোপে বেশি হওয়াতে তাঁদের প্রথম নজরে পড়েছে সর্বপ্রাচীন ৩৫-৪০ হাজার বছর আগে ইউরোপে এবং তার কাছের জায়গাগুলোতে মানব-কালচারের কিছু কিছু নমুনা। এর মধ্যে ছিল ফ্লিন্ট পাথরে উন্নত ছুরি, কোরানি, বর্শাগ্র; হরিণের শিং খোদাই করে তৈরি খাঁজকাটা হারপুন ইত্যাদি নানা উন্নত হাতিয়ার। আরো অবাক করা জিনিসগুলো ছিল গুহার ভেতরে এবং বাইরে আড়ালে থাকা পাথরের গায়ে আঁকা নানা জীবজন্তুর চমৎকার সব চিত্র যা বেশ সযত্নে রং-তুলি তৈরি করে আঁকা। তাছাড়া ছিল পাথরে ও ম্যামথের হাড়ে তৈরি কুশলী মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদি; আর ফাঁপা হাঁড়ের মধ্যে ছিদ্র করে তৈরি সুর তোলার বাঁশি। পরে পরে অবশ্য মানুষের আদিম ভূমি আফ্রিকার নানা জায়গায় আরো প্রাচীন কালের কালচার নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার গুহায় পাওয়া গেছে ৭০ হাজার বছর পুরানো উন্নত পাথরের হাতিয়ার, বড় শঙ্খের খোলের মধ্যে তৈরি প্রসাধনী-রঙ, সুন্দর জ্যামিতিক নক্সা করা আয়তাকার ছোট লাল মাটির ডেলা, ছোট ছোট শামুকের মধ্যে ছিদ্র করে তার ভেতর সূতা চালিয়ে গলার মালার অলঙ্কার ইত্যাদি। এসব থেকে অনেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন নান্দনিকতার

উন্মেষ সহ মানুষের কালচারের প্রথম উড্ডয়ন ঘটেছিল আফ্রিকাতে অন্তত ৭০-৮০ হাজার বছর আগে, যখন মানুষের মুখের ভাষাও পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছিলো। উন্নত মস্তিষ্ক এর বহু আগেই এসেছে, কালচার ছিল বিবর্তন-সৃষ্ট সেই মস্তিষ্কের বিলম্বিত রাগ। উন্নত মস্তিষ্ক অবশ্যই কালচার সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে, কিন্তু কালচার মস্তিষ্কের উন্নয়নে তেমন অবদান রাখার সুযোগ পায়নি। এই মতবাদটি মস্তিষ্ক ও কালচারের এক সঙ্গে বিবর্তনের সমর্থক নয়।

এই শেষোক্ত মতটি যদি মেনে নেয়া যায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে বহু লক্ষ বছরের মস্তিষ্ক বিবর্তনে যা হলোনা, মাত্র কয়েক হাজার বছরের মধ্যে সেই কালচার কেন হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে ওড়াল দিলো? এর একটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মস্তিষ্কের উন্নয়ন মানুষের জীবনযাত্রাকে একটু একটু করে উন্নত করে তুলছিলো। বাড়তি উন্নয়নটি হচ্ছিলো মস্তিষ্কের কিছু বাড়তি বৃদ্ধির ফলে। কিন্তু একটি পর্যায়ে এসে তা হঠাৎ উল্লম্ফনের রূপ নিলো। আজকের উন্নয়নটিই তখন থেকে আগামী কালের আরো দ্রুত হারে উন্নয়নের কারণ হয়ে দাঁড়ালো– যাকে কিনা বলা যায় উন্নয়নের এক রকম পজিটিভ ফীডব্যাক বা চক্রবৃদ্ধি। ঠিক তখনই কালচারের পথে উড্ডয়ন সম্ভব হয়েছে। চক্রবৃদ্ধিটি এরপর চলতেই থেকেছে এবং কালচারেরও ক্রম উল্লম্ফন বজায় থেকেছে। উদাহরণ স্বরূপ যে সময় প্রযুক্তি খাদ্য নিরাপত্তা দিয়ে বেশি মানুষকে পোষণ করতে শুরু করেছে, তখন সেই অধিক মানুষের মস্তিষ্কের কাজের ফলে আরো ভাল প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হতে পেরেছে। সেই ভাল প্রযুক্তি আরো অধিক হারে মানুষকে পোষণ করতে পেরেছে যাদের থেকে আরো ভাল প্রযুক্তি সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ প্রযুক্তি মানুষ বাড়িয়েছে, আর সেই বেশি মানুষ আরো প্রযুক্তি বাড়িয়েছে– একটি আরেকটিকে উস্‌কে দিয়েছে। এমনি ভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে হতেই থেকেছে।

এই চক্রবৃদ্ধি মতটির স্বপক্ষে একটি প্রমাণ হলো আফ্রিকায় কালচারের প্রথম উন্মেষের ঠিক পরে পরে কিছু কিছু মানুষ যখন সেখান থেকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো তখন এই নানা অঞ্চলের কোথাও কোথাও একটির থেকে অন্যটি অনেক দূরে দূরে ঘনবসতির জায়গাগুলোতে

পরস্পর থেকে স্বাধীন ভাবে কালচারের পৃথক অগ্রগতি হয়েছে বেশ দ্রুত। যেমন লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে মানুষরা শুধু খাওয়া পরা ও টিকে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল তাদের এখন দেখা গেল ষাট-সত্তর হাজার বছর আগে থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে আফ্রিকায়, মধ্যপ্রাচ্যে, ইউরোপে, অষ্ট্রেলিয়ায় চমৎকার সব শিল্পকর্মের জন্ম দিতে– যার সঙ্গে খাওয়া-পরার সংগ্রামের কোন সম্পর্ক নেই। আরো বেশ কিছু পরে দেখি প্রায় কাছাকাছি সময়ে হাজার দশেক বছর আগে প্রথম মৃৎ-পাত্রের পটারির আবির্ভাব হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জাপানে, মধ্যপ্রাচ্যে, মধ্য আমেরিকায়, এবং আফ্রিকায়। শুধু যেনতেন ভাবে মৃৎপাত্র আবির্ভাবই হচ্ছেনা– এর প্রত্যেকটি জায়গায় তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব শিল্পকর্মে মন্ডিত হয়েই সেটি এসেছে, নিজের কালচারের ঘোষণা দিয়ে।

কৃষি মানুষের কালচারকে এবং জীবন-জীবিকাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছিলো; কৃষি উদ্ভাবনের মত বৈপ্লবিক ঘটনাও এমনিই হাজার দশেক বছর আগে অনেকটা হঠাৎ করেই প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে, এবং কিছু পরে পরে বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন ভাবে পূর্ব চীনে, পাপুয়া-নিউগিণিতে এবং মেক্সিকোতে দেখা দিয়েছে। হাজার পাঁচেক বছর আগে এদিকে মধ্যপ্রাচ্যে মেসোপোটেমিয়া ও মিশরে, এবং পৃথিবীর অন্য প্রান্তে মধ্য আমেরিকায় প্রথম লিপি উদ্ভাবিত হয়েছে। এমন ভাবে বিশেষ বিশেষ উপযুক্ত সময়ে উদ্ভাবনের ফলে মনে হচ্ছে উন্নয়নের এক একটি চক্রবৃদ্ধির মত পর্যায় যেখানে দেখা দিয়েছে সেখানেই কালচারের ওড়াল দেয়া সম্ভব হয়েছে। মনে হয় এসব অঞ্চলের ঘন বসতি, উন্নততর প্রযুক্তি এবং এসব কারণে নিজেদের জনগোষ্ঠির মধ্যে বিভিন্ন কাজের বিশেষায়নের ফলে এমনটি হতে পেরেছিলো। বিশেষায়নের ফলে চিত্রশিল্পী, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, কৃষক, কুমোর, লিপিকার সবাই যার যার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ যেমন আনতে পেরেছিলো তেমনি পণ্য বিনিময় ব্যবস্থারও সূত্রপাত করতে পেরেছিলো। এই বিনিময় ব্যবস্থা বা বাণিজ্য এক সময় নিজের অঞ্চলকে ছাড়িয়ে প্রথমে প্রতিবেশী অঞ্চল, তারপর দূরে-দূরান্তরে কালচারকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। এভাবে শুধু খাওয়া-পরার পণ্য বিস্তৃতি পায়নি, এভাবেই চলে গেছে প্রযুক্তি, রূপকথা, মীথ, প্রাচীন গল্প, শিল্পকর্ম,

জীবনযাত্রার কেতা-কানুন ইত্যাদিও। এটিও কালচারের উড্ডীয়মান হওয়াকে সুবিধা করে দিয়েছে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে এত বড় বড় ঘটনাগুলো কেমন করে সম্ভব হয়েছিলো সেটি বুঝতে শেষ অবধি জিনের দিকে তাকাতে হচ্ছে। জিনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক হলো টিকে থাকার ও সন্তান দিয়ে যাবার। সেই মৌলিক সংগ্রামে হয়তো কালচারের কোন ভূমিকা ছিলনা। তবে তার মধ্যেই এমন কিছু জিন ওই টিকে থাকার সংগ্রামে, মস্তিষ্ক গড়াতে কার্যকর হয়ে ওঠেছিলো যা তথ্যকে ধারন করতে, সঞ্চারিত করতে, এবং জমিয়ে রাখতে সহায়ক হয়ছিলো। আবার জিন-প্রকাশের এপিজেনেটিক ব্যবস্থার গোলাক ধাঁধার মাধ্যমে বর্তমান পরিবেশের প্রবেশের যে সুযোগ আমরা দেখেছি তাও এই তথ্য-জিনগুলোর ক্ষেত্রেও কাজ করেছে। ফলে জিনগুলো অতীতের মানুষের জেনেটিক তথ্য যেমন বহন করে এসেছে, তেমনি বর্তমান পরিবেশেও সেই প্রাচীন জিনের প্রকাশে প্রভাব রেখেছে। মানুষ অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি যেখানে যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে তাতেও সেই জিনগুলোর প্রকাশ সাড়া দিয়েছে। তাই যদিও মূল সংগ্রামে এসব ছিলনা, পরিবেশের উন্নয়নের চক্রবৃদ্ধি এই তথ্য-জিনের সহায়তায় কালচারকে উড়তে দিয়েছে। এই পর্যায়ে এসে উন্নত প্রযুক্তি ও ভাষা যে প্রতীকী ও বিমূর্ত আইডিয়াগুলোর বিস্তার ঘটিয়েছে তথ্য-জিন প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাকে ধারণ করতে, সঞ্চারিত করতে ও জমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে– যদিও এই জিনের মূল উদ্দেশ্য কালচার সম্পর্কিত ছিলনা। এটিই মানব প্রজাতির ভাগ্য সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। নইলে নগর, কৃষি বা চিকিৎসার মত জিনিস; এবং আরো যে অসংখ্য জিনিস মানুষকে অনন্য করে তুলেছে তা সম্ভব হতোনা; উন্নততর মস্তিষ্ক সত্ত্বেও।

পলিটিক্স, শান্তি, নৈতিকতা – কালচারে এমনিতরো বিষয়

কালচার গড়ে ওঠেছে সমাজবদ্ধ মানুষের ভেতর, আর সমাজবদ্ধতার মধ্যে পলিটিক্সের আনা-গোনাটি খুব স্বাভাবিক। এই পলিটিক্সের মূল ধারা সম্পর্কে দীর্ঘদিন যে ধারণাটি সমাজবিজ্ঞানে গুরুত্ব পেয়ে এসেছিলো তা হলো এর মধ্যে সমাজের মানুষরা সবাই মিলে একটি ‘সামাজিক সমঝোতা’র সৃষ্টির

চেষ্টা করে, আর সে কারণেই সমাজ গড়ে উঠতে পেরেছে। সামাজিক সমঝোতার ধারণার মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন তা হলো সমাজের মানুষরা ঝানু অর্থনীতিবিদের মত লাভক্ষতির হিসেব কষে সিদ্ধান্তে এসেছে– পুরো সমাজের কীভাবে লাভ বা ক্ষতি হবে। কিন্তু বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের বিকাশের যে বর্ণনা বিজ্ঞান দেয় তা শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে, সমাজকে নিয়ে নয়। বিবর্তন হচ্ছে আগাগোড়া ব্যক্তির টিকে থাকা আর ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধির সুবিধার ব্যাপার– সেখানে সত্যিকার সমাজের স্বার্থ, বৃহত্তর পরিবেশের স্বার্থ কোনটিই স্থান পায়না। তারপরও কিন্তু মানুষের সমাজ গঠনে বিবর্তন যে উৎসাহ যুগিয়েছে তাতে ব্যক্তির নানা রকম পরোক্ষ সুবিধার কারণে। আপাত দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তি-স্বার্থের হানি হচ্ছে মনে হলেও আখেরে কিন্তু ব্যক্তির টিকে থাকার সুবিধাই হচ্ছে। আমাদের ইতোমধ্যে দেখা পারস্পরিক উপকারকে আমরা এর একটি উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। এখানে অন্যের উপকার করতে ব্যক্তি কিছু আত্মত্যাগ করছে, কিন্তু পরে এই উপকার সে ফিরে পাচ্ছে– এসব তার টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, আর এ কারণেই পারস্পরিক উপকারের সামাজিক ব্যাপারটি বিবর্তিত হয়েছে ব্যক্তিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই। শুধু তাই নয় আমরা দেখেছি অন্যের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য এবং বিশ্বাস-ভঙ্গের সম্ভাবনা কমাবার জন্য কীভাবে মস্তিষ্কে সামাজিক আবেগগুলো বিবর্তিত হয়েছে; যার মধ্যে আছে ভালবাসা, সহানুভূতি, রাগ, ঈর্ষা ইত্যাদির মত আবেগ। এভাবেই বিবর্তন পরোক্ষভাবে সমাজ গঠনে ও কালচার সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়েছে।

সমাজ নয়, ব্যক্তির স্বার্থ দেখাকে গুরুত্ব দিয়েই অতীতে আমরা বিবর্তিত হয়েছি সে কথা মনে রেখেও আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী হতে পারি, পুরো মানব সমাজের মঙ্গল করার ক্ষেত্রে। আমাদের বিশ্বাস নিজেদের জিনের ব্যক্তি-প্রবণতাগুলোকে অগ্রাহ্য করেই আমরা সবার সমঝোতাতে দারিদ্র দূর করে অর্থনৈতিক সাম্য আনতে পারবো, পরিবেশের অবক্ষয় দূর করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন এড়িয়ে মানুষকে ও জীব-বৈচিত্রসহ পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবো, যুদ্ধ নিষিদ্ধ করে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। আমাদের এই

বিশ্বাসের কারণ মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার ওপর নিজেদের আস্থা। সত্যিই সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের নানা দেশ, নানা কালচারকে একত্রে বসিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে একটি পর্যায় পর্যন্ত এরকম কিছু আমরা করতে পেরেছি এবং সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে ভাবে জাতিসংঘ ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলোকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত নানা আঞ্চলিক সংস্থাগুলোকে কিছুটা সফলভাবে কার্যকর হতে দেখেছি, এবং নিকট অতীতে দেখা নিজেদের ভয়াবহ প্রবণতার বিপরীতে গিয়ে অন্তত আর একটি মহাযুদ্ধ এতকাল এড়িয়ে যেতে পেরেছি, তাতে আশাবাদের কারণ আছে বৈকি। কিন্তু এর সত্যিকার বাস্তবায়নের পথটি যে কত কঠিন, এর চ্যালেঞ্জটি কত বড় সে কথা ভুলে থাকা উচিত হবেনা। এমন কঠিন হওয়ার নানা উপাদান আমাদের নিকট ও দূর অতীতে প্রচুর রয়েছে এবং আমাদের বিবর্তনেও রয়েছে।

প্রথমেই সেই নৈতিকতার প্রশ্নটি নেয়া যাক যার ওপর আস্থা থেকেই আমাদের আশাবাদ। নৈতিকতায় আস্থার বড় কারণ হলো এটি আমাদের বিবর্তনের অংশ, আমাদের সঙ্গে অঙ্গীভূত। সাধারণ দুটি কথার পার্থক্য থেকেই আমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারি। যখন অনুজ প্রতিম কাউকে বলি ‘চুরি করবেনা’, সে কথার মধ্যে আমার যে রকম জোর আর তীব্রতা রয়েছে, যখন বলি ‘হাফ প্যান্ট পরে কলেজে যাবেনা’ তার মধ্যে সেই তীব্রতা কাজ করেনা। হাফ প্যান্টের ব্যাপারটি হলো আমাদের স্থানীয় একটি রুচির বা নিয়মের ব্যত্যয় আর চুরির ব্যাপারটি হলো একটি নৈতিকতার স্থলন– যার অন্যায়ের শেকড় অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত, অনেক বেশি সর্বজনীন ও চিরায়ত। নৈতিকতার ব্যাপারটি আমাদের আবেগের মতই বিবর্তনের ভেতর দিয়ে সৃষ্টি। তবে শেষ অবধি নৈতিকতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাতে সেটি এক রূপে নয়, অন্তত তিনটি রূপে দেখা দিয়ে থাকে। এর একটি হলো সবার প্রতি সুবিচার করা– যেমন চুরি এই জন্যই অনৈতিক যে যার জিনিস চুরি যায় সে সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয় রূপটি হলো যার যার যথা-মর্যাদা রক্ষা করা। এর মানে প্রত্যেককে যথাযথ সম্মান দেখিয়ে তার প্রতি কর্তব্য পালন করা– সেটি মাতাপিতা, গুরুজন, রাজা, রাষ্ট্র, আদালত সবার ক্ষেত্রে

প্রযোজ্য। সাম্প্রতিককালে প্রত্যেক মানুষকে এভাবে মর্যাদা দেয়াকেও অনেকে নৈতিকতা মনে করেন, তবে সবাই তা কার্যত করেননা, নৈতিকতার তৃতীয় আর এক রূপ হলো বিশুদ্ধতা বজায় রাখা যা অনেকটা শুচি-অশুচির ব্যাপারের মত। যদিও আমরা সব সময় সেভাবে লক্ষ্য করিনা নৈতিকতার এই তিন রূপই কিন্তু পাশাপাশি বজায় আছে আর বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সুবাদে কোন্‌টি নৈতিক কোন্‌টি অনৈতিক তা এক একটি কালচারের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে যেতে পারে। কাজেই নৈতিকতার সেই অমোঘ নিরেপক্ষতা আর বজায় থাকেনি– ওটি প্রায়শ কালচার নির্ভর হয়ে পড়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ প্রথমটি অর্থাৎ সুবিচারের বিষয়টি নিলে আজও দুনিয়ার মূলস্রোত সব কালচারে নৈতিকতাকে অলংঘনীয় মনে করেও যুদ্ধের ক্ষেত্রে শুধু বিজেতার বিচারকে সুবিচার মনে করা হয়। বলতে গেলে পুরো বিশ্ব মনে করে যে যুদ্ধে যে জিতেছে তার পক্ষের সুবিচারগুলোই নায্য (যেমন যুদ্ধের মধ্যে সংঘটিত অপরাধগুলোর বিচারে), যে হেরেছে তার পক্ষেরগুলো নয়। মর্যাদার কথা বল্‌লে রাজাজ্ঞা যে শিরোধার্য, এবং নৈতিকতার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ভিত্তিতেই দুনিয়ার বড় অংশের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে– সেটি রাজার সম্মান বজায় রাখার নৈতিকতা। আর ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে একাধিক কালচারের মধ্যে এখনো পরিবারের ‘সম্মান’ রক্ষার জন্য নিজের ভাই, বাবা, এবং এমনকি মা’কেও দেখা যায় অবাধ্য বোন বা মেয়েকে খুন করতে। তারা নিজেদের নৈতিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেনা। আর বিশুদ্ধতা বা শুচি-অশুচির নৈতিকতাও বহু ভাবে দেখা দিতে পারে পুরানো জাত-পাতের বিশুদ্ধতায় যেমন তেমনি বিংশ শতাব্দীতে অষ্ট্রেলিয়ার অভিবাসন নীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে ‘অষ্ট্রেলিয়াকে সাদা রাখ’ এই সংকল্পকে নৈতিক মনে করাতেও। কেউ হয়তো বলবেন এই উদাহরণগুলোর মধ্যে তাঁরা নৈতিক কিছুতো তো তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না, বরং এগুলোর প্রত্যেকটি ঘোরতর অনৈতিক কাজ, গায়ের জোরে নৈতিক বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এমন রায় দুনিয়ার সবাই একমত হয়ে দিতে পারছে কিনা, পারবে কিনা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারতে

দেখা যাচ্ছে, সেটি আশার কথা। কিন্তু নৈতিকতায় পক্ষপাত খুবই বাস্তব বিষয়, এটি ভবিষ্যতের সমঝোতা প্রতিষ্ঠাকে কঠিন করে তুলেছে।

এই বইয়ের বিবর্তনের সৃষ্ট এমন কিছু বিষয়ের সাক্ষাত আমরা পেয়েছি যার থেকে সেই কঠিন চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে আরো ধারণা পাই। যেমন আত্মীয়তা ভিত্তিক উপকারের (যার অন্য নাম স্বজনপ্রীতি) শেকড় আমরা আত্মীয়ের মধ্যে একই জিন থাকার ওপর নির্ভর করতে দেখেছি। এটিই যুগে যুগে গোষ্ঠির সঙ্গে গোষ্ঠির সংঘাতে ইন্ধন যুগিয়েছে, সামনেও যোগাবে। আবার ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, এমনকি অসামাজিক আচরণকে আমরা সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে হলেও কিয়দংশে বংশগতির ওপর নির্ভর করতে দেখেছি। এর মানে যে কোন সমাজে নানা সদস্যের মধ্যে উন্নতির সুযোগের মধ্যে কিছু তারতম্য সহজাত ভাবেই থেকে যাবে। এই অসাম্যকে দূর করতে হলে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কিছুটা খর্ব করে সমাজকে হস্তক্ষেপ করতেই হবে– কেউ যদি তাতে সুবিচারের অভাব বোধ করে তবুও। এটিও সাম্য আনার কাজটিকে কঠিন করে দেয়। জিন-বিস্তারের যে মৌলিক প্রবণতা তা পুরুষের ক্ষেত্রে ও নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপ ধারণ করতে আমরা দেখেছি। এতে নারী-পুরুষ সম্পর্কে যে টানা-পোড়েন সৃষ্টি করে এবং তাও যে নানা অনর্থের জন্ম দিতে পারে সেটিও অনস্বীকার্য। এরকম অনেক সহজাত বিষয় একটি অমোঘ সর্বজনীন নৈতিকতা ভিত্তিক সমঝোতাকে কঠিন করে দেয়; তবে তা অসম্ভব নাও হতে পারে।

কালচারের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিতে ও শান্তি সৃষ্টিতে সব সময় একটি প্রতিবন্ধকতা এসে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে মানুষের স্বভাব-জাত সহিংসতা। অতি সাম্প্রতিক কালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও আমরা দেখেছি নিজেদের উন্নত কালচার নিয়ে সব চেয়ে গর্ব করা জাতিগুলোই কী ভাবে রাষ্ট্রীয় আয়োজনে একাধিকবার সহিংসতাকে একেবারে চরমে নিয়ে গিয়ে মারণযজ্ঞে মেতেছিলো। মানুষের একেবারে আদি পর্ব থেকেই এই সহিংসতা ব্যক্তিগত থেকে শুরু করে সব পর্যায়ে যে খুবই বিস্তৃত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে– যুগে যুগে যেই অজুহাতই এর জন্য ব্যবহার করা হোক না কেন। মানুষের এই সহিংসতার উৎস কোথায়? এর একটি গা-বাঁচানো উত্তর হলো এ

সহিংসতাটি মানুষের অন্তর্নিহিত কিছু নয়, এটি একটি অশুভ অসুস্থতা মাত্র যাকে কেউ কেউ মাঝে মাঝে নিজ স্বার্থে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এটি বলতে চায় সহিংসতা ব্যক্তির মধ্যে নেই, সমাজে বা কালচারে একে সৃষ্টি করা হয়।

কিন্তু ব্যাপারটি কি আসলে তাই? বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। সহিংসতার সঙ্গে বংশগতির সম্পর্ক রয়েছে– সহিংস বাবার কোন কোন ছেলের সহিংস হবার সম্ভাবনা সাধারণ গড়পড়তা কারো সহিংস হবার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি দেখা গেছে। এর ব্যাখ্যায় অবশ্য জেনেটিক কারণের বদলে পরিবেশের কারণটি অনেকের দেখিয়ে থাকেন এই বলে যে চোখের সামনে বাবার সহিংসতা দেখে দেখে ছোটরা এতে অভ্যস্ত হয়েছে। এই ধারণা টেকেনি যখন দেখা গেছে একই পরিবারের দত্তক নেয়া সন্তান কিন্তু এই সহিংস বাবাকে অনুসরণ করছেনা, শুধু নিজের জৈবিক সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ করছে; আবার তারাও সবাই করছেনা। একই রকম কারণে আজকালকার পরিবেশে সহিংসতার প্রচার বেশি বলে কিশোর-তরুণরা সহিংস হয়ে ওঠছে এমন জনপ্রিয় ধারণাটিও ধোপে টেকেনা। অনেকে কথায় কথায় বলেন সিনেমা, টেলিভিশন, ইন্টারনেটে সহিংসতা ভিত্তিক কাহিনী দেখে দেখে তরুণরা সহিংস হয়। মারপিঠ খুন-খারাবিতে হাত পাকানো অনেকে মিডিয়ার কল্যাণে আজ হিরো, এবং কিশোররা ওই হিরোদেরকে অনুকরণীয় রোল-মডেল করে নিজেরাও সহিংস হচ্ছে। কিন্তু এই একই সমাজে ওই গণমাধ্যমেই যে অনেক নীতি-বক্তা, পপ-গায়ক, কমেডিয়ানরাও ব্যাপক ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে তাদেরকে কেন ওই কিশোররা নিজেদের অনুকরণীয় মনে করছেনা? তা হলে বলতে হয় দোষটি যতটা না ওই গণমাধ্যমের তার চেয়ে অনেক বেশি ওই কিশোরদের জিন-সৃষ্ট প্রবণতার। তাছাড়া ওই গণমাধ্যমের আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই সহিংসতার যে খতিয়ান পাওয়া যায়, সেটিওতো কম ভয়াবহ নয়।

হ্যাঁ গণমাধ্যমের বাড়াবাড়ি কিশোর সহিংসতার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রাখতেই পারে। সে রকম বন্দুকের সহজলভ্যতাও তাতে অবদান রাখে। পাশাপাশি দুই দেশ যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা একই রকম গণমাধ্যম দেখতে অভ্যস্ত হলেও এবং দু'দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠির জাতিগত বৈচিত্র প্রায় একই হলেও

সহিংসতার ঘটনার দিক থেকে যে উভয়ের আকাশ-পাতাল তফাত তা হয়তো ওই বন্দুক-কালচারের ভিন্নতার কারণে। সেভাবে সম্পদের চরম বৈষম্য, চরম দারিদ্র, জাতিগত বৈষম্য ইত্যাদিও সংহিংসতার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। কিন্তু এর কোনটাই একই ভাবে বিদ্যমান থেকেও সব জনগোষ্ঠির ওপর সমান প্রভাব রাখেনা। যেমন বন্দুক কালচারের কথা বলতে গেলে সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সর্বজনীন সামরিক প্রশিক্ষণের সময় দেয়া রাইফেলগুলো সদা-প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হয়। কিন্তু সেখানে এই আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যবহার হয়ে সহিংস ঘটনা ঘটতে কচিৎ দেখা গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার সকল জনগোষ্ঠির মধ্যে সব চেয়ে দরিদ্র এবং সব চেয়ে বৈষম্যের শিকার অভিবাসী ছিল কালিফোর্নিয়ায় আসা চীনা মানুষরা। অথচ ওসময় যুক্তরাষ্ট্রের সব জাতিগোষ্ঠির মধ্যে ওদের সহিংসতা ছিল সব চেয়ে কম। কাজেই গণমাধ্যমের বাড়াবাড়ি, অস্ত্রের সহজলভ্যতা, দারিদ্র, বৈষম্য সবই অবদান রাখতে পারে বটে কিন্তু তা নির্ভর করছে আমরা কোন্ মানুষদের কথা বলছি তার ওপর– অর্থাৎ জিনের ওপর।

কিন্তু এও আমরা দেখছি শুধু জিন নয়, জিনের প্রকাশ ঘটার পরিস্থিতিও কম দায়ী নয়। সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কের বাসিন্দা স্ক্যান্ডিনেভিয়ানদের এখন যে জিন আছে হাজার বছর আগেও সেই জিনই ছিল। এই মানুষদেরকে এখন দুনিয়ার সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষদের অন্যতম বলেই সবাই জানে। অথচ হাজার খানেক বছর আগে তাদের পূর্ব পুরুষ ভাইকিংরা ইউরোপের বিশাল অংশে হানা দিয়ে হত্যা, অত্যাচার ও মাধ্যমে দীর্ঘ একটি সময় ত্রাসের সঞ্চার করে রেখেছিলো। স্পষ্টত মানুষের মধ্যে সহিংসতার জিন যথেষ্ট থাকলেও সময়, পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার প্রকাশে বিরাট ভিন্নতা ঘটতে পারে। এক ভাবে দেখতে গেলে এখানে মানুষের মন তার নিজের মধ্যেকার সহিংসতাকে কতখানি সংযত করছে বা করছেনা তারই প্রকাশ ঘটছে। এদিক থেকে মনকে বোঝাটিও জরুরী, শুধু জিনকে নয়। কালচারের মধ্যে মনকে প্রভাবিত করে বর্তমান স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় এমন সর্বজনীন শান্তিপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব হয়েছে। একই ভাবে সারা দুনিয়ায় তা না করতে পারার কারণ নেই।

সহিংসতা যে জিনের কারণে মানুষের মধ্যে সহজাত এ কথাটি মনে না রাখলে ওই লক্ষ্যে এগুনোর সঠিক কৌশল খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এই সহজাত মনে করার আরো কিছু কারণ দেখা যাক। অন্যান্য বহু প্রাণীতে সহিংসতা রয়েছে বটে কিন্তু তার অধিকাংশই শিকারির শিকার ধরার সঙ্গে যুক্ত। অথচ জেনেটিক দিক থেকে মানুষের নিকটতম প্রাণী শিম্পাঞ্জির মধ্যে সহিংসতার প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে খুবই মেলে। উভয়ের ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ভাবে, দলবদ্ধ হুজুগ তুলে, এবং অনেক সময় এক দলের ওপর আরেক দলের আক্রমণে যুদ্ধ বাধিয়ে সহিংসতা দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ভাবে যারা সাধারণত সহিংস আচরণ করেনা তারাও দলে পড়ে চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে পারে। আমাদের দেশে হাটুরে মার, বা উম্মত্ত জনতার নিষ্ঠুরতা যারা দেখেছে তারা একথা স্বীকার করবে। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির জিনের সাদৃশ্য ও সহিংসতার সাদৃশ্য উভয়ে থাকায় এটিও সহিংসতার জেনেটিক উৎসের একটি প্রমাণ। ওই জিন মস্তিষ্ককে ওভাবে গড়েছে বলে মস্তিষ্ক এ ধরনের আচরণের জন্ম দেয়। মস্তিষ্ক যে তা করতে পারে তার আর একটি প্রমাণ মস্তিষ্কের ওপর বিশেষ কিছু মাদকের প্রভাবে যেমন অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে, অথবা আঘাত পেয়ে মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অস্বাভাবিক ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অত্যন্ত বেশি রাগ সৃষ্টি হতে পারে এবং নিষ্ঠুর ও সহিংস আচরণও দেখা দিতে পারে।

মজার ব্যাপার হলো দুনিয়াজোড়া অসংখ্য মানুষ যারা নিজের মধ্যে বিন্দুমাত্র সহিংসতার প্রকাশ ঘটতে দেয়না, তারাও কিন্তু মানসিক ভাবে সহিংসতার কথা ভাবে এবং সহিংস দৃশ্যে ভরপূর সিনেমা দেখা, বই পড়া ইত্যাদি উপভোগ করে। গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তার একটি কারণ হলো এতে হত্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। একই কারণে মানুষ আজকের মল্লযুদ্ধ, মুষ্টিযুদ্ধ এগুলো দেখতে যেমন ভালবাসে তেমনি আবার প্রাচীন কাহিনীতে, মহাকাব্যে নিষ্ঠুরতার বর্ণনাগুলো উপভোগ করে। রোমান গ্ল্যাডিয়েটরদের জীবন-মরণ যুদ্ধগুলো দেখতে রোমের কলোসিয়ামে যে হাজার হাজার দর্শক হাজির হতো তারা যে ব্যক্তিগত ভাবে খুব নিষ্ঠুর মানুষ ছিল তা বলা যাবেনা।

মস্তিষ্কে বিবর্তনসৃষ্ট সহিংসতার আয়োজন থাকলেও একই সঙ্গে বিবর্তনসৃষ্ট নৈতিকতার আয়োজনও আছে, যা বলে দেয় যে মানুষ হত্যা মহাপাপ। কিন্তু এখানেও সেই সমস্যা থেকে যায়; নৈতিকতার অনেকখানিই যে আপেক্ষিক, নিজ নিজ মূল্য বিচারের বিষয়। তাই কারো কাছে হত্যার মত গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিসেবে অথবা কথিত ষড়যন্ত্র, রাষ্ট্রদ্রোহ, বা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মৃত্যুদন্ড দিয়ে মানুষ হত্যা খুবই নৈতিক; আবার অন্যের কাছে যে কারণেই হোক মানুষ হত্যা মাত্রই অনৈতিক। কারো কাছে অপরাধীকে জেরা করার সময় নির্যাতন করে কথা আদায় করা নৈতিক, কারো কাছে তা ঘোরতর অনৈতিক। যা ছিল জেনেটিক্সের বিষয় তা শেষ পর্যন্ত এভাবে মূল্যবিচার অথবা পলিটিক্সের বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। এ কারণেই জিননির্ভর হয়েও এখানে কালচারভেদে, কালভেদে, পরিস্থিতিভেদে নানা তারতম্য এসে পড়ছে, সর্বজনীন হচ্ছে না। সর্বজীন ভাবে শান্তির প্রতিষ্ঠা এজন্যই সমস্যা সংকুল হয়েছে। বহুদিন আগে দার্শনিক হরস মানুষের সহিংসতার তিনটি কারণ নির্ণয় করেছিলেন– প্রতিযোগিতা, নিজের ওপর আস্থাহীনতা এবং সম্মান-অসম্মান বোধ। আজকের পরিস্থিতিতেও কারণগুলো খুব যথার্থ মনে হয়।

প্রতিযোগিতা বিবর্তনের অপরিহার্য অংশ, টিকে থাকার লক্ষ্যে। একই ভাবে দয়া এবং সহানুভূতিও বিবর্তনেরই সৃষ্টি। কাজেই প্রতিযোগিতা সব সময় সহিংস হয়না। কিন্তু যখনই মানুষ কাউকে নিজের বৃত্তের বাইরের বলে মনে করেছে (অনাত্মীয়, ভিনগোষ্ঠির, ভিন-কালচারের হওয়ার কারণে) তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দয়া বা সহানুভূতি স্থান পায়নি। এ কারণেই আমেরিকায় ইউরোপীয় বসতকারীরা নিশ্চিন্তে আদিবাসী 'রেড ইণ্ডিয়ানদেরকে' হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করতে পেরেছিলো, মায়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ বার্মানরা রোহিঙ্গাদের প্রতি এতখানি নির্মম হতে পেরেছে– বৃত্তের বাইরের মানুষের প্রতি সহিংসতাকে তাদের কাছে সহিংসতাই মনে হয়নি, নায্য প্রতিযোগিতা মনে হয়েছে।

নিজের প্রতি আস্থাহীনতাও মানুষকে সহিংস করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (জুনিয়র) দেশবাসী থেকে ইরাক আক্রমণে সমর্থন আদায়ের জন্য

ইসলামী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিজেদেরকে অসহায় ভাবতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তখন বলতেন ওরা এখানে এসে পৌঁছে আমাদেরকে আক্রমণ করার আগে আমাদেরই উচিত ওখানে গিয়ে তাদেরকে আক্রমণ করা। একই ধরনের আস্থাহীনতাবোধ বা আশঙ্কাবোধ যুগে যুগে সহিংসতাকে সৃষ্টি করেছে। সম্মান-অসম্মানের ব্যাপারটিকে সহিংসতার সঙ্গে জড়ানোটিও বিবর্তনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা পেয়েছে এক অদ্ভুত ভাবে। যারা সম্মানের ব্যাপারে নিজেদের খুবই কড়া সংবেদনশীলতার কথা সম্ভাব্য শত্রুদের কাছে প্রমাণ করতে পেরেছে তাদের ক্ষতি করতে ওই শত্রুরা সাহসী হয়নি 'সম্মান' রক্ষার্থে চরম প্রতিশোধের ভয়ে। এজন্যই মধ্যযুগের ইউরোপীয় নাইটরা নিজেকে ও নিজের প্রিয়তমাকে জড়িয়ে সম্মানের একটি জটিল বাতাবরণ সৃষ্টি করতো যাতে কেউ সেটি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন করে প্রাণঘাতী যুদ্ধে না জড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীতে সম্মানিতা প্রিয়ার প্রতি অথবা নিজের প্রতি সামান্য একটু অপ্রিয় মন্তব্যের জন্য পিস্তল হাতে ডুয়েল (দ্বন্দ্ব যুদ্ধ) লড়ার ঐতিহ্যও এই কারণেই সৃষ্টি হয়েছিলো। আবার জাতীয়তা বোধ, জাতীয় গৌরব, জাতীয় সম্মান ইত্যাদির পথ ধরেই শুরু হয়েছে বহু বড় বড় যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত। সহিংসতার এই উৎসগুলো ঠিকমত বিশ্লেষণ করতে পারলে সর্বব্যাপ্ত স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়তো সম্ভব হবে।

যৌন নির্বাচনের মাধ্যমে সুকুমার কলা সৃষ্টি

কালচারের সবচেয়ে সুন্দর প্রকাশ ঘটে এর সুকুমার কলায় (আর্টস) – যেমন চিত্র-কর্মে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, সাহিত্যে, এমনকি হাস্যরস সৃষ্টিতেও। অনেক সময় তাই আমরা কালচার বলতে সুকুমার কলাকেই বুঝি। এতে বেশি লক্ষ্য করার কারণ হলো এর মাধ্যমেই মানুষ বিবর্তনের প্রধান গরজ টিকে থাকার অনিবার্য প্রয়োজনকে অতিক্রম করে 'অপ্রয়োজনীয়' বিলাসিতাকে বরণ করতে পেরেছে। তাই কালচারের সূচনা থেকে মানুষ প্রচুর আগ্রহের সঙ্গে গায়ে-মুখে রং মেখে প্রসাধন করেছে, অলঙ্কার তৈরি করে তা পরেছে, চিত্রকর্ম গড়েছে, গান গেয়েছে, বাঁশিতে সুর তুলেছে, কাল্পনিক গল্প-হাসির কথা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছে। এসব তারা কেন করতে গেল এ নিয়ে

নানা মত আছে বটে, কিন্তু অতি সম্প্রতি এর একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– তা হলো মানুষ সুকুমার কলা সৃষ্টি করেছে তার যৌনসঙ্গীর তাগিদে।

বিশেষ কোন বৈশিষ্টের বা গুণের দিকে পক্ষপাত দেখিয়ে যৌনসঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারটিকে বলা হয় যৌন নির্বাচন, আর মানুষ সহ নানা প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম যৌন নির্বাচন হতে দেখা যায়। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীতে যৌনসঙ্গী নির্বাচনের কাজটি সব সময় স্ত্রী প্রাণীই করে। স্ত্রীই ঠিক করে কোন পুরুষের সঙ্গে সে যৌন মিলন করবে। সেই পুরুষটিকে সে সাধারণত বেছে নেয় তার কোন দৈহিক বৈশিষ্টের কারণে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার কিছু আচরণগত বৈশিষ্টের কারণেও। বহু ক্ষেত্রে পুরুষটি অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রজননকালীন লড়াইয়ে জিতেছে বলেও স্ত্রী তাকে নির্বাচন করে। মনে করা হয় যে প্রজনন প্রক্রিয়ার মধ্যে সঠিক সঙ্গী নির্বাচনে স্ত্রীর গরজটি বেশি বলে সব সময় স্ত্রীই পুরুষকে নির্বাচন করেছে, পুরুষ স্ত্রীকে নয়। স্ত্রীর গরজ বেশি হওয়ার কারণ সন্তান ধারণে পুরুষের চেয়ে অধিক আত্মনিয়োগ ও শক্তিক্ষয়। কাজেই উত্তম সঙ্গীর মাধ্যমে উত্তম সন্তান লাভের গরজটিও তারই বেশি। এরকম যৌন নির্বাচনের ফলে পুরুষের যে সব বৈশিষ্টকে স্ত্রী প্রাণী পছন্দ করেছে সেগুলোই পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে সন্তানদের মধ্যে বেশি বেশি সৃষ্টি হয়েছে ওই জিনগুলোর প্রসারণের ফলে। উদাহরণ স্বরূপ অতীতের কিছু ময়ূরী জিন মিউট্যাশনের কারণে শুধু লম্বালেজ আর বাহারি পেখমযুক্ত ময়ূরকে যৌন সঙ্গী নির্বাচন করাতে প্রজননের বাড়তি সুযোগ পেয়ে এরকম ময়ূরই সন্তানদের মধ্যে বেশি দেখা গিয়েছিলো। প্রথম দিকে ব্যাপারটি পরিমিত লম্বা লেজের বিষয় থাকলেও ক্রমে প্রজন্মের পর প্রজন্মে ময়ূর আরো লম্বা লেজ আরো বাহারি পেখম পেয়েছে, ময়ূরীর পছন্দও ওভাবেই বিকশিত হয়েছে। ফলে আজকের ময়ূরের এসব বৈশিষ্টের কারণটি হলো ওই যৌন নির্বাচন। যৌন নির্বাচনের ফলে অন্য রকম ময়ূর বংশ বৃদ্ধির সুযোগই পায়নি, তাই সে রকম ময়ূর আর নেই। নানা প্রাণীর পুরুষদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট সৃষ্টি যে যৌন নির্বাচনেরই ফল, তা স্বয়ং চার্লস ডারউইন তাঁর বিবর্তন তত্ত্বের মধ্যেই দেখিয়েছেন।

এ ভাবেই অন্য পুরুষ প্রাণীদের যার যার অন্য কিছু বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে– মোরগের রঙচঙে পালক, মাথায় টকটকে লাল চূড়া; রঙিন পাখির বাহারি পালক ও লেজ, মাথায় ঝুঁটি, গলায় ঝুলে পড়া লাল চামড়া, গলায় ইচ্ছে মত ফোলানো রঙীন বেলুন; ষাঁড়ের দৃষ্টি কাড়া শিং; হরিণের শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত শিং; সিংহের কেশর; ইত্যাদি। শুধু তাই নয় কোকিলের ও অন্যান্য পাখির গান; নানা পাখির প্রজননকালীন জটিল নাচ; বাবুইয়ের মত পাখির অদ্ভুত সৌকর্যে বাসা তৈরি ইত্যাদি সব আচরণও শুধু পুরুষ প্রাণীরাই করে এবং এগুলোর কারণও যৌন নির্বাচন। দৈহিক হোক, আচরণগতই হোক কেন যে স্ত্রীরা পুরুষের এই বৈশিষ্টগুলোই নির্বাচিত করেছে সেটি স্পষ্ট নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় এগুলোর দ্বারা পুরুষের অধিক স্বাস্থ্য ও শক্তি প্রকাশিত হয় বলেই তা নির্বাচিত হয়েছে। অন্য ক্ষেত্রে সে রকম কিছু মনে হয়না, নেহাতই কোন দৈব মিউট্যাশনের কারণে স্ত্রী-প্রাণীর এই পছন্দ সৃষ্টি বলে মনে হয়। সাধারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনে যেমন টিকে থাকা ও বংশবৃদ্ধি উভয়েই গুরুত্ব পেয়েছে, যৌন নির্বাচনে বংশবৃদ্ধিটিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট বৈশিষ্টগুলো ক্রমেই বেড়েছে বটে কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে তাকে সীমা টানতে হয়েছে কারণ তা টিকে থাকার ক্ষেত্রে খুব বড় বাধা হয়ে যাচ্ছিল– যেমন ময়ূরের লেজ অতিরিক্ত বড় হয়ে চলাচলে অসুবিধা ও শিকারির দৃষ্টি আকর্ষণে।

সব প্রাণীর ক্ষেত্রে অবশ্য যৌন নির্বাচন বাহারি বৈশিষ্টের কারণে ঘটেনা, তাদের ক্ষেত্রে ঘটে পুরুষদের মধ্যে প্রজননের কালে প্রাণপণ লড়াই এবং লড়াইয়ে জয়ী পুরুষটাকে স্ত্রীর নির্বাচন করার মাধ্যমে। নির্বাচনের কারণটি অবশ্য এক্ষেত্রে স্পষ্ট– জিতে যাওয়া পুরুষটি সব চেয়ে বেশি শক্তিধর, কাজেই সন্তানেরও শক্তিধর হবার সম্ভাবনা বেশি। নির্বাচনের কোন কারণ অবশ্য এসব ক্ষেত্রে স্ত্রী-প্রাণীরা চিন্তা করে খুঁজে পায়নি। সব কিছু তাদের মস্তিষ্ক অন্ধ ভাবেই করাচ্ছে।

কগ্‌নিশন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারা ছাড়াও মানুষের ক্ষেত্রে যৌন নির্বাচন আরো দুটি দিক থেকে অন্য প্রাণীর থেকে পৃথক বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রী যেমন পুরুষকে নির্বাচিত করে তেমনি পুরুষও স্ত্রীকে নির্বাচিত

করে। প্রাণীর ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য (যেমন আকার, পরিবারে অবদান ইত্যাদির ক্ষেত্রে) যেমন কমে এসেছে এক্ষেত্রেও তারা সমান পর্যায়ে চলে এসেছে। আর সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার হলো মানুষের যৌন নির্বাচনে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সুকুমার কলার পারদর্শিতা ও এগুলোর উপভোগের ক্ষমতাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ফলে যারা চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য ইত্যাদিতে উৎসাহ দেখিয়েছে তারাই শুধু বিপরীত লিঙ্গ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে, তারাই বেশি বংশ বিস্তার করতে পেরেছে। ময়ূরের জন্য যা পেখম, কোকিলের জন্য যা গান, বাবুই পাখির জন্য যা বাসা তৈরি, মানুষের জন্য তা সুকুমার কলা– অবশ্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য।

সুকুমার কলা যে যৌন নির্বাচনের সৃষ্টি তার প্রমাণ এসেছে বিভিন্ন দিক থেকে। যেমন মানব বিবর্তনের অনেক পেছনের কালে চলে গেলে ওই যে অশ্রু-বিন্দুর আকৃতির পাথরের হাতিয়ার হাত-কুঠারে বহু লক্ষ বছর সময়েও যে কোন পরিবর্তন আসেনি, এর মধ্যে তার একটি কারণ আন্দাজ করা গেলো। এতে মনে করা হচ্ছে যে ওই হাত-কুঠার আসলে কোন হাতিয়ারই ছিলনা, ওটি ছিল সম্ভাব্য যৌনসঙ্গীকে উপহার দেবার জন্য পুরুষের তৈরি একটি অলঙ্কার। সঠিক মাপের, সঠিক গড়নের এবং সঠিক সৌন্দর্যের এই উপহার দিলে তবেই সঙ্গীনী মিলতো পুরুষের– যৌন নির্বাচনে। এটি যদি হাতিয়ার হতো তা হলে অবশ্যই একে ক্রমে আরো কার্যকর করে তোলার চেষ্টা হতো– হাতের কুশলতার বিকাশ ও সৃজনশীলতা একে সেরকমটিই করতো। কিন্তু যৌন নির্বাচনে বিশেষ আকার-আকৃতি ও সৌকর্যের হুবহু একই অলঙ্কারই সঙ্গীনীর প্রত্যাশিত– তাই ওটি লক্ষ বছরেও বদলায়নি।

নানা দেশে দেশে বিচিত্র সব কালচারের স্ত্রী-পুরুষ সব মানুষের মধ্যে জরীপ চালিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে নিজের পছন্দ মত সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারে তা হলে তাদের পছন্দ কী রকম হবে। পছন্দের নানা বৈচিত্রের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সর্বজনীন ভাবে যে পছন্দের কথা এসেছে তা হলো রসবোধ, সঙ্গীতপ্রীতি, সৃজনশীলতা, নম্রতা, সুকুমার বৃত্তি ইত্যাদিকে। আর এক গবেষণায় দেখা গেছে সব রকমের ভাষাতেই একটি জিনিস বোঝাতে বেশ কয়েকটি বিকল্প শব্দ ব্যবহার করা যায়। এগুলোর মধ্যে দৈনন্দিন

আটপৌরে কাজে মাত্র দু'একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাকিগুলো সাধারণত ব্যবহৃত হতে দেখা যায় প্রেমালাপে, যৌনসঙ্গীর সঙ্গে আলাপে রোমান্টিক আবহের মধ্যে। এগুলোই আবার এক রকম রোমান্টিক সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়। এর থেকে সাহিত্যের সঙ্গে যৌন নির্বাচনের সম্পর্কটি আন্দাজ করা যায়। যৌন নির্বাচনে সুকুমার কলা সৃষ্টির এই আধুনিক তত্ত্বটি এখন মানুষের অস্বাভাবিক বড় মস্তিষ্ক বিকাশের মধ্যেও যৌন নির্বাচনের হাত দেখতে পাচ্ছে।

যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যাচ্ছে যে মানব বিবর্তনের ইতিহাসে দুই পৃথক সময়ে দুবার মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক দ্রুততায় বৃদ্ধি ঘটেছে, যার আগে বা পরে এরকম কখনো ঘটেনি। প্রথমবার এটি ঘটেছে প্রায় পঁচিশ লক্ষ বছর আগে, আর দ্বিতীয়বার ঘটেছে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে। আগেরটির সময় মিলে যায় মানুষের প্রথম হাতিয়ার তৈরির সক্ষমতার সঙ্গে– যেটি ঘটেছিলো আমাদের প্রজাতি হোমো সেপিয়েন্সের বহু আগের হোমো হাবিলিসের সময়। হাতিয়ার তৈরির মত কুশলতা যে উন্নয়ন এনে দিয়েছিলো তা একটি চক্রবৃদ্ধি সৃষ্টি করে মস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধিকে উস্‌কে দিয়েছিলো, যা আবার আরো ভাল হাতিয়ার তৈরির সুযোগ করে দিয়ে চক্র-বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

অন্য দিকে দ্রুত মস্তিষ্ক বৃদ্ধির দ্বিতীয় ঘটনাটির কাল মিলে যায় মানুষের কালচার উড্ডয়নের প্রথম আভাসের সঙ্গে। এখানেও উন্নয়নের একই রকম চক্রবৃদ্ধি মস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধি সম্ভব করেছিলো। যৌন নির্বাচন যদি কালচারের সুকুমার কলা সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে তা মস্তিষ্কের ওই দ্রুত বৃদ্ধির কারণও ঘটিয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষের মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছে যৌন সঙ্গী বা সঙ্গিনীর এমনি ধারাকে পছন্দের কারণে।

সুকুমার কলার লোকজ রীতিই অনুভূতিতে জাজ্বল্যমান

যৌন নির্বাচনে সুকুমার কলাগুলোকে গুরুত্ব দেবার মধ্যে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে তা হলো এই সুকুমার কলা মানুষের মনে তীব্র আবেদন সৃষ্টি করেছে। এমনকি যৌন নির্বাচনের সঙ্গে এর সম্পর্ক যদি নাও থাকে তবুও সুকুমার

কলাগুলো যে মনে আবেদন সৃষ্টি করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্রশিল্পের কথাই ধরা যাক। যে সব চিত্রকে মানুষ যুগে যুগে মনোমুগ্ধকর মনে করেছে তার মধ্যে রয়েছে তার পরিচিত দৃশ্য– বড় শিকারের প্রাণী, সাধারণ ভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীসহ সুন্দর দৃশ্য, প্রশান্ত নিরাপদ পরিবেশের দৃশ্য, লোভনীয় খাদ্যের সমাহার, আকর্ষণীয় বিপরীত লিঙ্গের মানুষের ছবি, শিশুদের ছবি ইত্যাদি। এসবের সবগুলো কোন না কোন ভাবে টিকে থাকা ও বংশ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশের স্মৃতি মস্তিষ্কের মধ্যে জাগায়। এজন্যই এগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে থাকা 'পুরস্কারের' বা আনন্দের 'বোতামটিকে' উদ্দীপ্ত করে। এ কারণেই চিত্রকলা উপভোগের জিনিস– এর সৃষ্টি করা যেমন আনন্দের, এর দর্শনও তেমনি আনন্দের।

যেটি এত সহজে স্পষ্ট হয়না তা হলো সরাসরি বাস্তবানুগ না হয়েও জ্যামিতিক নানা আকৃতিতে আঁকা বিমূর্ত চিত্রও কেন মস্তিষ্কে একই ধরনের আনন্দের সাড়া দিয়ে থাকে। দুটি সমান্তরাল সরল রেখা, প্রতিসম জিগ্‌জাগ রেখা, বিনুনির মত প্যাটার্ন, বৃত্ত, বর্গক্ষেত্র, উপবৃত্ত, বিভিন্ন প্রতিসাম্যে ছোট ছোট ফোটার বিন্যাস, পাশাপাশি বিপরীতধর্মী রঙের বলিষ্ঠ টান ইত্যাদি; এদের প্রত্যেকটি মস্তিষ্কে নানা আলাদা আলাদা আনন্দের সাড়া দিয়ে থাকে। আসলে এখানেও নানা সুখ- স্মৃতির ইশারা আছে– সরাসরি বাস্তবের মত না হলেও এতও ওই স্মৃতির এমন একটি অনুসঙ্গ আছে যা মস্তিষ্কে তারই সাড়া জাগায়। লম্বা আয়ত ক্ষেত্রে ইশারা মেলে গাছের, উপবৃত্তে গুহা-মুখের, বৃত্তাকার বা বর্গাকার ক্ষেত্রে জলাশয়ের। ডান-বাম প্রতিসাম্য সাধারণ যে কোন প্রাণীর কথা মনে করায় যাদেরও ডান-বাম প্রতিসাম্য আছে। সরল রেখা, বিশেষ করে তীর চিহ্ন সহ সরল রেখা গতির সাড়া জাগায়, দুটি সমান্তরাল রেখা সহযোগিতার। অন্যদিকে জিগজাগ রেখায় মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয় টানা-পোড়েনের ভাব, হয়তো কাছেই অন্য কোন সরল প্রতিসাম্যে যার নিরসন ঘটে। যে কোন সুন্দর প্রতিসাম্যের ক্ষেত্রের মধ্যে– যেমন বৃত্তে বা বর্গক্ষেত্রে– নিরাপত্তার ভাব জাগে, আবার একই রকম ত্রিমাত্রিক চিত্রে– যেমন গোলকে বা পিরামিডে– একটি বলিষ্ঠ সুসংহত বস্তুর অনুভূতি জাগে। এগুলোর সমন্বয়ে, বা বাস্তবানুগ কিছু কিছু উপাদানের সঙ্গে এগুলোর মিশ্রণে,

বহুতরো শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়; যা যুগে যুগে চিত্রকলার নানা ধারার বিকাশে দেখা গেছে। দর্শক মানুষও এর মধ্য থেকে আনন্দের হিল্লোল আহরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেছে।

সঙ্গীতের কথায় এলে দেখি যে কোন সুরেলা সঙ্গীত কালচার নির্বিশেষে সবার প্রিয়, যদিও আপন কালচারের সঙ্গীতের উপভোগটি আরো বেশি হয়। মৌলিক সুর (নোট) হিসেবে সঙ্গীতের যে উপাদান এগুলো সব সঙ্গীতেই আছে, এগুলো সবার কাছে শ্রুতিমধুর। এগুলোকে গ্রথিত করে তাকে একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত সত্ত্বায় রূপ দেয়ার কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম (রুল) আছে। এই সুর আর এই সুর বাঁধার নিয়মের বাইরে গেলে শ্রুতি মাধুর্যের হানি ঘটে। এরকম একটি সঙ্গীত সত্ত্বার একটি উপযুক্ত শুরু আছে, আবার উপযুক্ত শেষও আছে। ওই সঙ্গীত সত্ত্বার ভেতর তার নিজস্ব ঢঙে খাদের (পিচ) ওঠানামা আছে, যা আরো কিছু সূক্ষ্ম গুণে ভূষিত হয়ে নিজের সত্যিকার অনন্যতা লাভ করে। সাধারণত যে সব শব্দ আমরা শুনি তার সঙ্গে সঙ্গীতের পার্থক্য এই অনন্যতাগুলো থাকা বা না থাকার মধ্যে। এদের জন্যই সঙ্গীত আমাদের মস্তিষ্কে আনন্দের হিল্লোল তুলতে পারে, যে কারণে আমাদের দেহমন যেন নেচে ওঠে। কখনো অবশ্য সুরের মূর্ছনার মধ্যেই একটি টানা-পোড়েনের (টেনশন) ভাবও সৃষ্টি হয়, কারণ তখন সঙ্গীত একটি অস্থিতিশীল ভাব জাগাবার মত অবস্থায় থাকে। কিন্তু এরপর যখন সেটি স্থিতি ফিরে পায় তখন একটি প্রশান্তির ভাব এনে টানা-পোড়েনের অবসান ঘটে। সাধারণত একটি সঙ্গীত সত্ত্বার সমাপ্তি টানতে একে একটি চূড়ান্ত স্থিতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েক মিনিট স্থায়ী একটি গান যেমন একটি সঙ্গীত সত্ত্বা হতে পারে, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ সেতার বাদন বা একটি ঠুমরিও তা হতে পারে। অপেরার গায়িকা সোপ্রানোর একটি দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ 'আরিয়া' যেমন কন্ঠের উত্থান পতনে গান গেয়ে নিবেদন করে তাতেও থাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত সত্ত্বা। তেমনি আর্কেষ্ট্রার এক একটি সিম্ফোনিও ওরকম একটি একক সত্ত্বা।

চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা তবুও বাস্তব জীবনের সুখ-স্মৃতির একটি প্রকৃত ছবি পাই, অথবা অন্তত বিমূর্ত সৃষ্টিতে তার ইশারা দেখতে পাই যা হয়তো একদিন বিবর্তনে কোন ভাবে কাজে লেগেছিলো। কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে

সরাসরি তো বাস্তবের কোন রকম সম্পর্ক খোঁজা কঠিন, যদিও মনের আবেগের সম্পর্ক আছে পুরাপুরিই। বিবর্তনের কালে মানুষ যে সব ধ্বনিতে পরিবেষ্টিত ছিল তার সঙ্গে সঙ্গীতের ওপরে বর্ণিত বৈশিষ্টগুলোর মিল নেই। বাতাসের শব্দ, নদী-স্রোতের শব্দ, পাথরের হাতিয়ার তৈরির খট্ খট্ শব্দ, মানুষের আড্ডার শব্দ, জন্তু জানোয়ারের ডাক– এ সবতো প্রায় সবই একটানা একঘেঁয়ে ধ্বনি, সেখানে নেই সুর আর সুর বাঁধার নিয়ম, নেই খাদের ওঠানামা, নেই টানা-পোড়েনের পর স্থিতি ফিরে আসার প্রশান্তি। নিজ-পরিবেশের সঙ্গে এত অমিল সত্ত্বেও মানুষ সঙ্গীত পছন্দ করেছিলো কেন? এ সম্পর্কে একটি উত্তর হলো সঙ্গীতের স্থান মানুষের জীবনযাত্রায় 'পুরস্কার' লাভের 'মূল খাবার' হিসেবে নয়, এ হচ্ছে খাওয়ার পরের মিষ্টিমুখ করার মত। এর কাজ খাবারের মাধ্যমে পেট ভরানো নয় বরং সূক্ষ্ম স্বাদের মিষ্টির মত এটি মস্তিষ্কের অতি সংবেদনশীল জায়গায় সুখের বোতামটিকে উদ্দীপ্ত করে এনে দেয় এক অদ্ভুত ভাল লাগার অনুভূতি, যা একমাত্র সুরই আনতে পারে। বিবর্তনে টিকে থাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই বটে কিন্তু মস্তিষ্কের এই বাড়তি ভাল লাগার সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক।

সঙ্গীতে আনন্দের হিল্লোল ওঠা মস্তিষ্কের ওই পুরস্কার-কেন্দ্রগুলো যেন এক একটি মিষ্টির মত করে তৈরি– এক একটির এক এক 'মজা'। ওই সঙ্গীত-মজাগুলো কী ধরনের হতে পারে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কিছু আন্দাজ আছে। ভাষার মধ্যে বসিয়ে তার এক রকম মজা সৃষ্টি হয়– যেমন গানে। কিন্তু শুধু গানে কেন, ভাষার বক্তব্যকে সুরে প্রকাশ করার আরো কত রকম বিচিত্র উপায় রয়েছে– কবিতার ছন্দে, পুঁথি পাঠে, র‍্যাপ মিউজিকে, এমনকি প্রচারকের সুরেলা বয়ানে। সঙ্গীত আর এক ধরনের হিল্লোল সৃষ্টি করে যখন তা আমাদের এক একটি আবেগকে ছুঁয়ে যায়। কোন কোন সঙ্গীত তাই বুকফাটা কান্নার মত (যেমন পাশ্চাত্য অপেরার গানে অথবা আমাদের কোন কোন পল্লী-গীতিতে), কোন কোনটিতে ফাটা গলায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় (ভাওয়াইয়ায় অথবা জাজ গানে), আবার কোন কোনটিতে গজরানির মত বা গোঙানির মত, উচ্চস্বর অথবা চাপা কান্নার মত (জাজ বা সোল মিউজিকে) নানা ভাবে ওই একই ধরনের আবেগ প্রকাশ পায়। আমাদের পরিবেশের

কিছু ধ্বনির মত সুরও আবেগের ওপর কাজ করে থাকে যেমন বজ্রের, ঝড়ের, হার্টের স্পন্দনের, পাখির গানের, বা নদী-স্রোতের শব্দের অনুকরণে। সিনেমার আবহ সঙ্গীত তো সারাক্ষণই দৃশ্যের উপযোগী আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকে। কখনো কখনো তা এত সফল হয় যে বহু বছর পরও ওই সিনেমার অন্য কিছুর থেকে বেশি সেই আবহ সঙ্গীতই মস্তিষ্কে টিকে থাকে; শুনলেই সেই দৃশ্যে, সেই আবেগে ফিরে যেতে বাধ্য করে। সুরের তালে তালে দুলতে, তালি দিতে, এবং নাচতে ভাল লাগাটিও সঙ্গীতেরই আর একটি মজা যেটি মস্তিষ্কের অঙ্গ সঞ্চালন অংশের সঙ্গেই জড়িত। তবে এই সব মজাকে আলাদা আলাদা করে দেখে সঙ্গীতের পুরো দ্যোতনাটি বোঝা যাবেনা। তাই ভাষার, আবেগের, নাচার ইত্যাদি নানা অনুসঙ্গের সব মজাকে যোগ করার পরও সঙ্গীতের সামগ্রিক দ্যোতনাটি বাড়তি কিছু দেয়– যাকে হয়তো বলতে পারি সঙ্গীতের আসল মিষ্টি মুখ– আসল মজা।

জীবনের সঙ্গে, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার যে বিবর্তন-লক্ষ্য তার সঙ্গে, সাহিত্যের সম্পর্কটি অনেক বেশি সরাসরি। যদি প্রশ্ন করা হয় মানুষ সাহিত্য কেন ভালবাসে, সোজা উত্তর হবে যে কারণে মানুষ জীবনকে ভালবাসে। বিশেষ করে গল্প-উপন্যাসের কথা যদি বলি সেগুলো আমাদেরকে আনন্দ দেয় সেখানে আমরা জীবনকে দেখতে পাই বলে। একটি উপন্যাসের প্লট যতই জটিল হোক না কেন, চরিত্রগুলো যতই অদ্ভুত হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ঔপন্যাসিককে জীবনের কাছাকাছি থাকতেই হয়। এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ডের মত ব্যতিক্রমী দু'একটি ক্ষেত্রে যেখানে ইচ্ছে করেই ভিন্ন জগতের ভিন্ন যুক্তি মেনে নেয়া হয়, তা বাদ দিলে সব গল্পই বা সব উপন্যাসই যৌক্তিক জীবনকে নিয়ে। দাবা খেলার মত হাজারো চালের মত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়েও, হাজারো বাধার সম্মূখীন হয়েও, উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকাকে কোন একটি লক্ষ্যের দিকে এগুতেই হয়। বিবর্তন-বিজ্ঞানীর চাঁছা-ছোলা ভাষায় বলতে গেলে শেষ বিচারে সেই লক্ষ্য হয় 'টিকে থাকার ও অধিক সন্তান দিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য'। আমরা পাঠকের কাছে তা ভাল লাগে আমরাও বিবর্তন-জাত বলে। শেষ পর্যন্ত সনাতন বিবর্তন-জাত জীবনের গল্পটিই সাহিত্যের উপজীব্য।

হাস্যরস সব সময় মানুষের উপভোগ্য ছিল। যৌন নির্বাচনে মানুষের ক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের কাছে যে সব জিনিস আকর্ষণীয় ছিল এবং আছে বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রসবোধ। ভারী কথা, অথবা সাধারণ কথাকেও হাসি পাওয়ার মত হালকা করে বলতে পারার মধ্যে একটি সহজ আনন্দবোধ রয়েছে বৈ কি– যাকে সাধারণত 'নির্দোষ বা 'নির্মল' আনন্দ বলা হয়। ওটি অনেক সময় আলাপচারিতাকে সরস করার কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কার্যকর হাস্যরস কিন্তু সব সময় এরকম 'নির্মল' হয়না। হাস্যরসের প্রকৃতি এবং এর উৎসটি খুব সম্ভব আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটি আমরা বুঝি যখন লক্ষ্য করি যে এটি চিরকাল সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রায় একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সবলের অন্যায় শক্তি প্রদর্শন, শক্তি প্রয়োগ, মেকি বাগাড়ম্বরকে হাসির কথায় পরিণত করে দুর্বল একরকম প্রতিশোধ নেয়। এখানটিতেই জীবনের সঙ্গে, জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে, বিবর্তনের সঙ্গে হাস্যরসের একটি গূঢ় সম্পর্ক দেখা যায়। যার যার ক্ষেত্রে হাস্যরসের জনপ্রিয় লক্ষ্যবস্তু কারা তা খেয়াল করলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে। আদিতে এই লক্ষ্যবস্তু হয়তো ছিল দলপতি, গোত্রপতি; তারপর জমিদার, রাজা-রাজড়া, কিংবা এক-নায়ক; এখন রাজনীতির শক্তিশালী নেতা, আমলা; অফিসে বড় কর্তা, স্কুলে-কলেজে শিক্ষক, বাহিনীতে হুকুম দেয়ার অফিসার যেখানে যারা সবলের ভূমিকা নিয়েছে। যাদেরকে এমনিতে আঘাত করা যায়না, ওই হাস্যরসেই তা করা হয়। তাই হাস্যরসে সব সময় এমন একটি আঘাত থাকে যাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে মর্যাদাবানদের মর্যাদাকে এক ভাবে ফুটো করার চেষ্টা থাকে। হাসির উৎসটি ওখানেই, এর কার্যকারিতাটিও ওখানেই।

ওই কাজটি করার ক্ষেত্রে সব হাস্যরসে এক ধরনের সাধারণ সুত্র প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে একে উদ্ভট কিছু বলে মনে হবে, পর মুহূর্তে এর প্রেক্ষিত কাঠামোটিকে একটু ঘুরিয়ে নিলে ওই উদ্ভটতার নিরসণ হয়ে হাসি পাবে। আর এর ফলেই ঘটবে ওই 'মর্যাদাবানের' মর্যাদাহানি। একটি উদাহরণ নেয়া যাক। মার্কিন কমেডিয়ান ডব্ল্যু সি ফিল্ডস তরুণদের বাড়াবাড়ি ও উশৃঙ্খলতাকে পছন্দ করছিলেননা। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো তরুণদের ক্লাব করা তিনি সমর্থন করেন কিনা। তাঁর উত্তর ছিল 'হ্যাঁ প্রথমে

আমি তাদেরকে নম্রভাবে বোঝাব, তাতে কাজ না হলে অবশ্যই ক্লাব সমর্থন করবো'। প্রথমে উত্তরটি বেশ উদ্ভট মনে হয়। কিন্তু পরক্ষণই বোঝা যায় যে তিনি 'ক্লাব' কথাটিকে বিনোদনের জায়গা হিসেবে নেননি, বরং নিয়েছেন ইংরেজীতে ক্লাবের আরেকটি অর্থ বাড়ি মারার মুগুর হিসেবে। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে প্রয়োজনে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার পক্ষপাতী। কথার প্রেক্ষিতটি বদলে নিয়ে উশৃঙ্খল মস্তান তরুণদের শায়েস্তা করার ইঙ্গিতটি হাসির খোরাক হয়েছে। প্রায় সব রকম কার্যকর হাস্যরসের মধ্যে ওই উদ্ভটতা আর প্রেক্ষিত পরিবর্তন করে দেখার মাধ্যমে উদ্ভটতার নিরক্ষণের বিষয়টি থাকে, এবং সেই সঙ্গে একটি আঘাত, একটি মর্যাদা ফুটো করার ব্যাপার। এটিই খুব সম্ভব অতীতে একদিন জীবন সংগ্রামে হাস্যরসের ভূমিকার কথা মনে করিয়ে দেয়।

সুকুমার কলার দুর্গমতা মানে জীবনের থেকে বিচ্ছিন্নতা

আদিতে সুকুমার কলা ছিল একেবারেই নিখাদ নান্দনিকতা– যা মস্তিষ্কে হিল্লোল জাগায়। পরে তার মধ্যে এসে পড়েছে অভিজাত্যের অভিমান। যা সর্বত্র ছিল সহজাত, সহজিয়া এবং সর্বজনীন কোন কোন কালচারে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এক সময় অভিজাতদের প্রভাবে চলে গিয়েছে– যেখানে সুকুমার কলার পৃষ্ঠপোষক, এর উচ্চমান রক্ষক ইত্যাদির অবয়বে বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালীরা একে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে। আভিজাত্যের এই প্রভাব কিন্তু সব সময় এর নান্দনিকতা ও জীবন-ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে সুখকর হয়নি। এতে যেন আভিজাত্যকে সামনের সারি ছেড়ে দিয়ে মস্তিষ্কের সেই অনবদ্য হিল্লোল তোলার নান্দনিকতাকে পেছনের সারিতে চলে যেতে হয়েছে। সেই আভিজাত্য একসময় শুধু পৃষ্ঠপোষককে নয়, স্বয়ং কলাবিদ, সমঝদার তাদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে।

ধরা যাক খুব বড় কোন চিত্র শিল্পীর আঁকা কোন একটি 'অরিজিন্যাল' চিত্রের মূল্য লক্ষ ডলারে গিয়ে পৌঁছেছে। সব সমজদাররা এর শিল্প সৌকর্য নিয়ে ধন্য ধন্য করছে। শিল্পপ্রেমিক সকল মানুষও এ চিত্রের সাড়া জাগানো সৌন্দর্যে হিল্লোলিত হচ্ছে। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে এটি

অরিজিন্যাল নয়, বরং অত্যন্ত গুণী অন্য চিত্রশিল্পীর আঁকা ‘নকল’ মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এর লক্ষ ডলার দাম পড়ে গিয়ে তুচ্ছ পরিমাণ ডলারে নেমে গেল। আনন্দ দেবার ও নান্দনিকতার সকল উপাদান প্রায় অরিজিন্যালের মত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর অভিজাত্যের ছোঁয়ার অভাবেই এর প্রতি এই তাচ্ছিল্য। অন্য দিকে সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে ওই যে অতি উচ্চ মূল্য শুরুতে নির্ধারণ করা হয়েছিলো সেখানেও আমরা দেখি সুকমার কলাকে এক ধরনের অর্থনৈতিক অভিজাত্যে আচ্ছন্ন হতে। এভাবে আকাশচুম্বি দাম সৃষ্টি ও নিমিষের মধ্যে তার পতন সবই নির্ভর করেছে যতটা না এর নান্দনিকতা গুণের ওপর তার চেয়ে অনেক বেশি আভিজাত্যের অভিমানের ওপর।

সুকুমার কলার আধুনিকতর ইতিহাসে দেখা যায় যখনই অভিজাত স্থান পাওয়া কোন আর্ট ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের কাছেও জনপ্রিয়তা পেয়ে বারোয়ারি রূপে লাভ করেছে তখনই এই বারোয়ারি হওয়াটি রোধ করার জন্য আর্টটিতে নতুন দুর্জ্ঞেয়তা, নতুন দুর্গমতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ততই আর্ট ‘উপভোগ’ করার চেয়ে তা ‘বোঝার’ চ্যালেঞ্জটাই বড় করে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝিনা একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠা না থাকলেও আর্ট বুঝিনা তা স্বীকার করতে অনেকেরই অনীহা থাকে, কারণ ওই আভিজাত্যের বৃত্তের একেবারে বাইরে থাকতে তাঁরা চান্‌না।

এটি অবশ্য ঠিক যে বিভিন্ন সুকুমার কলার নতুন নতুন সৃষ্টিগুলোকে পুরোদমে উপভোগ করতে হলে তাতে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন, চর্চার প্রয়োজন, কিছুটা হয়তো প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন। এ হলো রস আস্বাদনের চর্চা ও প্রশিক্ষণ। এভাবে চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য সবকিছুতে সৃজনশীলতার সঙ্গে সঙ্গে রস আস্বাদনের রুচিও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আস্বাদনের ব্যাপারটি তাই বলে বাধাগ্রস্ত হয়নি, সেটিই বরাবরই মুখ্য থেকে গেছে। কিন্তু আভিজাত্যের ব্যাপারটি অন্য রকম, তাতে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি হতে পারে। আর্টকে অভিজাত-বৃত্তের মধ্যে রেখে দিতে, বারোয়ারি আস্বাদনের বিষয় না হতে দিতেই এই বাধা।

আধুনিকতার কালে প্রযুক্তি কিন্তু বরাবর এই বৃত্ত ভাঙ্গতে, সুকুমার কলাকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য করতে সহায়তা দিয়েছে। জাপান যখন মেইজি পুনর্জাগরণের মাধ্যমে আধুনিক হয়নি তখনই সেখানে কাঠ খোদাই করা ব্লক দিয়ে নামীদামী চিত্রশিল্পের চমৎকার প্রিন্ট সহজলভ্য ও জনপ্রিয় হয়েছিলো। এই জাপানী চিত্র-প্রিন্ট পরে ইউরোপের মানুষদের মধ্যেও সাড়া ফেলেছিলো। এর পর উন্নত রঙীন মুদ্রণ শিল্প বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক সব চিত্রকর্মের নিখুঁত প্রিন্ট সবার কাছে অত্যন্ত সহজলভ্য করেছে সবাই তা নিজের বাড়িতে বসেই উপভোগ করতে পেরেছে। তেমনি গ্রামোফোন রেকর্ড, টেইপ রেকর্ডার ও সিডি সঙ্গীত শিল্পে এই একই ভূমিকা পালন করেছে আর রেডিয়ো আর টেলিভিশন তার প্রচারে দারুণ ভূমিকা রেখেছে; পেপার ব্যাক ও আধুনিক মুদ্রণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই করেছে। যদিও আর্ট-অভিজাতরা বলার চেষ্টা করেছে যে প্রযুক্তির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া এসব আর্ট তার আসল মান ও গুরুত্বের দাবীদার নয়, বড় জোর তার 'সস্তা' সংস্করণ মাত্র। তাই যতবার প্রযুক্তি একে সাধারণ মানুষের কাছে নিতে সক্ষম হয়েছে ততবারই অভিজাত মহল একে আরো দুর্গম ও খানদানি করে তোলার চেষ্টা করেছে। একাজে কলাবিদদের চেয়েও তাদেরকে বেশি সহায়তা করেছে সুকুমার কলার অভিভাবকরা যারা এর গুণ-মানের রক্ষক হবার দাবীদার হয়েছেন এবং প্রয়োজনে নতুন 'থিওরি' দিয়ে দেখিয়েছেন ওই আর্টের আরো দুর্বোধ্য সংস্করণটিই কেন এর একমাত্র বিশুদ্ধ রূপ।

আর্ট যেন সাধারণ মানুষের মধ্যে বারোয়ারি না হয়ে গড়তে পারে সে চেষ্টায় অভিজাত মহল শুধু আর্টকে নয় তার আনুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিসকেও ব্যবহার করেছে। উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্য অপেরা সঙ্গীতের কথা ধরা যাক। শুধু এর প্রেক্ষাগৃহের শব্দগুণের বিবেচনায় নয়, বরং রাজকীয় ভাবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল বর্ণাঢ্য স্থাপত্যের অপেরা হাউস এর জন্য প্রত্যেকটি শহরে গড়ে তোলা হয়েছে– যেখানে টিকেটের অতি উঁচু মূল্য। তাছাড়া রেওয়াজ গড়ে তোলা হয়েছে অপেরা উপভোগ করতে যেতে কী রকম কেতাদুরস্ত পোষাক পরে যেতে হবে। বলা বাহল্য এসবের সঙ্গে মূল অপেরার এবং দর্শকের অনুভূতিতে তার অনুরণন জাগাবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে

প্রযুক্তির সহায়তায় সাধারণ মানুষ অপেরা উপভোগ থেকে বিরত থাকেনি– ভিডিয়োতে বাড়িতে বসেই তারা তা করেছে।

এই সব সত্ত্বেও ওই আভিজাত্য কিন্তু সুকুমার কলার মৌলিক স্বাদের আস্বাদনে বড় ধরনের কোন বিঘ্ন ঘটায়নি। আর্টের নতুন নতুন ধারা এসেছে, এক সময় সাধারণ ভোক্তারাও এতে অভ্যস্ত হতে পেরেছে– কারণ এতে নতুন ভাবে হলেও আনন্দের সেই উপাদানগুলোকে কখনো অগ্রাহ্য করা হয়নি– তা চিত্রকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য যাই হোক না কেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে সেই ধারাটি বড় ধাক্কা খেয়েছে। এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের থেকে সুকুমার কলার ক্ষেত্রে এমন একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে যাতে মনে হতে পারে যে আনন্দের ওই উপাদানগুলো আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। 'মডারনিজম' নামের এই আন্দোলনকারীরা এ পর্যন্ত চলে আসা সুকুমার কলার মধ্যে একরকমের 'অবক্ষয় ও অধঃপতনের' চিহ্ন দেখতে পেয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে আরো কড়া আন্দোলন শুরু করলেন– পোস্টমডারনিজম। মডারনিজম এবং পোস্টমডারনিজম যদি বিভিন্ন সুকুমার কলাকে শুধু নতুন রূপ দেবার চেষ্টা করতো তা হলে অসুবিধা কিছু ছিলনা। তাতো যুগে যুগে হয়েই এসেছে। কিন্তু এটি যে বিদ্রোহ ঘোষণা– এই মতাদর্শ এমন একটি ভাব করলো যেন হঠাৎ মানুষের প্রকৃতি বদলে গেছে; যাকে সে সুন্দর মনে করতো সেটি আর সুন্দর নয়, যাকে সে আনন্দ বলে জানতো সেটি আর আনন্দ নয়। চিত্রকলার পরিবর্তনটি এখন শুধু তাকে বিমূর্ত করা নয়– সেটি তো অতীতেই হয়েছে, তা মানুষের মস্তিষ্কে সাড়াও জাগিয়েছে। কিন্তু এখন রঙ ছিটিয়ে গেলেও, এমন কি খালি ক্যানভাস রেখে গেলেও তার মধ্যে অনবদ্য আর্ট দেখতে হবে যদিও তা মস্তিষ্কে কোন হিল্লোল না জাগায়; কবিতা থেকে সব রকমের ছন্দ ও বোধগম্যতা প্রত্যাহার করে তাকে বুঝতে বলা হলো, স্থাপত্য থেকে সব অলঙ্কার তুলে তাকে বাক্স-সদৃশ করে তোলা হলো। উপন্যাসে জীবনের গল্প খোঁজার কোন ব্যবস্থা রইলোনা– তাতে রইলো শুধু দুর্বোধ্য কথকতা, নানা চরিত্রের সহজ-সঙ্গতিহীন আনাগোণা, এবং হঠাৎ হঠাৎ ঝলকে ঝলকে অস্বাভাবিক কিছু চেতনার প্রকাশ। সঙ্গীত থেকে মেলোডি তুলে ফেলে

বেসুরের মধ্যে 'বিকল্প' সুর খুঁজতে বলা হলো। এই বিদ্রোহের কারণ হিসেবে বলা হলো এতদিনকার ওই ফুলেল ইন্দ্রিয়-অনুভূতি উদ্রেককারী আর্টগুলো বুর্জোয়া অবক্ষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে– মডারনিজমে তার অবসান হবে। এই প্রক্রিয়ায় আর্টের জনবিচ্ছিন্নতা যদি ষোল কলায় পরিণত হয়ও তাতে তাঁদের আপত্তি ছিলনা।

মডারনিজমে দীক্ষিত একজন বাঙালী কবির কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন– 'এ বুঝিয়ে দিতে পারলে শিরোপা দেবো'। তবে বুঝিয়ে দেবার ভাষ্যকারের অভাব মডারনিষ্ট সুকুমার কলার হয়নি। ভাষ্যকাররা থিওরির পর থিওরি দিয়ে একেই আজকের সুকুমার কলা বলে তুলে ধরেছেন। পোস্ট-মডারনিস্টরা চিরদিনের সৌন্দর্য-পিয়াসী মনকে আরো তীব্রভাবে আঘাত করে বিদ্রোহকে আরো যে তীব্রতায় নিয়ে গেছেন, তারো থিওরির অভাব হয়নি। এমনকি সমসাময়িক পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিক তত্ত্ব, অনিশ্চয়তার নীতি ইত্যাদিকেও টেনে এনেছেন তাঁরা আমাদের জগতটি যে যৌক্তিক বা সৌন্দর্যমন্ডিত নয় তা প্রমাণ করতে– যদিও তাঁরা সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো না বুঝেই, এগুলোর সত্যিকার তাৎপর্যের তোয়াক্কা না করেই ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাপারটি হাস্যকর ভাবে দেখা গেছে যখন একজন প্রথিতযশা পদার্থবিদ ইচ্ছে করে তাঁর বিষয়গুলোকে উল্‌টা-পাল্‌টা ভুল-ভাল করে একটি 'পেপার' রচনা করে তা সে সময়ের একটি সেরা মডারনিস্ট জার্নালে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয় পোস্ট-মডারনিস্টদের কেউ কেউ আবার এও বল্‌লেন যে সত্যটাই আপেক্ষিক, নানা রাজনৈতিক কারণে জগতকে এক এক জন এক এক ভাবে দেখতে পায়। এমনকি বিজ্ঞানই সত্য উদ্ঘাটনের একমাত্র পথ নয়, জগতকে দেখার আরো নানা পথ আছে। তাঁদের কারো কারো মতে যাকে এত দিন আমরা সুন্দর ও নান্দনিক বলতাম তা এক রকম ইন্দ্রিয়জাত সুড়সুড়ি বৈ কিছু নয়– সৎ আর্টের মধ্যে এসবের কোন স্থান নেই; পাভলভের কুকুরের মত আমরা কন্ডিশন্ড হয়ে ছিলাম বলে এতদিন একে আর্ট বলেছি। পোস্টমডারনিস্ট আর্টের চেষ্টা এই কন্ডিশনিং থেকে বের হয়ে আসা। এমনকি সাহিত্যের ভাষার মধ্যে স্বচ্ছতার ও বোধগম্যতার প্রয়োজনীয়তা অনুভবকেও তাঁরা সেই কন্ডিশনিঙের অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

যাঁরা মডারনিস্ট ও পোস্টমডারনিস্ট সুকুমার কলার মধ্যে তাঁদের আধুনিকতা খুঁজে পান, তাঁরা তা পেতেই পারেন। কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট– এর সঙ্গে মানুষের জৈবসত্ত্বার কোন সম্পর্ক নেই, এবং সেই বিবেচনাতে বৈজ্ঞানিক সত্যেরও কোন সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান বিবর্তন-সৃষ্ট যে জীবনকে জানে সে জীবনে সুকুমার কলার একটি নির্দিষ্ট অর্থ আছে যা নান্দনিকতার সঙ্গে, মস্তিষ্কে আনন্দ হিল্লোলের সঙ্গে সম্পর্কিত। আভিজাত্যের অভিমানেই হোক অথবা বিজ্ঞান-বহির্ভূত পান্ডিত্যের অভিমানই হোক, কোন কিছুই মানুষের অনন্য কালচারের সুপ্রাচীন ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটাতে পারার কথা নয়। কারণ তার ভিত্তি মানব বিবর্তনে প্রোথিত। যে কারণে ছয় মাস বয়সের শিশুও উজ্জ্বল রঙে উদ্দীপ্ত হয়, গানের সুরে সুরে বা ছড়ার ছন্দে ছন্দে দোলা খায়, সে কারণেই এই ছেদ ঘটানো অসম্ভব।

আমার ডিএনএ এখন খোলা বই

ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার

ডিএনএতে এক একটি জিনের মধ্যে কোন্ বেইসের পর কোন্ বেইস আছে সেটিই বলে দেয় জিনটি জীবকে কোন্ বৈশিষ্ট দেয়। অর্থাৎ ডিএনএ'র বেইস-ক্রমের মধ্যেই রয়েছে জীবনরহস্যের লিপি– সেই ক্রমটি উদ্ঘাটন করাটাই তার পাঠোদ্ধার। এ লিপির অর্থ বুঝতে পারার এবং তা বৈজ্ঞানিক কৌশলে পড়তে পারার কাজটি শুরু থেকেই ডিএনএ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ছিল। ধীরে ধীরে কাজটি নিখুঁত হয়েছে, সহজ ও দ্রুততর হয়েছে। ডিএনএ'র মধ্যে থাকা জীবনের নীল-নক্শাকে বুঝতে হলে পর পর কয়েকটি কাজ করতে হয়। এর বেইস-ক্রমটি নির্ণয় করতে হয়। একটানা সেই বেইস সারির মধ্যে কোথায় কোথায় অর্থবহ জিনগুলো রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। তারপর এর প্রত্যেকটি জিনের কাজকে উদ্ঘাটন করতে হয়। এখন আমরা এই সবগুলো কাজ কিছু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে করতে পারছি। কিন্তু এর পেছনে বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলো খুবই চমকপ্রদ এবং বিজ্ঞানীদের অভাবনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর ।

প্রথমেই ডিএনএ'র বেইস-ক্রম নির্ণয়ের কথায় আসা যাক– যাকে বলা হয় সিকোয়েন্সিং। ক্ষুদ্র অণু এই ডিএনএর লম্বা সূত্রের মধ্যে কোন্ বেইসের পর কোন্ বেইস আছে তা শুধু জটিল জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতিতেই জানা যেতে পারে। এর একটি মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানী স্যাঙ্গার ও কুলসন– তাই একে স্যাঙ্গার-কুলসন পদ্ধতি বলা হয়। এতে ডিএনএ'র দুটি সূত্রকে আলাদা করে একই সূত্রের নানা অংশের অনেক প্রতিলিপি তৈরির ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিলিপিটি তৈরি হয় এর সঙ্গে একই দ্রবণে থাকা A,T,C,G নানা বেইসযুক্ত নানা নিউক্লিয়েটিড (ডিএনএ'র একক) সংযোজন করে করে। মূল ডিএনএর A'র বিপরীতে তার সম্পূরক T, C এর বিপরীতে তার সম্পূরক G –এভাবে বসে গিয়ে এই সংযোজনটি সম্পন্ন হয়। কিন্তু এটি

নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হতে দেয়া হয়না। একই এই কাজটি চারটি টেষ্ট টিউবে চারটি আলাদা দ্রবণে ঘটানো হয় যার একটিতে সাধারণ A বেইসের সঙ্গে অল্প কিছু ‘বিকৃত’ A বেইস মিশিয়ে দেয়া হয়। এইটিতে সংযোজনের সময় যেই একটি বিকৃত A এসে পড়লো তক্ষুণি সংযোজন প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে ওই বিকৃত A বেইসে শেষ হয়ে যাওয়া একটি অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি টুকরা আমরা পেলাম। এতে বিকৃত A বেইসটি কয়টি বেইসের পর এসেছে সেই অনুযায়ী এই টুকরাটি খুব বেঁটে হতে পারে– মাত্র দু’এক বেইস লম্বা, আবার খুব লম্বাও হতে পারে– অনেক বেইস লম্বা। এভাবে বিকৃত A বেইসে শেষ হওয়া নানা দৈর্ঘের টুকরা আমরা পাব। এই দ্রবণে যেহেতু অনেক সংখ্যায় বিকৃত A বেইস রয়েছে– তাই এই ডিএনএ’র যেখানে সম্পূরক হিসেবে A বেইস আসার কথা সেখানেই (বিকৃত) A বেইসে শেষ হওয়া টুকরা পাওয়া যাবে অনেক নানা বিচিত্র রকম দৈর্ঘের। একই ভাবে অন্য তিনটি টেষ্ট টিউবের একটিতে বিকৃত T, একটিতে বিকৃত C এবং আর একটি বিকৃত G বেইস মেশানো আছে। কাজেই সেগুলোর একটিতে T তে শেষ হওয়া নানা দৈর্ঘের অসংখ্য টুকরা, আরেকটিতে C তে শেষ হওয়া নানা দৈর্ঘের অসংখ্য টুকরা এবং অন্যটিতে G’তে শেষ হওয়া এরকম টুকরা পাওয়া যাবে।

এখন প্রত্যেক টেষ্ট টিউবের টুকরাগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে রাখলে টুকরাগুলোর নেগেটিভ চার্জের কারণে তা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পজিটিভের দিকে অগ্রসর হবে। সব চেয়ে বেঁটে হালকা টুকরাগুলো সব চেয়ে দূরে গিয়ে, আর সব চেয়ে লম্বা ভারীগুলো সব চেয়ে কাছে থেকে, দৈর্ঘের ক্রম অনুযায়ী টুকরাগুলো সজ্জিত হয়ে যাবে। একই দৈর্ঘের টুকরার অনেকগুলো কপি আছে বলে তারা একই জায়গায় ঘন হয়ে হয়ে জমবে। গোড়াতেই নিউক্লিয়োটিডগুলোতে একটি তেজষ্ক্রিয় অংশ থাকে বলে এক এক জায়গায় জমা টুকরাগুলো তেজষ্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে এবং এভাবে পরপর জায়গায় জমা সবগুলোর ফটো তুলে নিলে তাতে বারকোডের এক একটি বারের মত স্পষ্ট দাগ ফেলে। কাজেই ফটোতে বিভিন্ন দৈর্ঘের টুকরাগুলোর দাগ পর পর থেকে দীর্ঘ বারকোডের মত একটি লেইন তৈরি করে। এই

ভাবে চারটি টেষ্ট টিউব থেকে চারটি লেইন পাওয়া যায়– একটি A তে শেষ হওয়া টুকরাগুলোর লেইন, একটি T তে শেষ হওয়া টুকরাগুলোর একটি C তে শেষ হওয়া টুকরাগুলোর এবং বাকিটি G তে শেষ হওয়া টুকরাগুলোর লেইন। এখন চারটি লেইনকে একবার পরস্পরের বরাবরে পাশাপাশি রেখে প্রথমে সব চেয়ে বেঁটে টুকরার দাগটি কোন লেইনে আছে দেখা হয়। সেটি যদি A তে শেষ হওয়ার লেইনে থাকে তা হলে মূল ডিএনএর প্রথম বেইসটি হবে A এর সম্পূরক T। আসলে ইতস্তত ও অসংখ্য ক্ষেত্রে কপি তৈরির সংযোজন বন্ধ হওয়ার কারণে চার লেইন মিলে যদি বিবেচনা করা হয় তা হলে একটি টুকরা থেকে পরের লম্বা টুকরাটির দৈর্ঘের পার্থক্য হবে শুধু এক বেইসের এবং তা ওই চার লেইনের কোন না কোনটিতে থাকবে। তাই সব চেয়ে বেঁটে টুকরার ঠিক পরের লম্বা টুকরাটি যদি C এর লেইনে পাওয়া যায় মূল ডিএনএ তে দ্বিতীয় বেইসটি হবে C এর সম্পূরক G। এভাবে পর পর সব বেইস ওই চার লেইনের দাগগুলো পর পর দেখে দেখে পড়ে ফেলা যায়, এতে পুরো ডিএনএটির বেইস-ক্রম জানা হয়ে যায়।

গিলবার্ট–ম্যাক্সাম পদ্ধতি নামে বেইস-ক্রম জানার আরো একটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যার মূলনীতিও প্রায় একই রকমের। সেক্ষেত্রে বেইস সংযোজন করে করে যাওয়ার বদলে মূল ডিএনএটিকে নানা জায়গায় ইতস্তত কেটে ফেলা হয়। চারটি টেষ্ট টিউবে এমন বিভিন্ন এনজাইম থাকে যা একটিতে ডিএনএ'কে A বেইসের পর কাটে, অন্যটিতে C বেইসে, আরেকটিতে G বেইসে এবং চতুর্থটিতে T বেইসে। এরপর বাকি ব্যবস্থা প্রায় আগের পদ্ধতিটির মতই। আজকাল অবশ্য উভয় পদ্ধতির সবগুলো ধাপ স্বয়ংক্রিয় হয়ে গেছে। এখন সত্যি সত্যি কাউকে দেখতেও হয়না চার লেইনে কোন্‌টির পরের দাগ কোন্‌ লেইনে আছে। যন্ত্রের রশ্মি অত্যন্ত দ্রুত লেইন চারটির ওপর পর পর নিজেকে বুলিয়ে গিয়ে পরের দাগটি কোন লেইনে পেল চিহ্নিত করে এবং সে খবর কম্পিউটার পাঠিয়ে দেয়। কম্পিউটার মূল ডিএনএর বেইসগুলো একের পর এক রেকর্ড করে রাখে যথাযথ সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে। ডিএনএ ক্ষুদ্র অণুমাত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং তার প্রত্যেকটিতে বেইসগুলো আরো ক্ষুদ্রতর হওয়া সত্ত্বেও এই কৌশলে আমরা

দ্রুত পড়ে ফেলতে পারছি দীর্ঘ ডিএনএ অণুতে কোন্ বেইসের পর কোন্ বেইস আছে– অর্থাৎ ডিএনএর বেইস-ক্রম।

এই পাঠোদ্ধার পদ্ধতি কিছুটা উন্নত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সরল প্রাণীর সম্পূর্ণ ডিএনএ'র পুরোটাই পড়ে ফেলার ব্যবস্থা করে ফেল্লেন– যদিও তখনো কাজটি খুব কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ ছিল। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ এই সম্পূর্ণ ডিএনএ'রই নানা অংশে থাকে জীবের বৈশিষ্ট বহনকারী সেই জিনগুলো। জিনের মধ্যে বেইস-ক্রমটিই বলে দেয় সেটি

কোন্ জিন, বা আদৌ সেটি একটি জিন কিনা। তাই পুরো ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করে আমরা উদ্ঘাটন করতে পারি ওই জীবের সব কটি জিনকে। একটি জীবের সব জিনকে একত্রে বলা হয় 'জেনোম'। জেনোম হলো জীবের সম্পূর্ণ জিন-সম্ভার। সরলতর নানা প্রাণীর পুরো ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করে বিজ্ঞানীরা এক একটি জীবের জেনোম উদ্ঘাটন করছিলেন। ১৯৯০ এর দশকের শুরুতে এসে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবার পুরো মানব জেনোম উদ্ঘাটনের একটি প্রকল্প নেয়া হবে, এটি ছিল মানুষের সম্পূর্ণ জিন-সম্ভার জেনে ফেলার একটি বিশাল উদ্যোগ।

মানুষের সমগ্র জিন-সম্ভার উদ্ঘাটন

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট নামে পরিচিত এই প্রকল্পটি সব দিক থেকেই ছিল একটি খুবই উচ্চাকাঙ্খী উদ্যোগ। বিজ্ঞানীরা আশা করছিলেন যে মানুষের জীবনের সকল বৈশিষ্টের মৌলিক তথ্য-ভিত্তিটি এভাবে আমাদের হাতে চলে আসবে। প্রাথমিক পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল মানুষের ডিএনএ'র সম্পূর্ণ বেইস-ক্রম পড়ে ফেলা এবং তার মধ্যে জিনগুলো সনাক্ত করা। তারপর একে একে নানা জিনের কাজ উদ্ঘাটন করা এবং তাতে মিউট্যাশন দেখা দিলে বিভিন্ন মিউট্যাশনের প্রভাবে বৈশিষ্টের পরিবর্তন ইত্যাদিও উদ্ঘাটন করা। সব কিছু এভাবে সম্পন্ন হলে মানব-সত্ত্বার জৈব-রাসায়নিক প্রকৃতিটি বিস্তারিত ভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে এবং তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

তবে এমন একটি কঠিন ব্যয়বহুল প্রকল্প নেবার পেছনে শুধু জীবতাত্ত্বিক জ্ঞান লাভটিই উদ্দেশ্য ছিলনা, এর থেকে যে বাস্তব উপকার আশা করা হয়েছে তা হলো এমন কিছু গুরুতর রোগের উৎস সম্পর্কে ভাল ধারণা পাওয়া যেগুলো অন্তত আংশিক ভাবে হলেও বংশগত বলে জানা রয়েছে। কিছু কিছু গুরুতর রোগ যেগুলো খুবই বংশগত এবং একটি মাত্র জিনের মিউট্যাশনের কারণে সৃষ্টি হয়, সেগুলোর দায়ী জিনকে খুবই কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল সিস্টিক ফাইব্রোসিস (শৈশবে দেখা দেয়া শ্বাস ও পরিপাক তন্ত্রের অসুখ, অল্প বয়সে মৃত্যুর কারণ), হান্টিংটন রোগ

(যাতে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের নড়াচড়ার ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকেনা), হেমোফিলিয়া (কাটা-চেরায় রক্তক্ষরণ না থামার অসুখ)। কিন্তু বাকি ছিল ক্যানসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আলজাইমার, স্খিজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি আরো ব্যাপকতর রোগগুলো যেগুলো অন্তত অংশত বংশগত। বোঝা যাচ্ছিল যে এদের প্রত্যেকটি বেশ ক'টি জিনের মিউট্যাশনে সৃষ্টি হয়। সেই জিনগুলো জেনোমের নানা জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তাই আগেরগুলোর মত একটিমাত্র জিনের খোঁজে ডিএনএ'র বিশেষ জায়গার পাঠোদ্ধার করলে এক্ষেত্রে চলেনা। এর সমাধান হলো সমগ্র জেনোম উদ্ঘাটন করা। দায়ী জিনগুলো বের করতে পারলে পরবর্তীতে রোগটি হবার ঝুঁকি নির্ণয় করা যাবে, এ সম্পর্কে সতর্কতা নেয়া যাবে, এমনকি আগেভাগেই সুস্থ জিন দিয়ে মিউট্যাশন হওয়া জিনকে প্রতিস্থাপিত করে এ রোগের জিন-চিকিৎসাও সম্ভব হবে– এ সবই ছিল আশা।

প্রকল্পটি নেয়া হয়েছিলো প্রধানত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে যার সঙ্গে আরো কয়েকটি দেশ সরকারী ভাবে যুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের শেষের দিকে ও এর পরে বেশ কিছু জেনেটিক্স সংক্রান্ত বাণিজ্যিক কোম্পানী সরকারী প্রকল্পের পাশাপাশি এই কাজ চালিয়ে গেছে। মূল প্রকল্পে ২৩ জোড়া মানব ক্রোমোজোমের বিভিন্নগুলো এবং তাদের অংশ বিশেষের ডিএনএ নানা দেশের উন্নত ল্যাবোরেটরীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছিল পৃথক ভাবে উদ্ঘাটনের জন্য। পরে সবগুলোর ফলাফলকে একত্রিত করা হয়েছে। মূল প্রকল্পের বিশাল কর্মযজ্ঞটি ১৯৯০ সালে শুরু হয়ে ২০০০ সালে তার প্রথম খসড়া রিপোর্ট পেশ করে। মানব জেনোমের এই প্রাথমিক উদ্ঘাটনের যুগান্তকারী ঘোষণাটি আনুষ্ঠানিক ভাবে সে বছর দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ২০০৩ সালে চূড়ান্ত রিপোর্টের মাধ্যমে হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট শেষ হয়, যদিও এর ভিত্তিতে উদ্ঘাটিত সব জিনগুলোর কাজ বোঝার গবেষণা ক্রমাগত চলেছে। এভাবে মানব জেনোম একটি খোলামেলা জানা বইয়ে পরিণত হয়েছে– খুলে গিয়েছে মানুষের আত্ম-পরিচয়ের এই দিক।

প্রথমেই পুরো মানব ডিএনএ'র বেইস-ক্রমটির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে– প্রথম বেইস থেকে শেষ বেইস পর্যন্ত। অবশ্য প্রকল্পের মধ্যে একেবারে একশ' ভাগ করা যায়নি, নানা কারণে মাঝে মাঝে অল্প কিছু বাদ গেছে– তবে তা নগণ্য। পাঠোদ্ধারের মূল পদ্ধতি যা আমরা দেখেছি তাই অনুসরণ করা হয়েছে। প্রায় পুরো মানব জেনোমে এভাবে বেইস-জোড়ার সংখ্যা পাওয়া গেছে ৩৩০০ কোটি– সবই ওই A,T,G,C ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ক্রমে। এই বিপুল সংখ্যক বেইসের খুব সামান্য অংশ হলো জেনোমের সব জিনগুলোর অংশ– বড় জোর ৩% এর বেশি নয়। শুধু এই ৩% ডিএনএ রয়েছে জিনগুলোর মধ্যে, এবং তাই শুধু এরাই প্রোটিন তৈরির কোড দিয়ে থাকে, অর্থাৎ যাবতীয় মানব-বৈশিষ্টের নীল-নক্শা হিসেবে কাজ করে। বাকি ৯৭% ডিএনএ বৈশিষ্ট সৃষ্টিতে কোন কাজে লাগেনা তাই এগুলোকে বলা হয় 'অকেজো ডিএনএ' (জাংক্ ডিএনএ)। পরে অবশ্য আমরা দেখবো বৈশিষ্ট সৃষ্টির মূল কাজটি না করলেও এই সিংহ ভাগ 'অকেজো ডিএনএ'র মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অন্য কাজ করার মত প্রচুর অংশ আছে। আপাতত আমাদের মনোযোগ ওই ৩% কোডিং ডিএনএর ওপর যা পুরো জেনোমের নানা অংশে রয়েছে। পরের বড় কাজটি তাই ছিল ওই একটানা বেইস-ক্রমের মধ্যে কোথায় কোথায় এই অর্থপূর্ণ কোডিং ডিএনএ অর্থাৎ জিনগুলো আছে তা সনাক্ত করা।

মানব জেনোমের সব জিন এখন চিহ্নিত

২৩ জোড়া ক্রোমোজোমে ভাগ হয়ে থাকা মানুষের এক টানা ওই ৩৩০০ কোটি বেইস-জোড়ার মধ্যে যেই ৩% জিন হিসেবে রয়েছে তাদেরকে চিনে নেয়া সহজ কাজ নয়। তবে সীমিত সময়ের মধ্যে এই কাজ সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির একটি নতুন শাখার মাধ্যমে। প্রধানত ডিএনএ উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে নতুন গড়ে ওঠা এই শাখার নাম বায়ো-ইনফরমেটিক্স। ডিএনএ বেইস-ক্রমের মধ্যে জিনগুলো খুঁজে নেয়ার প্রাথমিক কাজটি এতে বিজ্ঞানী নিজে দেখে দেখে করার বদলে কম্পিউটারের বিশেষ সফ্টওয়্যারের ওপর ছেড়ে দেন। এর মধ্যে অন্যান্য নানা জীবের জেনোমে যে সব জিন ইতোমধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার সব তথ্য ডাটাবেইসে সংরক্ষিত আছে। এই ডাটাবেইস

বা তথ্য ভাণ্ডার ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে চলছে। বায়ো-ইনফরমেটিক্সের সফ্‌টওয়্যারের একটি কাজ হলো জেনোমের কোথায় বেইসক্রমকে জিনের মত মনে হচ্ছে তা সমগ্র জেনোম খুঁজে খুঁজে বের করা। ডাটাবেইসে থাকা অন্যান্য জীবের জানা জিনগুলোর তথ্যের সঙ্গে দ্রুত তুলনা করার সুযোগ এরকম সফট্‌ওয়্যরের আছে।

আমরা আগেই দেখেছি পরস্পর সংলগ্ন যেকোন তিনটি বেইস একটি কোডন গঠন করে। চারটি বেইসকে তিনটি তিনটি করে এভাবে ৬৪ রকমে সাজানো যায় বলে সম্ভাব্য কোডনের সংখ্যা ৬৪। এর মধ্যে অধিকাংশের প্রত্যেকটি কোডন ২০টি এমাইনো এসিডের কোন একটির কোড হিসেবে কাজ করে, একাধিক কোডনও একই এমাইনো এসিডের কোড হিসেবে রয়েছে। তাছাড়া কোন কোন কোডন জিনের প্রারম্ভ, জিনের সমাপ্তি ইত্যাদি সূচিত করে। কাজেই ডিএনএ'তে যদি পর পর তিনটি তিনটি বেইস নিয়ে কোডনগুলো পড়ে যাওয়া হয় তা হলে কোথাও সম্ভাব্য জিনের মত একটি প্যাটার্ন দাঁড়ায়, কোথাও দাঁড়ায়না। এ ভাবে জিনকে চিনে নিতে কিছুটা সুবিধা হয়, কারণ প্যাটার্নে না দাঁড়ানো ডিএনএ'কে অকেজো ডিএনএ হিসেবে ধরে নেয়া যায়। প্যাটার্নগুলো কী রকমের হতে পারে? পর পর কোডনগুলো বিভিন্ন এমাইনো এসিডের প্রতিনির্ধিত্ব করছে কিনা, তাতে যেভাবে এমাইনো এসিডের শেকল তৈরি হবে সেই গঠনের কোন জানা প্রোটিন রয়েছে কিনা, এসব লক্ষ্য করা প্যাটার্ন খোঁজার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। জানা যে বিশাল সংখ্যক প্রোটিন রয়েছে তাদের এমাইনো এসিড-ক্রম এবং প্রকারান্তরে কোডন-ক্রম ও বেইস-ক্রম ডাটাবেইস থেকে কম্পিউটার খুঁজে নিতে পারে। তাছাড়া খুঁজে নিতে পারে এভাবে যে জিন দাঁড়াচ্ছে তার হুবহু বা তার সদৃশ কোন জিন অন্য জীবের আছে কিনা– যাদের জেনোম ইতোমধ্যে উদ্ঘাটিত হয়েছে। এরকম মিল অসংখ্য জীবের সঙ্গে আছে, কারণ একেবারে মানুষের ক্ষেত্রে অনন্য এমন মানব জিনের সংখ্যা খুবই কম।

কোন কোন সুবিধাজনক জীবের জিনের সঙ্গে মানুষের জিনের মিল অত্যন্ত বেশি। এদের জেনোম মানব জেনোম উদ্ঘাটনে সহায়ক হয়েছে বলে এদেরকে মডেল জীব বলা হয়। ইঁদুর এমনি একটি মডেল জীব। তবে

ইঁদুরের থেকে অনেক সরলতর জীবও চমৎকার মডেল হয়েছে যার মধ্যে আছে রুটির খমীর তৈরি করতে ব্যবহৃত ঈষ্ট, ফিতাকৃমি, ফলের মাছি, মুরগি, জেব্রাফিশ ইত্যাদি অবাক করার মত জীব। কোডনের প্যাটার্ন দেখে জিন নির্ণয়ের একটি বড় সুযোগ করে দিয়েছে জিনের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি সূচক কোডন। আমরা আগেই দেখেছি প্রত্যেকটি জিন শুরু হয়। ATG এই প্রারম্ভ সূচক কোডন দিয়ে, আর শেষ হয় TAA, TAG, অথবা TGA এই তিনটি সমাপ্তি সূচক কোডনের কোন একটিকে দিয়ে। এগুলো দেখে জিনের শুরু ও শেষ আন্দাজ করে নিতে পারলে কম্পিউটার এই দুইয়ের মাঝখানে থাকা জিনের বাকিটুকুর মধ্যে সম্ভাব্য প্যাটার্ন খুঁজে কিছুটা নিশ্চিত হতে পারে।

এ সব কাজে একটি বাড়তি জটিলতার কারণ হলো যে বেইস ক্রমে পর পর বেইসগুলোর সবই পরস্পর সংলগ্ন থাকে, দুটি কোডনের মাঝখানে কোন ফাঁক থাকেনা– এটি আমরা আগেই দেখেছি। পড়ার সময় পরপর তিনটি বেইসকে একটি কোডন এবং পরের তিনটিকে পরের কোডন বিবেচনা করে পড়ে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সব কিছু নির্ভর করে কোন্ বেইস থেকে পড়া শুরু করলাম তার ওপর। যেমন একটি বেইস কোন কারণে বাদ গিয়ে দ্বিতীয় বেইস থেকে পড়া শুরু করলে সব কোডনের অর্থ বদলে যাবে। বাংলা কোন লেখায় শব্দের মাঝখানে ফাঁক না রেখে যদি লিখে যাই এবং তা পড়ার চেষ্টা করি তখন বুঝতে পারবো অসুবিধাটি কী রকমের। ডিএনএর ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বেইস থেকে পড়া শুরু করলে তিন রকমের পাঠ পাব। চতুর্থ বেইস থেকে পড়া শুরু করলে অবশ্য আবার ওই প্রথমটির মত একই পাঠ পাব– শুধু একটি পুরো কোডন বাদ যাবে, এই যা। তাই বলা হয় কম্পিউটারের পক্ষে তিন বিভিন্ন 'রিডিং ফ্রেইমে' বেইসক্রম পাঠ করা সম্ভব যা ভিন্ন ভিন্ন ফল দেবে। ডিএনএ'র দুটি সূত্রকেই যদি পাঠ করা হয় তা হলে মোট 'রিডিং ফ্রেইম' দাঁড়ায় ছয়টিতে। কম্পিউটার যেহেতু অতি দ্রুত পাঠ করে, সে ছয়টি রিডিং ফ্রেইমেই পর পর পাঠ করে দেখে; এর মধ্যে যেটিকে জিনের প্যাটার্নের কারণে তার কাছে সব চেয়ে বেশি অর্থবহ বলে মনে হয় সেটিকেই সে গ্রহণ করে। এভাবে জিনকে সনাক্ত করতে আরো সহায়ক হয় যদি যাকে জিন বলে অনুমান করছি তার বাইরে কিন্তু বেশ কাছাকাছি আরো

কিছু বেইস-ক্রম থাকে যা ওই জিনের প্রমোটার হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা আগে দেখেছি প্রমোটার হলো এমন বেইস-ক্রম যা জিনের বাইরের থেকে তার প্রকাশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রমোটার জিনিসটি চিনতে পারা খুব দুরূহ, তবে কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার তাও করতে পারে।

বেইস-ক্রম পাঠের মাধ্যমে প্রাথমিক ভাবে একটি জিনকে চিনে নেবার পথে আরো কিছু ঝামেলা আছে। ডিএনএ'তে পর পর দুটি জিনের মাঝখানে অনেকটা জায়গা অকেজো ডিএনএ'তে ভর্তি থাকবে সেটি আশা করা যায়। কিন্তু জিনের মধ্যেই কিছু পর পর বেশ কিছু জায়গায় অকেজো ডিএনএ এসে পড়বে এবং তাও প্রচুর দৈর্ঘ নিয়ে, সেটি ঝামেলার ব্যাপারই বটে। কিন্তু প্রায় সব জিনে এটিই নিয়ম– জিন একটানা বেইস-ক্রমে গড়া থাকেনা, তার কিছু অংশ একটু পর পর, এমনকি অনেক সময় একটি কোডনই অসমাপ্ত রেখেই, অকেজো ডিএনএ'র একটি সারি শুরু হয়ে যায়। তারপর এক জায়গায় হঠাৎ করে ওই অসমাপ্ত জিনের পরবর্তী অংশ ফিরে আসে। এ ভাবে জিন বার বার অকেজো ডিএনএ দিয়ে বিঘ্নিত হয়। জিনের মধ্যে এভাবে যে অংশগুলো সত্যিই জিনেরই অংশ অর্থাৎ কোডিং ডিএনএ সেগুলোকে বলা হয় এক্সন। আর যে অংশ অকেজো ডিএনএ তাকে বলা হয় ইনট্রন– এটি বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অংশ। ভাগ্যিস প্রোটিন তৈরি করার সময় যে বার্তাবহ আরএনএ ডিএনএ বার্তার ছাপ বহন করে নিয়ে যায় সে এই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অংশগুলোর ছাপ নেয়না, শুধু এক্সন অংশের ছাপ নেয়। ফলে পড়ার সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হলেও কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রোটিন তৈরির সময় বিঘ্ন ঘটেনা। পড়ার ও বাদ দেবার সুবিধার জন্য একটি এক্সনের পর একটি ইনট্রন শুরু হবার সময় ওই ইনট্রনের অংশ হিসেবে GT এই বেইস দুটি থাকে। আবার ইনট্রন শেষ হয়ে জিনের পরবর্তী অংশ আর একটি এক্সন যখন শুরু হয় তখনও ইনট্রনের অংশ হিসেবে AG এই বেইস দুটি থাকে। এগুলোকে বলা হয় কন্ট্রোল মার্কার। আর প্রথম যে এক্সনটি দিয়ে জিন শুরু হয় তার শুরুতেই থাকে ওই প্রারম্ভ কোডন এবং জিনের একেবারে শেষে যে এক্সন অংশটুকু থাকে তার একেবারে শেষে থাকে সমাপ্তি কোডন।

একটি উপমা দিলে জিনের মধ্যে এই কেজো আর অকেজো অংশের সহ-অবস্থানে সৃষ্ট জটিলতাটি ভাল বোঝা যাবে। মনে করি একটি গল্পের বই পড়ছি। কিন্তু গল্পটি শুরু হবার আগে বইটিতে রয়েছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনেকখানি আবোল তাবোল যার কোন অর্থ হয়না। এক পর্যায়ে এসে গল্পের প্রথম শব্দটি পেলাম–'প্রারম্ভ'। তারপর সত্যিই গল্পটি শুরু হলো। কিন্তু গল্প কিছুদূর এগোবার পর একটি বাক্যের মাঝখানেই শুরু হয়ে গেল আবার সেই আবোল তাবোল– পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। আবোল তাবোল শুরু হবার ঠিক আগে তারই অংশ হিসেবে লেখা আছে 'আব' এই শব্দটি– বুঝলাম এবার আবোল তাবোল শুরু হবে। আবোল তাবোল শেষ হয়ে গল্পটি আবার শুরু হলো ওই অসমাপ্ত বাক্যটিকে সমাপ্ত করে। অবশ্য আবোলতাবোলের এই অংশ শেষ হবার ঠিক পর ওরই অংশ হিসেবে লেখা আছে 'গল' এই নিরর্থক শব্দটি– এতেই বুঝলাম গল্প এখান থেকে আবার চলবে। কিছু দূর যাবার পর আবার গল্প পাঠে বিঘ্ন ঘটলো আবোল তাবোলে– সেই একই ভাবে। এভাবে গল্পটি পড়া বার বার বিঘ্নিত হয়েছে। গল্পের একেবারে শেষ অংশে গিয়ে গল্পেরই

6 CAAACAGACACCATGGTGCATCTGACTCCT
7 GAGGAGAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGG
8 GGCAAGGTGAACGTGGATGAAGTTGGTGGT
9 GAGGCCCTGGGCAGGTTGGTATCAAGGTTA
10 CAAGACAGGTTTAAGGAGACCAATAGAAAC
11 TGGGCATGTGGAGACAGAGAAGACTCTTGG
12 GTTTCTGATAGGCACTGACTCTCTCTGCCT
13 ATTGGTCTATTTCCCACCCTTAGGCTGCTG
14 GTGGTCTACCTTTGGACCCAGAGGTTCTTT
15 GAGTCCTTTGGGGATCTGTCCACTCCTGAT
16 GCTGTTATGGGCAACCCTAAGGTGAAGGCT
17 CATGGCAAGAAAGTGCTCGGTGCCTTTAGT
18 GATGGCCTGGCTCACCTGGACAACCTCAAG
19 GGCACCTTTGCCACACTGAGTGAGCTGCAC
20 TGTGACAAGCTGCACGTGGATCCTGAGAAC
21 TTCAGGGTGAGTCTATGGACCCTTGATGT

হোমোগ্লোবিনের জিনের একাংশ

রক্তের হোমোগ্লোবিনের প্রোটিন তৈরি করার একটি জিনের একাংশের বেইস-ক্রম। বোল্ড অক্ষরে মুদ্রিত বেইসগুলো সরাসরি জিনের অর্থপূর্ণ অংশ (এক্সন) বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। হালকা অক্ষরে মুদ্রিত বেইসগুলো অকেজো ডিএনএ অংশ (ইন্ট্রন)। বেইসগুলো এখানে নানা সারিতে ভাঙ্গা হয়েছে মুদ্রণের সুবিধার জন্য, আসলে বেইসগুলো ডিএনএতে একটানা থাকে। পর পর তিনটি তিনটি বেইস নিয়ে এক একটি কোডন দেখা যাচ্ছে। 6 নং সারিতে ডাবল আন্ডারলাইন করা কোডন ATG হলো জিনটির 'প্রারম্ভ' কোডন। এটি সহ এরপর প্রতি তিনটি বেইস এক একটি কোডন (বোল্ড অক্ষরে দেখানো)। যেমন ঠিক পরেরটি GTG, যা ভ্যালাইন নামক এমাইনো এসিডের প্রতিনিধিত্বকারী কোডন। 9 নং সারিতে সিঙ্গল আন্ডাললাইন করা GT হচ্ছে একটি কন্ট্রোল মার্কার। এর মানে এখান থেকে কিছু অর্থহীন অকেজো ডিএনএ শুরু (হালকা অক্ষরে দেখানো)। 13 নং সারিতে সিঙ্গল আন্ডার লাইন করা AG হলো আর একটি কন্ট্রোল মার্কার। এর মানে এখান থেকে আবার জিনটির পরের অংশ শুরু (বোল্ড অক্ষরে)। 21 নং সারিতে আবার সিঙ্গল আন্ডারলাইন করা GT কন্ট্রোল মার্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে এর পর আবার অর্থহীন অকেজো ডিএনএ শুরু হচ্ছে (হালকা অক্ষরে)।

অংশ হিসেবে লেখা আছে 'সমাপ্ত'। এই গল্পটির ওপর ভিত্তি করে একটি নাটক মঞ্চস্থ করার আগে অবশ্য নাট্যকার বইটির একটি সম্পাদিত কপি তৈরি করে নিয়েছেন। এতে ওই আবোল তাবোল অংশগুলোকে বই থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে। কাজেই বইটিতে একটানা গল্পটি পেয়ে নাটক করতে সুবিধা হয়েছে। এই উপমাটির সঙ্গে জিনের ব্যাপারটি মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সেখানে অর্থপূর্ণ অংশের মাঝে মাঝে অকেজো অংশ কীভাবে আছে আর প্রোটিন তৈরির আগে বার্তাবহ আরএনএ কী ভাবে অকেজো অংশ বাদ দিয়ে নিচ্ছে।

বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের সফটওয়্যারগুলো কেজো আর অকেজো ডিএনএর প্রকৃতিগুলো দেখে, কন্ট্রোল মার্কার, প্রারম্ভ, সমাপ্তি কোডন ইত্যাদি দেখে প্রাথমিক ভাবে জিনকে সনাক্ত করতে পারে। কিন্তু এটি নেহাতই প্রাথমিক অনুমান। একে নিশ্চিত করতে হলে এর পাশাপাশি বাস্তবে ডিএনএ'র ওপর কিছু পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাতে হয়। যেমন আমরা দেখেছি যেই ডিএনএ কোডিং করে, তার ছাপ নিয়ে প্রোটিন তৈরির জন্য তার সঙ্গে বার্তাবহ আরএনএ থাকার কথা। কাজেই বাস্তব ডিএনএতে কোথাও বার্তাবহ আরএনএ'র সন্ধান পেলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে ওখানে একটি জিন রয়েছে। এই আরএনএ'র বেইস-ক্রম জেনে নিতে পারলে বোঝা যাবে যে কোনটি ডিএনএ'র কোডিং অংশ– কারণ তার মধ্যে শুধু এক্সন অংশ থাকে, ডিএনএর অকেজো বিঘ্নকারী অংশ ইনট্রনকে সে বাদ দিয়ে ছাপ নেয়।

একদিকে বায়ো-ইনফরম্যাটিক্স, অন্যদিকে বাস্তব পরীক্ষা নিরিক্ষা উভয়ের মিলিত প্রয়োগে মানব জেনোমের প্রায় সব জিন এখন উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এবং অন্যান্য অনেকের মধ্যে একটি দারুণ কৌতুহল ছিল যেই মানুষ মানসিক সামর্থে এবং উচ্চ চিন্তা ক্ষমতায় এতই অনন্য, তার অসংখ্য জটিল বৈশিষ্টের প্রতিনিধিত্ব করবে জিনের সংখ্যাও নিশ্চয়ই অন্যান্য প্রাণী থেকে অনেক বেশি হবে। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন জিন উদ্ঘাটন হলো মোট জিনের সংখ্যাতে সে রকম অনন্য কিছু পাওয়া গেলনা। প্রাথমিক ভাবে জিনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২ হাজারের মত। চলমান গবেষণায় এ সংখ্যা

কিছু বাড়লেও খুব বেশি বাড়ার কথা নয়। সংখ্যাটি অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর সঙ্গে প্রায় একই কোঠায় ইঁদুর, কুকুর ইত্যাদি সহ; শিম্পাঞ্জি তো বটেই। আরো অবাক করার মত জিনিস হলো ফলের মাছি, অন্ত্রের বড় কৃমির মত অত্যন্ত সরল সব প্রাণীর জেনোমে জিন সংখ্যা যে এর চেয়ে খুব কম তাও বলা যাচ্ছেনা– ফলের মাছিতে ১৭ হাজার, বড় কৃমিতে ১৯ হাজার। এগুলো বেশ অবাক করার মত ঘটনা। কৃমির মত একটি প্রাণী মানুষের প্রায় কাছাকাছি এত জিন নিয়ে করে কী? তার জীবন-বৈশিষ্টের মধ্যে এমন কি কি থাকতে পারে যার বাস্তবায়ন করতে তাকে এত জিনের নির্দেশে এত প্রোটিন তৈরি করতে হবে? আবার অন্য দিকে মানুষের মত প্রাণী যার এত অনেক বৈশিষ্ট এত কম জিন দিয়ে তার চলে কী করে। এসব প্রশ্নের উত্তরও এর মধ্যে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে।

জিনের সংখ্যাটি শুধু নয়, সেই জিনগুলো শেষ পর্যন্ত কতগুলো বৈশিষ্ট সৃষ্টি করতে পারছে সেটিই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কৃমি বা ফলের মাছির মত প্রাণীতে সব জিন শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়না– এভাবে অকার্যকর হবার ঘটনা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কম, মানুষের ক্ষেত্রে খুব কম। বরং শেষোক্ত ক্ষেত্রে একই জিন নানা ভাবে কার্যকর হয়ে নানা বৈশিষ্ট দিতে পারে। এর একটি কৌশল হলো ডিএনএ থেকে ছাপ নিয়ে বার্তাবহ আরএনএ যখন প্রোটিন তৈরি করতে যায়, মানুষের ক্ষেত্রে (অন্য স্তন্যপায়ীতেও কিছুটা) সেটি কিন্তু নানা ভাবে ছাপ নেয়– জিনের সব এক্সনের ছাপ এক সঙ্গে না নিয়ে কখনো এই কয়টি এক্সন, কখনো ওই কয়টি এক্সন, এভাবে নানা মিশ্রণে নিয়ে নানা প্রোটিন তৈরির ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে একই জিন বহু বৈশিষ্ট সৃষ্টি করতে পারে, যা সরলতর প্রাণীতে তেমন হয়না। মানুষের জেনোম যে প্রোটিনগুলো তৈরি করে, দেখা গেছে তার মধ্যে অনেকগুলো একাধিক বৈশিষ্ট দানের কাজ করতে পারে, খুব সম্ভব কোষে কোষে বিভিন্ন ধরনের বিক্রিয়ায়– এতেও কম জিনে বেশি বৈশিষ্ট সৃষ্টির সুবিধা হয়ে গেছে। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করা হয়েছে যে কৃমির মত সরল প্রাণীতে যেই বড় জিনসংখ্যা দেখা যাচ্ছে তার অনেকগুলো একই জিনের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক পুনরাবৃত্তি মাত্র– যেগুলো সম্পূর্ণ নতুন বৈশিষ্ট দেয়না।

কোন্ জিন কোন্ বৈশিষ্ট দেয়?

জেনোম উদ্ঘাটনে আমাদের সামনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো কোন্ জিন কোন্ বৈশিষ্টটি সৃষ্টি করে তা। অনেক সময় উল্‌টো প্রশ্নটিই বড় হয়ে দেখা দেয়– কোন বৈশিষ্টের উৎস কোন জিনে খুঁজে পাচ্ছি? উভয় ক্ষেত্রে এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া খুবই কঠিন। সেই কারণে মানব জেনোমের বহু জিনের ক্ষেত্রে এটি এখনো চলমান প্রক্রিয়া হয়ে রয়েছে– যতই গবেষণা চলবে ততই আরো ভাল ভাবে জানা যাবে। খুব সোজাসাপ্‌টা ভাবে বলতে গেলে শেষ পর্যন্ত এর উত্তরটা পেতে হবে জীবটির ডিএনএ'তে একরকম কারিগরি চালিয়ে। তার একটি জিনকে জেনোম থেকে বাদ দিয়ে, অথবা এটিকে বিকল করে অথবা বিকৃত (মিউট্যাশন) করে সেই জীবটির যাবতীয় বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যাক। জিনটির ওপর ওই কারিগরি চালাবার পর যেই বৈশিষ্টে পরিবর্তন এসেছে– বলা যাবে যে ওই হস্তক্ষেপ করা জিনটিই সেই বৈশিষ্টের জন্য দায়ী। এভাবে অন্তত প্রশ্নের প্রথম রূপটির জবাব আশা করতে পারি– কোন্ জিনের জন্য কোন্ বৈশিষ্ট। কিন্তু সমস্যা হলো শুধু এটি জানার জন্য আমরা কোন মানুষের জেনেটিক গড়নে হস্তক্ষেপ করতে পারিনা। কিন্তু সরলতর সেই মডেল জীবগুলোর জেনোমে তা পারি– ঈষ্ট, ফিতাকৃমি, ইঁদুর ইত্যাদির ওপর। ওদের বাড়তি সুবিধা হলো অনেক সংখ্যায় ও দ্রুত পর পর প্রজন্মে ওদের ওপর এ ধরনের জিন কারিগরি চালাতে পারি। এটি চালানো হয়েছে এবং সেভাবে এগুলোর ক্ষেত্রে কোন্ জিন কোন্ বৈশিষ্ট দেয় তা উদ্ঘাটিত হয়ে বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের ডাটাবেইসে সংরক্ষণও করা হয়েছে। এখন মানুষের মধ্যে এদের কোন জিনের সদৃশ জিন যখন খুঁজে পাই তখন আশা করতে পারি সে জিনের কাজ ওই জীবের মধ্যে যা, মানুষের মধ্যেও তার মতই কোন কাজ হবে। এই সদৃশ জিন খুঁজে নিয়ে সেই জীবের বৈশিষ্ট নির্ধারণে তার কাজের থেকে মানুষের প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্টটি নির্ধারণে আন্দাজ পাওয়ার চেষ্টাটি অনেকাংশে আমরা কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যারের ওপর ছেড়ে দিতে পেরেছি।

উল্‌টো দিক থেকেও মডেল জীবের ওপর পরীক্ষা নিরিক্ষা চালানো গিয়েছে। সরলতর জীব বলে এদের দেহে বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিস (ক্যামিকাল্‌স, রশ্মি

ইত্যাদি) প্রয়োগ করে দেহের নানা অংশে অথবা জীবটির আচরণে মিউট্যাশনের মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটানো সহজ। এভাবে কোন একটি জীবে একটি বিশেষ পরিবর্তন এলে তার জেনোম পরীক্ষা করে দেখা যায় কোথায় কোন্ জিনের মধ্যে বিকৃতি ঘটাতে এই পরিবর্তন এসেছে। অনেক সময় উভয় পরিবর্তন বংশানুক্রমে অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়। অল্প সময়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যাওয়া যায় বলেও মডেল জীবে এটি সুবিধাজনক। জীবের মধ্যে পরিবর্তনের জন্য দায়ী জিনটিকে সনাক্ত করার পর, আরো গভীর জেনেটিক গবেষণায় গিয়ে দেখা যায় কোন্ প্রোটিন সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা প্রোটিনে কী বদল হবার মাধ্যমে ওই পরিবর্তন ঘটেছে, আর কী পদ্ধতিতে ওটি ঘটেছে। আগের মতই মডেল জীবের এসব তথ্য ডাটাবেইসে যাবার পর মানুষের ক্ষেত্রে সদৃশ কোন্ পরিবর্তন আছে, কোন্ রোগের ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন জিনকে দায়ী করা যায়, সে সব খুঁজে নেবার অনেকখানি কাজ বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের হাতে ছেড়ে দেয়া যায়।

জীব মডেলের জিনের কাজ বোঝা থেকে মানব জিনের কাজ বোঝা উপরের পদ্ধতিতে কেমন করে সম্ভব হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক। ইঁদুরের ভ্রূণে একটি বিশেষ জিনে মিউট্যাশন ঘটিয়ে দেখা গেছে যে বেড়ে ওঠার পর ওই ইঁদুরের সব কিছু স্বাভাবিক থাকলেও সেটি কানে শুনতে পায়না। বোঝা গেল যে কানে শোনার প্রক্রিয়ার জন্য ওই জিনটি অবিকৃত থাকাটি জরুরী। এদিকে ইঁদুরের ওই জিনটির খুবই সদৃশ (বেইস-ক্রমের মিলের দিক থেকে) একটি জিন মানুষের জেনোমে খুঁজে পাওয়া গেছে। কাজেই আন্দাজ করা গেল যে মানুষেরও শ্রবণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই সদৃশ জিনটির সম্পর্ক থাকতে পারে। আসলেও জন্মবধির অনেক মানুষের জেনোম বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তাদের অনেকের মধ্যে এই জিনটি বিকৃত ভাবে আছে।

অনেক সময় নিজেদেরকে কষ্ট করে মডেল জীবে পরিবর্তন ঘটাতে হয়না, প্রাকৃতিক কারণেই ওর মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েই থাকে। তখন শুধু জানার চেষ্টা করতে হয় কোন্ জিনে মিউট্যাশন ঘটিয়ে প্রকৃতি এই কাজটি করেছে। আন্টর্কটিকার শীতল সমুদ্রে গভীর পানিতে বাস করে আইস

ফিশ নামক একটি মাছ– এটিই চমৎকার মডেলের কাজ করলো মানুষের অন্তত দুটি গুরুত্বপূর্ণ অসুখের জিন খুঁজে পেতে। এই মাছটির পটকা নেই বলে পানিতে ভেসে থাকার জন্য এর হাড়কে সচ্ছিদ্র ঝাঁঝরা হতে হয়েছে, যাতে দেহ হালকা করে পানিতে ভাসা যায়। তুলনীয় অন্য জায়গার স্বাভাবিক মাছের জেনোমের সঙ্গে তুলনা করে বোঝা গেছে এরকম হাড় ঝাঁঝরা হবার জন্য আইস ফিশে কোন্ জিনটির মধ্যে মিউট্যাশন ঘটতে হয়েছে, এবং কী রকম মিউট্যাশন হতে হয়েছে। মানুষে হাড় ঝাঁঝরা হবার যে অসুখ আছে তার জন্য দায়ী জিন আইসফিশের ওই জিনের সদৃশ হবে সেটি ভাবাই স্বাভাবিক। একই ভাবে আইস ফিশ শীতল পানিতে থাকে বলে তার দেহে এমনিতেই অনেক অক্সিজেন মিশে থাকে, তাই তার রক্তে অক্সিজেন বহন করার লোহিত কণিকা বেশি লাগেনা। অন্যত্র স্বাভাবিক লোহিত কণা আছে এমন একই জাতের মাছের জেনোমের সঙ্গে তুলনা করে জানা গেছে কোন্ জিনটিকে বিকল করে আইস ফিশ লোহিত কণিকা উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছে। এক্ষেত্রেও সন্দেহ করা হয়েছে যে মানুষের এনেমিয়া বা রক্তশূন্যতার কারণটি আইস ফিশের ওই জিনের সদৃশ মানুষের জিনে পাওয়া যাবে। এই উভয় সন্দেহের ভিত্তিতে দুটি খুবই বিপজ্জনক রোগ ঝাঁঝরা হাড় আর রক্তশূন্যতার রোগের জিন-চিকিৎসার পথ শিগ্গির খুলে যেতে পারে।

এই যে আইস ফিশের ঝাঁঝরা হাড়ের জিনের কোন সদৃশ জিন মানুষের জেনোমে খুঁজে নেয়া, আইস ফিশের পুরো জোনোম না খুঁজেও এ ধরনের কাজের একটি সরাসরি পদ্ধতি রয়েছে। সেই ক্ষেত্রে কোন্ পরিবর্তিত প্রোটিনের প্রভাবে আইসফিশের হাড় ঝাঁঝরা হয়েছে তার বাস্তব পরিচিতিটা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে বের করা হয়েছে। ওই প্রোটিনের এমাইনো এসিড ক্রম জানা থাকলে সেখান থেকে তার জিনের বেইস-ক্রম বা তার সম্পূরক-ক্রমও জানা হয়ে যায়। ওরকম একটি সম্পূরক বেইস-ক্রমের ডিএনএ অংশ কৃত্রিমভাবে তৈরি করে নিয়ে তার অনেক কপি মানব ডিএনএ'র সম্ভাব্য অংশের টুকরাগুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়। এখন সম্পূরকতার কারণে ওই আইস ফিশ জিনের সদৃশ জিনের সঙ্গে গিয়েই এই কৃত্রিম ডিএনএ'গুলো আবদ্ধ হবে। এখানে সম্পূরক কৃত্রিম ডিএনএ'র কপিগুলোকে যেন দীর্ঘ মানব

জেনোম থেকে সঠিক জিন ধরার একটি 'টোপ' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, মাছ ধরার মত। মাছ ধরায় এক এক মাছের যদি এক এক টোপ হয়, তা হলে একটি বিশেষ টোপ ব্যবহার করলে অনেক মাছের মধ্যে একটি বিশেষ মাছই তার সঙ্গে যেমন করে আটকাবে, এখানেও অনেকটা সে রকম ভাবেই হচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো এই কারণে পদ্ধতিটাকে বলাই হয় 'ফিশিং'।

বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দিয়ে নানা টুকরা আলাদা করলে ওই টোপ-সহ টুকরাগুলো সব এক জায়গায় পুরু হয়ে জমবে, এবং 'টোপের' সঙ্গে তেজষ্ক্রিয় জিনিস মেশানো থাকলে তা দৃশ্যমানও হবে। এভাবে আমরা সদৃশ জিনটি খুঁজে পাব। যে কোন জীবের জিনের সদৃশ জিন খুঁজে নিতে এবং আরো নানা অনুসন্ধানে এই ফিশিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। মাছের বৈশিষ্টের মত কোন কিছু মানুষের বৈশিষ্টে খুঁজে পাওয়াটি তবুও বোঝা যায়, যেমন হাড় ঝাঁঝরা হওয়া, রক্তকোষ তৈরি না হওয়া। কিন্তু একেবারেই সরল প্রকৃতির যেসব মডেল জীব ব্যবহার করা হয়, যেমন ঈষ্ট, সেখানে মানুষের মত কী বৈশিষ্ট খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু জেনেটিক দিক থেকে বৈশিষ্টের এমন কোন না কোন ইশারা সেখানেও পাওয়া যেতে পারে যার সূত্র ধরে মানুষের এর সদৃশ জিনের দেয়া বৈশিষ্টটি আন্দাজ করা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ মানুষের আলকাপটোনুরিয়া নামের একটি রোগ আছে যাতে কিছু কিছু খাদ্য খাওয়ার পর রোগীর মূত্র কালচে নীল রঙের ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ওদিকে জীববিজ্ঞানীরা এমন একটি ফাঙ্গাস লক্ষ্য করেছেন যে এর কোন কোন নমুনা বিশেষ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে এলে ফাঙ্গাসটি অনেকটা একই রকম রঙ ধারণ করে, তবে সব নমুনায় এটি ঘটেনা। এই দু'রকম নমুনার জিন-ম্যাপ তুলনা করে দেখা গেল রঙীন হওয়া নমুনায় একটি জিন অন্য নমুনার সেই জিনের মত নয়, এটি মিউট্যাশন হওয়া অবস্থায় আছে। শুধু ওই রঙটি থেকে সন্দেহ জাগলো যে মানুষের জেনোমে এই এই জিনের সদৃশ জিন খুঁজে পাওয়া গেলে তার মিউট্যাশনের সঙ্গে আলকাপটোনুরিয়া রোগের কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখা যেতে পারে। যদিও ফাঙ্গাসের মূত্র বলে কিছু নেই, তবুও বিশেষ দ্রব্যের সংস্পর্শে তার নি:সরণের রঙ বিশেষ খাবারের পর মানুষ রোগীর মূত্রের রঙের কথা মনে করিয়ে দিলো। ফাঙ্গাসটির এই জিনটিকে 'টোপ' হিসেবে

ব্যবহার করে ঠিকই মানুষের জেনোমে সদৃশ জিন খুঁজে পাওয়া গেল। আর ঠিক যা সন্দেহ করা হয়েছিলো তাই পাওয়া গেল– আলকাপটোনুরিয়া রোগীদের ক্ষেত্রে জিনটি মিউট্যাশনযুক্ত। ওরকম সন্দেহ হলেই সব কিছু ধারণা মতো হবে এমন কথা নেই। তবুও বিজ্ঞানীরা সেই সন্দেহ মত অনুসন্ধান চালিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের জিন-উৎস খুঁজে পেয়েছেন। এমনিভাবে ঈষ্টের স্নায়ুতন্ত্র বলতে যদিও কিছু নেই, তবুও ঈষ্টের কিছু সূক্ষ্ম আলামত থেকে তার জন্য দায়ী জিনের সূত্র ধরে মানুষের একটি স্নায়ুর অসুখের জিন আবিস্কার সম্ভব হয়েছে।

এভাবে অন্য প্রাণীর জিন থেকে সূত্র পেয়ে মানুষের অনুরূপ জিনের কাজ উদ্ঘাটন যে সম্ভব হচ্ছে তার কারণ মানুষের অধিকাংশ জিনের কাছাকাছি জিন অন্যান্য প্রাণীতে রয়েছে এবং উভয়ের ক্ষেত্রে সে জিনের কাজেও অন্তত কিছু সাদৃশ্য আছে। ভুলে গেলে চলবেনা যে মানুষসহ সব প্রাণী নিজেদের জিনগুলো পেয়েছে তাদের সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে– অবশ্য যার যার ধারায় বিবর্তিত হবার দীর্ঘ সময়ে সেই সব জিনের কেথাও কোথাও মিউট্যাশন ঘটে সেগুলো পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু নানা জীবে এগুলো এখনো সদৃশ, এবং তাদের কাজের মধ্যেও সাদৃশ্য আাছে। অবশ্য কিছু কিছু মানব জিন অন্য কোন প্রাণীতে পাওয়া যায় না, বা সেখান থেকে এদের কাজ অনুমান করা যায়না। এগুলোর কাজ কী তা উদ্ঘাটন করা কঠিন, কিন্তু তাও করার নানা কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে এবং সেই অনন্য মানব-জিন গুলোও উদ্ঘাটিত হচ্ছে। যেমন এ কৌশলের একটি হলো যে মানব-জিনের কাজ বের করতে হবে তার বেইস-ক্রম থেকে উৎপাদিত এমাইনো এসিড ক্রমটি জেনে ফেলা। এখন এরকম এমাইনো এসিডের শেকল ভাঁজ হয়ে যে প্রোটিন তৈরি হয় সেটি সম্পর্কে যত কিছু জানা সম্ভব জেনে নেয়া যায়। ওই প্রোটিনের কাজ ও গুণাগুণগুলো থকে আন্দাজ করা সম্ভব তা মানুষের দেহ অথবা মনের মধ্যে কী রকম বৈশিষ্ট সৃষ্টি করতে পারে। তা হলে সেই জিনটিই যে এই প্রোটিন সৃষ্টির মাধ্যমে বৈশিষ্টটির জন্য দায়ী তা বলা যাবে।

জিন সনাক্ত করতে ও জিনের কাজ উদ্ঘাটন করতে সব রকম প্রচেষ্টায় বায়ো-ইনফর্মেটিক্সের মূল ভূমিকাগুলো আমরা দেখেছি। এই ভূমিকা আরো

কয়েকটি দিক থেকে আসতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বায়ো-ইনফরমেটিক্স দুটি জীবের সম্পূর্ণ জেনোমের আগাগোড়া তুলনা করে ফেলতে পারে। যেমন এ ভাবেই এটি দেখিয়ে দিতে পারে যে এই জেনোম দুটিতে সদৃশ জিনগুলো একই ক্রমানুসারে রয়েছে– অর্থাৎ একটি জেনোমের বিশেষ ক্রোমোজোমে যেই জিন যার পরে আছে, অন্যটিতেও সেভাবেই আছে। তাই যদি হয় তা হলে ওই একটি জীবের কোন জিন ও তার কাজ জানলে, জেনোমে তার অবস্থান থেকে অন্য জীবের ক্ষেত্রেও তার অনুরূপ জিনের অবস্থান ও কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক আন্দাজ পাওয়া যাবে।

এভাবে দুটি জেনোমের সামগ্রিক তুলনা থেকে জীবদুটির বিবর্তনগত সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরত্ব নিরূপণ করা যায়। যেমন উভয়ের মধ্যে যথাযথ জিন-মিউট্যাশনগুলোর মিল-অমিল দেখে ধারণা পাওয়া যাবে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কত সময় আগে জীবদুটির পূর্বপুরুষরা পরস্পর থেকে বিছিন্ন হয়ে পৃথক ধারায় অগ্রসর হয়েছিলো। দুটি জেনোমের মধ্যে এ ধরনের তুলনা একেবারে এক একটি বেইস ধরে ধরে যেমন চলতে পারে ক্ষুদ্রতম পর্যায়ে, সে রকম জিনের সঙ্গে জিনের, এবং তারপর ক্রোমোজোমের সঙ্গে ক্রোমোজোমের তুলনা চলতে পারে একেবারে বৃহত্তম পর্যায়ে। তা ছাড়া দুই জেনোমের জিনগুলো যে প্রোটিন সমূহ তৈরি করে তাদের গঠন হিসেব কষে বের করে সেগুলোর পর্যায়ের তুলনাও বেশ কাজে আসে। বায়ো-ইনফরমেটিক্স যদি এভাবে জেনোমজোড়া তুলনা অতি দ্রুত ব্যাপক ভাবে না করতে পারতো তা হলে এখন যে আমরা মানুষের নানা অসুখের জিন সনাক্ত করছি, তার অনেকগুলোই করতে পারতামনা। কারণ অধিকাংশ বড় ও ব্যাপক অসুখের উৎস একটি জিনে নয়, জেনোমের নানা জায়গায় থাকা বেশ কিছু মিউট্যাশন হওয়া জিনে। ডায়াবেটিস, নানা ক্যানসার, হৃদরোগ, আলজাইমার ইত্যাদি বহু রোগের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। যেই বেশ ক’টি জিন এর প্রত্যেকটির জন্য দায়ী তার সবগুলোকে একসঙ্গে নিয়ে বিবেচনা করেই অসুখটির সঙ্গে জিনগুলোর কোন্‌টি কীভাবে সম্পর্কিত তা বোঝা যায়। শুধু অসুখ নয়, মানুষের যে কোন জটিল বৈশিষ্টের উৎস খুঁজতে এমনটি জেনোমজোড়া অনুসন্ধানই চালাতে হয়।

যে কোন জিন যে বৈশিষ্ট দেবার কথা সেটি সত্যি সত্যি পাওয়া যায় জিনটি ঠিকমত প্রকাশিত হতে পারলে, যতখানি প্রকাশ হবে বাস্তবে বৈশিষ্টটি ততখানিই পাওয়া যাবে। তাই মানব-বৈশিষ্টের সঙ্গে শুধু তার জিনের সম্পর্ক নয়, জিন-প্রকাশেরও সম্পর্ক রয়েছে। সেটি নির্ণয় করতেও বায়ো-ইনফরমেটিক্স অপরিহার্য। একটি উদাহরণ দিলে এটি ভাল বোঝা যাবে। যে কোন ক্যানসারে শরীরের একই অংশে একই ধরনের কোষের মধ্যে যেগুলো ক্যানসার আক্রান্ত সেগুলোতে ক্যানসারের জন্য দায়ী জিন-মিউট্যাশনগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, সুস্থ কোষগুলোতে তা হচ্ছেনা। এই দুইয়ের জিন কিন্তু একই অর্থাৎ তাদের বেইসক্রম একই, কিন্তু প্রকাশিত হবার প্রমোটার ইত্যাদির বেইস-ক্রম একই নাও হতে পারে। উভয়ের সব বেইস-ক্রম নির্ণয় করে ডাটাবেইসে রাখা আছে। বাস্তবে এর থেকে যে বার্তাবহ আরএনএ তৈরি হয় প্রোটিন তৈরি জন্য, তার বেইসক্রমও নির্ণয় করে ডাটাবেইসে রাখা আছে। এই ডিএনএ এবং আরএনএ তুলনা করে বোঝা যায় জিন কতটা প্রকাশিত হয়েছে, কারণ প্রকাশিত হলেই শুধু ডিএনএ থেকে বার্তাবহ আরএনএ তৈরি হয়, নইলে হয়না। বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের সফ্‌টওয়্যার সুস্থ কোষে প্রাসঙ্গিক কোন্ কোন্ জিনের মিউট্যাশন কতখানি প্রকাশিত হচ্ছে, আর আক্রান্ত কোষে তা কতখানি হচ্ছে, সেই তুলনা থেকে অসুখটিতে জিন-প্রকাশের ভূমিকাটি স্পষ্ট হয়।

এসব উদ্ঘাটনের কাজ এখন কত সহজ ও তাৎক্ষণিক হয়ে পড়ছে সেটি বোঝা যাবে এ সম্পর্কিত একটি অতি আধুনিক কৌশল দেখলে। একে বলা হয় জিন-অ্যারে বা জিন-চিপ। মাইক্রোস্কোপ স্লাইডের মত একটি কাচের স্লাইডে পাশাপাশি সারি সারি অনেক ক্ষুদ্র ফোটার মত স্থানের প্রত্যেকটিতে এক একটি জিনের ডিএনএ থাকে (এ জন্যই ‘অ্যারে’ নামটি)। এভাবে হয়তো কয়েক হাজার জিনের ফোটা এই ছোট পাতলা স্লাইডটিতে থাকে (এ জন্যই ‘চিপ’ নামটি)। ধরা যাক এরকম একটি জিন-চিপ আমরা ওপরের ওই উদাহরণটিতে সুস্থ এবং রোগাক্রান্ত কোষগুলোতে ক্যানসার জিন-মিউট্যাশন গুলোর প্রকাশের পরিমাণ জানতে ব্যবহার করছি। সেক্ষেত্রে সুস্থ ও আক্রান্ত কোষ থেকে সব বার্তাবহ আরএনএ নিয়ে ওই জিনচিপের ফোটাগুলোর ওপর

তা দেয়া হয়। তার আগে আক্রান্ত কোষের আরএনএ'র সঙ্গে লাল রঙের ফ্লোরোসেন্ট বস্তু (যা অন্ধকারে জ্বলে) মেশানো হয়, আর সুস্থ কোষের আরএনএ'র সঙ্গে সবুজ রঙের। বার্তাবহ আরএনএ বেইস-ক্রম ডিএনএ বেইস-ক্রমের সম্পূরক হওয়াতে সঠিক জিনে গিয়ে এই আরএনএ আবদ্ধ হবে। যেই ফোটায় সুস্থ কোষের তুলনায় আক্রান্ত কোষের আরএনএ অনেক বেশি আবদ্ধ হবে সেই ফোটা লাল রং নেবে। যে ফোটায় সুস্থ কোষের তুলনায় আক্রান্ত কোষের আরএনএ অনেক কম আবদ্ধ হবে সেটি সবুজ রং নেবে। যেই ফোটায় উভয় রকম কোষের আরএনএ প্রায় সমান ভাবে আবদ্ধ হবে সেটি লাল আর সবুজ মিলে হলুদ রং নেবে। এর অর্থ হলো ফোটা লাল হলে বুঝতে হবে ওই ফোটায় থাকা জিন-মিউট্যাশনটি আক্রান্ত কোষে ভাল ভাবে প্রকাশিত হয়েছে, অর্থাৎ এর দ্বারা সৃষ্ট প্রোটিনের উপস্থিতি আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। ফোটা সবুজ হলে বুঝতে হবে এই ফোটার জিনটি সুস্থ কোষে ভালভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আক্রান্ত কোষে হয়নি, তাই হয়তো এর দ্বারা তৈরি প্রোটিনের অভাব আক্রান্ত হবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। আর ফোটা হলুদ হলে বুঝতে হবে ওই ফোটার জিনটি এই ক্যানসারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এটি সুস্থ ও আক্রান্ত উভয় কোষে সমানভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে অতি দ্রুত এক একটি চিপের সব ফোটার রংগুলোর তথ্য কম্পিউটার ডাটাবেইসে চলে যায়। এভাবে একই রোগীর ক্যানসার-অঙ্গের নানা টিশ্যুর কোষ থেকে আরএনএ নিয়ে, অন্য অনেক রোগীর দেহ থেকেও তাই করে, তা প্রাসঙ্গিক জিন-চিপের ওপর প্রয়োগ করে প্রচুর তথ্য এভাবে ডাটাবেইসে যেতে পারে। তার সব তুলনা করে, বিশ্লেষণ করে, দায়ী জিনগুলোকে উদ্ঘাটন করতে পারে বায়ো-ইনফরম্যাটিক্স।

এর আগে আমরা দেখেছি জিন-প্রকাশ নিয়ন্ত্রণের যে জটিল প্রক্রিয়া রয়েছে তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিবেশেরও ভূমিকা থাকে । জিন-প্রকাশের যে সব তথ্য বায়ো-ইনফরম্যাটিক্সের ডাটাবেইসে আসে তা যে সব জীবের কোষ থেকে নেয়া হয় সেই জীবগুলো বা কোষগুলো বিভিন্ন রকম

প্রাসঙ্গিক পরিবেশের মধ্যে সে সময় থাকতে পারে– যেমন বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে থাকা, বিভিন্ন পুষ্টি অবস্থায় থাকা, বিভিন্ন উত্তাপে থাকা ইত্যাদি। ডাটাবেইসের তথ্যের কোন্‌গুলো এরকম কীরকম পরিবেশে থাকা কোষ থেকে আসছে তার খতিয়ানও রাখা হয় একই সঙ্গে ওই ডাটাবেইসে। জিন-চিপ থেকে আসা তথ্যেও এটি করা হয়। এগুলো বিশ্লেষণে বায়ো-ইনফরম্যাটিক্স বলে দিতে পারে কোন পরিবেশের পরিবর্তনে জিন-প্রকাশের কোন তারতম্য হচ্ছে কিনা।

মানব জেনোমে তথাকথিত অকেজো ডিএনএ

মানুষের পুরো জেনোম উদ্ঘাটনের পর তার ৯৭% কেই অকেজো ডিএনএ হিসেবে পেতে আমরা দেখেছি; এগুলো কোন জিন তৈরি করে না, মানুষের কোন বৈশিষ্ট তাই এদের কারণে ঘটেনা। কিন্তু এও ঠিক যে এই সিংহভাগ ডিএনএকে বাদ দিয়ে মানুষের জেনোমের কথা বলা যায়না। এর কারণ সব অর্থে এগুলো কিন্তু অকেজো নয়, বরং এর কোন কোন অংশ আমাদের সম্পর্কে অনেক জরুরী তথ্য দিয়ে থাকে। তাছাড়া এর সম্পর্কে সব কিছু জানা গেছে এ কথা এখনো বলা যাচ্ছেনা। যা জানা গেছে তার থেকে এই তথাকথিত অকেজো ডিএনএ'র কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা বলা যায়।

বার্তাবহ আরএনএ (mRNA) সরাসরি কোডিং কাজে যুক্ত হলেও অন্য কিছু আরএনএ আছে যা সেভাবে যুক্ত নয়। যেমন প্রোটিন তৈরির সময় যে ট্রান্সফার আরএনএ (tRNA) বিভিন্ন এমাইনো এসিডকে ধরে এনে এমাইনো এসিডের শেকল তৈরি করতে সাহায্য করে। একে তৈরি করে জেনোমের যেই অংশ তাকেও ওই 'অকেজোর' দলে ফেলা হয়। কোডিং না করলেও এটি যে প্রোটিন তৈরিতে অর্থাৎ কোডিং কার্যকর করাতে অকেজো নয় তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

আরো কিছু ডিএনএ অংশ জেনোমের নানা জায়গায় আছে যার এক একটিকে বলা হয় সিয়োডোজিন অর্থাৎ নকল জিন। এগুলো আসল জিনেরই হুবহু প্রতিলিপি, তবে জিনের মত কার্যকর নয়। বিবর্তনের মধ্যে অতীত নানা

সময়ে জিনের এরকম প্রতিলিপি হয়ে ডিএনএ বৃদ্ধি এক রকম স্বাভাবিক ঘটনা ছিল– মনে করা হয় এগুলো বিবর্তনের জন্য নতুন নতুন ডিএনএ তৈরির মশলা হিসেবে কাজ করেছে। বহু রকম রূপে এগুলো দেখা দিয়েছে, যার কোন কোনটি আমাদের জন্য রোগ সৃষ্টিরও কারণ হয়েছে। যেমন মানুষের সেখানে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম সেখানে ২১তম ক্রোমোজোম জোড়ার একটি সদস্যের প্রতিলিপি হয়ে জোড়াতে দুটির বদলে তিনটি সদস্য হয়ে পড়ে। এরকম ক্রোমোজোম নিয়ে যে শিশু জন্মে তার মধ্যে ডাউন সিনড্রোম নামে রোগ দেখা দেয় (মোঙ্গল হওয়াও বলে একে)। আবার কোন জিনের বিশেষ কোন মিউট্যাশনে সেটি নিজের অনেকগুলো প্রতিলিপি করে যেগুলো অকেজো হয়ে সিয়োডোজিনে পরিণত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এখন যেগুলো সিয়োডোজিন তার অনেকগুলোই অতীতে আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে কাজের জিন ছিল। উদাহরণ স্বরূপ সূক্ষ্ম ভাবে গন্ধ নেবার ক্ষমতা সৃষ্টিকারী একদল জিন আমাদের পূর্বসূরি প্রাণীদের মধ্যে ছিল, আমাদের মধ্যে যার ৬০% সিয়োডোজিনে পরিণত হয়েছে। সেজন্য মানুষের গন্ধ নেবার ক্ষমতা ইঁদুর, কুকুর ইত্যাদি বহু প্রাণীর চেয়ে অনেক কম।

অকেজো নামে পরিচিত ডিএনএ'র মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে জিন-প্রকাশ নিয়ন্ত্রণকারী ডিএনএ– যার মধ্যে প্রমোটার, এনহেন্সার ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। অনুসন্ধানে বোঝা গেছে এই নিয়ন্ত্রণকারী বেইস-ক্রমগুলো পুরো জেনোমের অন্তত ৮%, কোন কোন গবেষক এটি ৪০% পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করেন।

এক রকমের অকেজো ডিএনএ প্রচুর রয়েছে যেগুলোর ভাবসাব বেশ মজার, আবার আমরা এদেরকে চমকপ্রদ সব ব্যবহারেও লাগাতে পেরেছি। এদের মধ্যে যেন বেশ একটু খামখেয়ালিপনা রয়েছে– এর অংশ বিশেষে একই কিছু বেইস বার বার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলে। এই পুনরাবৃত্ত অংশ মাত্র কয়েকটা বেইসে গড়া হতে পারে, আবার বেশ দীর্ঘ বেইস-সারিও হতে পারে। আশ্চর্যজনক ভাবে এই অংশটিই ডিএনএ'র নানা জায়গায় কোথাও পাঁচ-দশবার, আবার কোথাও আরো অনেক বেশিবার– শতবার, হাজার বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। এ যেন ডিএনএ'র এক ধরনের তোতলানো অভ্যাস–

তোতলানো মানুষ যেমন একই শব্দাংশ বার বার ধ্বনিত করে- তাই এর ডাক নাম তোতলানো ডিএনএ। পুনরাবৃত্তির সংখ্যা বিভিন্ন রকম বলে একে ভেরিয়েবল নাম্বার অব টেন্ডেম রিপীট (ভিএনটিআর) বলা হয় অর্থাৎ পর পর থাকা বেইস সারির (টেন্ডেম) পুনরাবৃত্তির সংখ্যা-বৈচিত্র। উদাহরণ স্বরূপ GATA এরকম একটি টেন্ডেম যাতে GA ও TA এই দুটি বেইস-সারি টেন্ডেমে অর্থাৎ পর পর রয়েছে। এটি পাঁচবার পুনরাবৃত্ত হলে ভিএনটিআর হবে GATAGATAGATAGATAGATA, আর তিনবার পুনরাবৃত্ত হয়ে তা হবে GATAGATAGATA। বেইস-সারি অথবা টেন্ডেম খুব দীর্ঘ হলে এর বিশেষ ছোট অংশ দেখে পুরো ভিএনটিআর'কে সনাক্ত করা যায়। কোন দুজন মানুষের মধ্যে এরকম নানা ভিএনটিআর এর পুনরাবৃত্তি সংখ্যা কখনো এক রকম হয়না বলে জেনোমের শুধু এই প্রাসঙ্গিক অংশ থেকেই দেখা যাওয়ার মত প্যাটার্ন তৈরি করলে তাতে পুনরাবৃত্তির সংখ্যা অনুযায়ী এক এক জনের জন্য এক এক রকম প্যাটার্ন হয় এবং তা দেখে ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়। এজন্য এই কাজটিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। এভাবে ডিএনএ দিয়ে ব্যক্তিকে নিখুঁত ভাবে সনাক্ত করতে পারায় বহু রকমের সুযোগ খুলে গেছে। এর মধ্যে একটি হলো অপরাধী নির্ণয়– যা সাধারণত অপরাধ স্থলে পাওয়া সামান্য চুল, রক্ত ইত্যাদি থেকে পাওয়া ডিএনএ'র সঙ্গে সন্দেহভাজন ব্যক্তির ডিএনএ'র ভিএনটিআর এর সাদৃশ্য দেখে করা হয়।

ভিএনটিআর সৃষ্টি হয় নানা জায়গায় থাকা ডিএনএর অনুরূপ কিছু অংশ ইতস্তত নিজেদের মধ্যে অদল বদল ও পুনরাবৃত্তি হওয়ার মাধ্যমে। এটি হতে গিয়ে ক্রমান্বয়ে কিছু কিছু ভুল জমে জমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভিএনটিআর এর পুনরাবৃত্তি হারে পরিবর্তন ঘটে, যে কারণে এটি এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে ভিন্ন। তবে মাত্র এক প্রজন্ম পর বলে বাবা ও মায়ের সঙ্গে সন্তানের এই পার্থক্য খুবই নগণ্য। মোটা দাগে সন্তান এ সবের অর্ধেক বাবার থেকে এবং অর্ধেক মা'র থেকে পায়। তাই এর ভিত্তিতে ডিএনএ'র নানা টুকরার প্যাটার্নগুলো বাবা, মা, ও সন্তানের ক্ষেত্রে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে সন্তানের ক্ষেত্রে দাগগুলো অর্ধেকের মত বাবার সঙ্গে মিলবে অর্ধেক মা'র সঙ্গে মিলবে। মা'রগুলো বাদ দিয়ে শুধু বাবারগুলোর সঙ্গে

সন্তানেরগুলো মেলালে, যদি মিলে তা হলে এই জনই প্রকৃত বাবা, যদি না মেলে তবে তা নয়। পিতৃত্ব নির্ণয়ে এটিই সব চেয়ে নিখুঁত পদ্ধতি। অকেজো ডিএনএ'র এসব ব্যবহার আজকাল অহরহ হচ্ছে। পরে দেখবো আমাদের পূর্বপুরুষদের জানার ক্ষেত্রেও এই অকেজো ডিএনএ কী ভাবে কাজ করে।

আরো কিছু অকেজো ডিএনএ আছে যার আবার অন্য রকম খামখেয়ালিপনা রয়েছে। এগুলো মনে হয় জেনোমের মধ্যে এক জায়গা থেকে লাফ দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়; এ জন্য এদেরকে ট্রান্সপোজন বলা হয়। নতুন জায়গায় যদি কোন জিনের মধ্যে গিয়ে পড়ে তা হলে এটি সেই জিনে মিউট্যাশন ঘটাতে পারে, আবার আগে থাকা মিউট্যাশনকে নাকচও করে দিতে পারে। এভাবে এটি জিনের ওপর প্রভাবতো রাখতেই পারে, এমনকি ব্যাপকতর ভাবে কাজ করে একটি কোষের জেনেটিক পরিচয়ই বদলে দিতে পারে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এরকম এক গোষ্ঠি ট্রান্সপোজনকে বলা হয় এ এল ইউ। এগুলো স্বল্প দৈর্ঘের অকেজো ডিএনএ যা লক্ষ লক্ষ কপি হয়ে সারা জেনোম জুড়ে চলাফেরা করে। কার্যকর জিনের মধ্যে গিয়ে পড়লে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলো ওই জিনকে বিকল করে দিয়ে থাকে। এর বিকল করার ভঙ্গি অনেকটা রিট্রোভাইরাসের মত যেই ভাইরাস নিজের আরএনএ'র মাধ্যমে আক্রান্ত রোগীর জিনে নিজের সুবিধামত প্রোটিন তৈরির ডিএনএ জুড়ে দেয়– যেমন এইচআইভি এইডসের রিট্রোভাইরাস করে থাকে। কোষ বিভাজনের সময় ঘটা মাইটোসিসি প্রক্রিয়ায়, এবং ডিম্বকোষ বা শুক্রকোষ সৃষ্টির সময় ঘটা মেইয়োসিস প্রক্রিয়ায় এটি গুরুতর বিঘ্ন ঘটাতে পারে, এবং এভাবে ক্যানসার, হেমোফিলিয়া ইত্যাদি রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার অন্যদিকে একই রকম এ এল ইউ খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে বিবর্তনগত সম্পর্কগুলো এবং এর ধারাটি বুঝতে খুব সুবিধা হয়ে যায়– কারণ সহজে এগুলো বহু প্রজন্মান্তরেও পরিবর্তিত হয়না। এ জন্যই অনেকটা আমাদের মত এ এল ইউ বিভিন্ন এইপ ও বানরের মধ্যেও দেখা যায়।

এত সবের মধ্য দিয়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জেনোম পরিচয় শুধু জিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ওই তথাকথিত অকেজো অংশ, যা জিনের অধিকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে, তাও এ পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উদ্ঘাটিত কিছু মানব-জিন

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট দিয়ে যে কাজ শুরু হয়েছিলো, তারপর থেকে নানা দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। মানব জেনোমের বেইস-ক্রম এখন প্রায় সম্পূর্ণ পঠিত, সব জিন উদ্ঘাটিত, অনেক সংখ্যক জিনের কাজও বুঝে ফেলা গেছে, বাকিগুলোর ওপর চেষ্টা চলছে। যেগুলোর কাজ বোঝা গেছে সেরকম অনেকগুলো ক্ষেত্রেও তাদের তৈরি করা প্রোটিনের সব জৈবিক কার্যপ্রণালী স্পষ্ট উদ্ঘাটিত হয়নি– গবেষণা তাই অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে খুব জোরালো গবেষণা চলছে মানুষের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টের জিন-মিউট্যাশন, বিশেষ করে গুরুতর দৈহিক ও মানসিক অসুখের জন্য দায়ী জিন-মিউট্যাশনগুলো, চিহ্নিত করতে। এই অসুখের ব্যাপারগুলো সব চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে, কাজেই এর ক্ষেত্রেই সাফল্য এসেছে বেশি। অবশ্য এক একটি রোগের সম্পূর্ণ জেনেটিক ছবি পেতে আরো এগোতে হবে। সব সময় নতুন নতুন সাফল্যের খবর আসছে। জিনের বাইরে অকেজো ডিএনএ নিয়ে যে সাফল্য এসেছে তা নিয়েও বিজ্ঞানীরা বসে নেই। তাও মানব জেনোমের আরো পূর্ণাঙ্গ ছবি দেবার কাজে ক্রমেই বেশি বেশি সহায়ক হচ্ছে। মানব বৈশিষ্ট দানে তাদের ভূমিকা, অতীত থেকে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত বংশ-লতিকা নির্ণয়, ইত্যাদি যেসব কাজে এগুলো লাগে তা ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্ছে।

জিনের কাজ উদ্ঘাটন যেহেতু এখন সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তাই উদ্ঘাটিত কিছু কিছু জিনের কাজের পরিচয় এখানে আনা যায়। বলা বাহল্য প্রায় ২২ হাজার মানব জিনের মধ্যে, এবং কাজ বোঝা গেছে এমনও অনেক মানব জিনের মধ্যে এগুলো গুটিকতেক মাত্র, তবে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আমরা এখানে জিনগুলোকে দেয়া নাম ব্যবহার করবো, তাই জিনের নামকরণের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট বা যে অসুখের কিছু দায়িত্ব এই জিন অথবা জিন-মিউট্যাশনের ওপর দেয়া যায় তার আদ্যাক্ষর, এ জিনের তৈরি প্রোটিনের পরিচয়, যে জিনগোষ্ঠির এটি অংশ তার পরিচয়, এবং শ্রেণী বিভাজনে একে যেই ক্রমিক নম্বর দেয়া হয়েছে ইত্যাদিই ওই

নামের মধ্যে থাকে। অবশ্য নামকরণের ব্যাপারে যে খুবই নিয়মবদ্ধ কোন প্রণালী এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে তা বলা যাবেনা। দুধের ল্যাকটোজ হজম করতে পারা না পারার সঙ্গে সম্পর্কিত যে জিন তার নাম LCT– ওই ল্যাকটোজ শব্দটির কিছু অক্ষর দিয়ে। আবার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি জিন নিউরোপ্লাস্টিন নামের প্রোটিন তৈরি করে বলে তার নাম NPTN ওই নিউরোপ্লাস্টিন শব্দটির কয়েকটি অক্ষর থেকে। স্তন ক্যানসারের জন্য দায়ী দুটি জিন-মিউট্যাশনকে নাম দেয়া হয়েছে BRCA1 এবং BRCA2, ব্রেষ্ট ক্যানসার কথাটির কয়েকটি অক্ষর এবং জিন দুটির ক্রমিক নম্বর দিয়ে।

মানুষকে বিবর্তনগত ভাবে তার নিকটতম প্রাণীগুলোর থেকে আলাদা করেছে যে প্রধান ক'টি জিন তার একটি হলো FOXP2 নামের জিনটি। মনে করা হচ্ছে যে মানুষকে ভাষা দেয়ার ক্ষেত্রে এর বড় ভূমিকা রয়েছে। এর একটি প্রমাণ হলো এই জিনের কোন কোন মিউট্যাশন ওষ্ঠ, জিহ্বা, ও মুখের নড়াচড়াকে অসম্ভব করে মুখের কথায় দারুণ বাধা সৃষ্টি করে। ARHGAPnB নামের জিনটি মস্তিষ্কের কোর্টেক্স ও অন্যান্য অংশের অধিক জটিলতা সৃষ্টি করে মানুষের উন্নত মস্তিষ্ক সৃষ্টিতে অবদান রেখেছে বলে জানা যাচ্ছে। জিনটি অবশ্য মানুষের একচেটিয়া নয় ঈষ্টের মত অতি সরল জীব থেকে শুরু করে ইঁদুরের মত স্তন্যপায়ী প্রাণীতেও এর কোন না কোন আদি রূপ রয়েছে। তবে বিবর্তনের মানব-ধারা যখন এইপ-ধারা থেকে পৃথক হয় তার কিছু পর উভয় ধারার সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া এই জিন মানুষের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়ে এক অনন্য রূপ নিয়েছে। এটি তার মস্তিষ্ককে অনন্য করেছে। মানুষের জেনোম থেকে নিয়ে এই জিনটি ইঁদুরের মধ্যে সংযোজন করে দেখা গেছে ইঁদুরের কোর্টেক্সে ভাঁজের পরিমাণ কিছুটা বেড়ে গেছে। মানুষের কোর্টেক্সে ব্যতিক্রমী রকম ভাঁজ সৃষ্টিই তার কোর্টেক্সের জমিন অনেক বড় করতে পেরেছে। আরো বেশ কিছু জিনের সহায়তায় এমন কোর্টেক্স মানুষকে উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দিয়েছে। এই জিনগুলোর অভাবে ইঁদুরের কোর্টেক্সের ওই নতুন ভাঁজ কাজে লাগেনি।

OT নামে পরিচিত জিনটির রয়েছে এক চমকপ্রদ বৈশিষ্ট সৃষ্টির ক্ষমতা। এটি হলো ঘনিষ্ঠ স্পর্শ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলা। দেখা গেছে মা

শিশু-সন্তানকে কোলে জড়িয়ে নেয়ার, প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরার, শিশু বড় লোমশ পোষা বেড়ালকে কিংবা তুলতুলে পুতুলকে গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে রাখার এই সব প্রেরণার অন্তত কিছুটা আসে এই জিনটি থেকে। অন্যের উপকার করার জন্য নিজের ত্যাগ স্বীকারেরও একটি জিন মানুষের আছে– এর নাম AVPR1a, যাকে অনেকে 'পরোপকারের জিন' নামেই চেনে। এই জিন মানুষকে সমাজ-হিতৈষী করে তোলে, অন্যদের সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু অবাক কাণ্ড হলো এই জিনের ছোট একটি মিউট্যাশন মানুষকে বেপরোয়া আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমাদের সঙ্গে বিবর্তনের নিকট সম্পর্ক থাকা প্রাণীগুলো সহ অন্যান্য প্রাণীদের অনেকগুলোই রঙীন দৃশ্য ভাল অনুধাবন করতে পারেনা। মানুষের মধ্যে রঙীন জিনিস অনুধাবনের ভাল ক্ষমতা এনে দিয়েছে OPN1LW নামের জিন। দেখা গেছে একদিকে এই জিনটি যখন মানুষের জেনোমে বিকশিত হয়েছে একই সময়ে গন্ধের সূক্ষ্ম তারতম্য অনুধাবনের কিছু জিন যা পূর্বসূরিদের মধ্যে ছিল তা মানুষের মধ্যে এসে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। জেনেটিক দিক থেকে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত আজকের প্রাণীদের মধ্যে গন্ধের ওই কার্যকর জিনগুলো দেখে আন্দাজ করতে পারছি যে ওদের আর আমাদের সাধারণ পূর্বসূরিদের ক্ষেত্রে এগুলো ছিল। খুব সম্ভব তাদের ক্ষেত্রে গন্ধের অনুধাবন পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে যে বিস্তারিত ধারণা দিতো, মানুষের ক্ষেত্রে রঙীন দৃশ্য অনুধাবন ক্ষমতা একই রকম ধারণা দিতে পারছে বলেই সূক্ষ্ম গন্ধ নেবার জিন অকার্যকর হয়ে গেছে। কোন কোন মানুষের মধ্যে অবশ্য OPN1LW একটু মিউট্যাশন হওয়া অবস্থায় এসেছে তাই তারা লাল আর সবুজের পার্থক্য বুঝতে পারেনা– এটিই রং-কানা হবার সবচেয়ে বড় লক্ষণ।

জন্মগত জিন-বৈশিষ্ট অধিক বা কম বুদ্ধিমত্তার কারণ হতে পারে কিনা, হলে তা কী পরিমাণে হয়– এই বিষয়টি বহুদিন ধরে বিতর্কের বিষয়। বুদ্ধিমত্তার জিন বলে সরাসরি সে রকম কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে NPTN নামের জিনটির প্রকাশ- বৈষম্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষায় সাফল্যের বৈষম্যের কিছুটা সম্পর্ক দেখা গেছে, যা অন্য দু'একটি জিনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এতে

মনে হচ্ছে NPTN নিউরোপ্লাষ্টিন নামের যে প্রোটিন তৈরি করে তা কোন ভাবে হয়তো বুদ্ধিমত্তার সহায়ক। অন্যদিকে PHF8 নামের একটি জিন PHD ফিঙ্গার-প্রোটিন নামের যে প্রোটিন তৈরি করে তার সঙ্গে বুদ্ধিতে পিছিয়ে থাকার কিছু সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে।

আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়াগুলোর সংগঠনে যে সব জিনের হাত আছে তারও বেশ কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন মানুষের মধ্যে রক্তের A, B, AB, O এসব শ্রেণী বিভাজন আছে যার ফলে সবার রক্ত সবাই নিতে পারেনা। এই বিভাজনটির মূলে রয়েছে গ্লাইকোসিন ট্রান্সফারেজ নামের একটি এনজাইম, (প্রোটিন) যা ABO নামের একটি জিনের নির্দেশে তৈরি হয়। আর একটি প্রক্রিয়া শরীরে চর্বি জমাবার ব্যাপারটি দেখা যাক। মানুষ যখন দীর্ঘদিন ভাল পুষ্টি পায়না তখন নিজের দেহে জমে থাকা চর্বির ওপর পুষ্টির জন্য নির্ভর করে। স্বাভাবিক অবস্থায় বাড়তি চর্বিটি শরীরে জমা করার এবং তা প্রয়োজনে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করে দেয় যেই জিন তার নাম FIT2। এই জিনটির কারণেই মানুষ বেশ কিছুদিন দুর্ভিক্ষাবস্থায়ও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু বর্তমানে অনেকের জন্য এই জিন বাঁচার বিপক্ষে কাজ করছে অধিক পুষ্টিতে চর্বি জমিয়ে স্থূলতা জনিত নানা রোগ সৃষ্টি করে। অবশ্য স্থূলতা সৃষ্টিতে আরো বেশি সাহায্য করে অন্য একটি জিন LPT, যা লেপটিন নামের প্রোটিন সৃষ্টি করে অব্যবহৃত খাদ্যকে চর্বিতে পরিণত করাকে বিশেষ ভাবে উস্‌কিয়ে দেয়।

আগেই দেখেছি অসুখের জিনগুলো চিহ্নিত করাটিই বিজ্ঞানীদের প্রথম অগ্রাধিকার, আর বেশ কিছু ক্ষেত্রে তা চিহ্নিত করাও হয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ বড় ও ব্যাপক অসুখগুলো একাধিক জিনের সৃষ্টি হওয়াতে চিহ্নিত করার কাজটিতে সময় লাগছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম অসুখের অন্তত প্রধান জিন-মিউট্যাশনগুলো আবিষ্কার করতে পারা বিরাট সাফল্যই বটে। একই কথা অসুখ-প্রতিরোধী জিন আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও খাটে। CCRS নামের একটি জিন নানা রকম প্রদাহের প্রতিরোধের কাজটি করে থাকে। তেমনি RB1 নামক জিনটিকে বলা হয় টিউমার প্রতিরোধী জিন। শরীরে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন ঘটলে টিউমার হয়ে ক্যানসারের সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু সেটি সৃষ্টির আগে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে বাড়া কোষগুলোকে সীমাবদ্ধ জায়গায় রেখে দিয়ে ওখানেই ধ্বংস করে দিতে পারলে তা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়না। RB1 এই কাজটিতেই সহায়তা দেয়। ২০০৮ সালে একটি খুবই উপকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যা দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অনেক বাড়িয়ে দিতে পারছে। দেখা গেছে CD28 নামক জিনের তৈরি একটি প্রোটিন এই ওষুধটির লক্ষ্যবস্তু হয়। বাইরের কোন আগন্তক এজেন্ট শরীরের কিছুকে লক্ষ্যবস্তু করলে সেটি 'এন্টিজেন' হিসেবে কাজ করে ওখানে অনেক প্রতিরোধী 'এন্টিবডির' সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বংশগত দিকটি যে সব অসুখে বেশি উচ্চকিত তার মধ্যেই জিন খুঁজে নিতে প্রথম সাফল্য এসেছিলো সিষ্টিক ফাইব্রোসিস রোগের। একটি জিনই দায়ী হওয়াতে এটি অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া গিয়েছে CFTR নামের জিনের মধ্যে। দেখা গেছে এই জিনের যেই মিউট্যাশন এ জিনটির প্রকাশকে খুব দুর্বল করে দেয় সেটিই রোগটির জন্য দায়ী। জিন-চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এটি অগ্রপথিকের কাজ করেছে– মিউট্যাশন হওয়া এই জিনযুক্ত কোষকে রোগীর দেহ থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে এনে তাকে সুস্থ জিনযুক্ত কোষ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে এই জিন-চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে। বহু জিনের দ্বারা সৃষ্ট অসুখের জিনগুলোও এখন ধরা পড়তে আরম্ভ করেছে, যদিও এটি অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ। এই ক্ষেত্রে অসুখের বংশগত দিক ছাড়াও পরিবেশ, জীবন-অভ্যাস ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই শেষোক্ত জিনিসগুলো কতখানি প্রভাব রাখবে তাও নির্ভর করে জিনের ওপর। জিনগুলো খুঁজে পাওয়া তাই জরুরী। স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে যে দুটি জিন-মিউট্যাশন সেই BRC1 এবং BRC2 এর আবিষ্কার ছিল সাম্প্রতিক কালের একটি বিরাট সাফল্য। ডায়াবেটিস টাইপ টু সৃষ্টি হয় রোগীর অগ্ন্যাশয় যখন প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তখন। আবিষ্কৃত হয়েছে যে INS নামক জিনের মিউট্যাশন এর জন্য দায়ী। ওই জিনটি স্বাভাবিক থাকলে তবেই ইনসুলিন তৈরি হয়। একই ভাবে NPPB নামের জিনের সঙ্গে হৃদরোগের এবং APP নামক জিনের সঙ্গে বৃদ্ধ বয়সে স্মৃতি-ভ্রষ্টতার আলজাইমার রোগের সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে। লিউকোমিয়া বা রক্তের

ক্যানসার ঘটে প্রধানত রক্তের শ্বেত কণিকার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির কারণে। রক্তকণা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিতে দেখা গেছে LCK নামের জিনটিকে; তার মিউট্যাশন রক্তের ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকগুলো অসুখ বা অস্বাভাবিকতা মারাত্মক না হলেও এর জিন উদ্ঘাটন কিছু বিষয়ে বেশ শিক্ষণীয় হয়েছে। দুনিয়ার বিপুল সংখ্যক মানুষ বয়স্ক হবার পর আর দুধ হজম করতে পারেনা। দুধের চিনি যেই ল্যাকটোজ তা সহ্য করতে না পারার কারণেই এটি ঘটে, সে জন্য একে বলা হয় ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। এই অক্ষমতাটি পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যেই অনেকের আছে– তবে কোন কোন জনগোষ্ঠিতে এর হার অন্যগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। মানুষ ছাড়া অন্যান্য স্তন্যপায়ীরা শৈশবের পর সাধারণত দুধ আর খায়না। তাই বড় হয়ে দুধ হজমের জিন মানুষের আগে বিবর্তিত হয়নি। কিন্তু কৃষির এবং প্রাণী পোষ মানানোর সূচনা হওয়ার পর এক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে বয়স্ক হয়েও দুধের ল্যাকটোজ হজম করার জিনটি বিবর্তিত হয়। ল্যাকটেজ নামক এনজাইম এটি সম্ভব করে। এই ল্যাকটেজ তৈরির জিন LCT তাই এর জন্য অপরিহার্য। কিন্তু কোন কোন মানুষে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাকটেজের অভাবে ল্যাকটোজ হজম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এখন আবিষ্কৃত হয়েছে যে LCT জিন স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত না হওয়ার কারণেই এটি ঘটে। আর এই প্রকাশকে বাধা দিচ্ছে জেনোমে LCT জিন থেকে কিছুটা দূরে থাকা MCM6 নামের অন্য একটি জিনের ছয়টি বিভিন্ন মিউট্যাশন, যার প্রত্যেকটি একটি মাত্র বেইসের পরিবর্তনে ঘটে। MCM6 জিনটি এক্ষেত্রে LCT প্রকাশের এনহেন্সার হিসেবে কাজ করে। মিউট্যাশনের ফলে এনহেন্সার অকার্যকর হলে LCT জিনের প্রকাশ হ্রাস পায়।

মানুষে মানুষে জিনের পার্থক্য

কোন বিশেষ অসুখের প্রবণতা বাড়ানো জিন মিউট্যাশনের কথা যদি বলি, দুধ হজম করার কথা যদি বলি, আর চেহারায় ও হাবেভাবে নানা মানুষের এত বৈচিত্রের কথা যদি বলি, তা হলে মানুষের মানুষে জিনের যথেষ্ট পার্থক্য আছে বলেই মনে হবে। কিন্তু আগাগোড়া জেনেটিক গড়নের নিরিখে মানুষে মানুষে

জিনের পার্থক্য খুব কম– অন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে জিন-বৈচিত্রের চেয়ে এটি কম। এর একটি কারণ প্রজাতি হিসেবে হোমো সেপিয়েন্স মানুষের (আমাদের নিজেদের প্রজাতি) বয়স বড় জোর দু'লক্ষ বছর; বিবর্তনের হিসেবে খুব তরুণ প্রজাতি আমরা। আমাদের নানা জনের মধ্যে একেবারে আদিমতম হোমো সেপিয়েন্সের জিনগুলো যার যার মত বেশি পরিবর্তন হবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি। অতীতে আফ্রিকায় উদ্ভূত হয়ে সেপিয়েন্সরা দীর্ঘকাল আফ্রিকাতেই ছিল। প্রায় ৭০ হাজার বছর আগে থেকে কিছুদিনের মধ্যে অল্প কিছু মানুষ ওখান থেকে অন্যান্য মহাদেশে গেছে। আফ্রিকার বাইরের আজকের সব মানুষ ওই অল্প সংখ্যক মানুষের বংশধর বলে তাদের তখনকার জিনগুলো সবাই প্রায় একই ভাবে ধরে রেখেছে। এ কারণে জেনোম পরীক্ষায় দেখা গেছে আফ্রিকার বাইরের মানুষের জেনেটিক বৈচিত্র খুব কম, আফ্রিকায় কিছু বেশি। কিন্তু সাধারণ ভাবেও মানুষের মধ্যে জিনের পার্থক্য কম– তাই সব মানুষের নানা বৈশিষ্টের মৌলিক সাদৃশ্য অবাক হবার মত। একেবারে অতীত থেকেই মানুষের বিশ্বময় অভিবাসনের অভ্যাস এবং নানা স্থানের মানুষের যৌন সংমিশ্রণ বেশি হবার ফলে মানুষের মধ্যে জিন বিনিময়ের হার অনেক বেশি। তাই মানুষ একে অন্যের থেকে খুব ভিন্ন কখনো হতে পারেনি।

মানব জেনোম প্রকল্প ও তার পর পর যে প্রচুর গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে তাতে মানুষে মানুষে জিন পার্থক্যের একটি পরিমাপ পাওয়া গেছে– সেটি জেনোমের ০.১% এর মত। অর্থাৎ গড়পড়তা যে কোন দু'জন মানুষের জেনেটিক মিল ৯৯.৯% এর বেশি। ফলে মানব জেনোম প্রকল্পে সকল জিন এবং জেনোমের অন্য সব অংশ উদ্ঘাটনের জন্য যদি চোখ বন্ধ করে দুনিয়ার যে কোন জায়গার যে কোন গোষ্ঠির যে কোন একজন মানুষের ডিএনএ নিয়ে কাজটি করা হতো তা হলে ফলাফল একই হতো, প্রকল্প থেকে মানুষের জেনেটিক গঠনের যা জানা গেছে তা অপরিবর্তিত থাকতো। এর মানে অল্পস্বল্প বৈচিত্রের কথা বাদ দিলে দুনিয়ার যে কোন মানুষ অন্তত জেনেটিক দিক থেকে পুরো মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তবে প্রকল্পটির রূপকাররা ওই ০.১% অল্পস্বল্প বৈচিত্রকে মোটেই অবহেলা করেননি।

প্রতিনিধিত্বে এইটুকু ঘাটতিও যেন না হয় তাই তাঁরা কোন একজন মানুষের ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করেননি, বরং এই কাজের জন্য ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের বহু মানুষের জেনোমের নানা অংশ জোড়া দিয়ে একটি মিশ্র জেনোম গড়ে তোলা হয়েছে, যাকে বলা হয়েছে হিউম্যান রেফারেন্স জেনোম। মিশ্রণটি আরো প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য এতে প্রত্যেক অংশে যে ক্রোমোজোম-জোড়া ছিল তার থেকে ইতস্তত শুধু একটিই ব্যবহার করা হয়েছে। একে কি আদর্শ মানব জেনোম বলা যায়? নাকি নিখুঁত মানব জেনোম বলা যায়? কোনটিই বলা ঠিক হবেনা, বলা চলে বড় জোর একটি ভাল গড়পড়তা মানব জেনোম।

মূল মানব জেনোম প্রকল্প শেষ হবার কিছু আগে থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানী ক্র্যাইগ ভেন্টারের উদ্যোগে স্থাপিত বেসরকারী কোম্পানী সেলেরা সরকারী প্রকল্পের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েই একই কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে। এক্ষেত্রে কিন্তু ওই মিশ্র রেফারেন্স জেনোমের বদলে একজন মাত্র মানুষের সম্পূর্ণ জেনোম ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেক বার মানব জেনোমের পাঠোদ্ধারে। আর সেই জেনোমে ক্রোমোজোম-জোড়াগুলো পুরোই ব্যবহার করা হয়েছে– একটি ক্রোমোজোম নয়; অর্থাৎ ওই মানুষটির একেবারেই সম্পূর্ণ জেনোম। মূল মানব জেনোম প্রকল্পে যদিও ধরে নেয়া হয়েছে ক্রোমোজোম-জোড়ার দুই ক্রোমোজোমের মধ্যে ডিএনএতে গড়পড়তা কোন পার্থক্য নেই, ভেন্টার দেখিয়েছেন যে ক্রোমোজোমের দুই কপিতে কিছু প্রভেদ রয়েছে বৈ কি, তাই শুধু এক কপি নিয়ে কাজ করলে সব কিছু ধরা পড়েনা। এক্ষেত্রেও জেনোমের সকল তথ্য এক জন বিশেষ মানুষের সম্পূর্ণ জেনোম হিসেবে বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো প্রথম যার জেনোম এভাবে উদ্ঘাটন করা হয়েছে তা ছিলো স্বয়ং ভেন্টারের। কাজেই প্রধান গবেষক নিজেই নিজের ডিএনএ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এগিয়ে এসেছেন। এরপর ডিএনএ'র গঠনের অন্যতম আবিষ্কারক হিসেবে খ্যাতিমান জেমস ওয়াটসনও নিজের জেনোমকে উদ্ঘাটিত ও প্রকাশিত হতে দিয়েছেন। পরে অবশ্য আরো বহু মানুষের ব্যক্তিগত জেনোম উদ্ঘাটন করা হয়েছে এবং শিগ্‌গির সে সংখ্যা হাজারে গড়িয়েছে– তাতে

নানা মানব গোষ্ঠির সদস্যও ছিল। সেখান থেকে মানুষে মানুষে সম্পূর্ণ জিন-বৈচিত্রটি বোঝা গেছে। কোন কোন গবেষণায় অবশ্য এই বৈচিত্র ০.১% এর কিছু বেশি এসেছে, যেমন ভেন্টারের গবেষণায়।

মানুষে মানুষে জিনের প্রভেদগুলো কী ভাবে আসে? এগুলো আসে প্রধানত জিনের মিউট্যাশনের প্রভেদের ফলে– যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে জিনের একটি মাত্র বেইস এদিক ওদিক হবার ফলে। অবশ্য ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় প্রভেদ ও থাকতে পারে। এরকম সব মিউট্যাশনই যে বাস্তবক্ষেত্রে বৈশিষ্ট পরিবর্তন করে তা নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে করে। যেমন চোখের রঙের জিনের নানা মিউট্যাশন নানা মানুষের মধ্যে কালো, পিঙ্গল, নীল, সবুজ ইত্যাদি নানা রঙের চোখের মণি সৃষ্টি করে। জিন এভাবে যথেষ্ট বৈচিত্র সৃষ্টি করে। জিনের বাইরে অকেজো ডিএনএ থেকেও জেনোমে বেশ কিছু বৈচিত্র সৃষ্টি হয়। তবে বাস্তব বৈশিষ্টে এই বৈচিত্র তেমন প্রতিফলিত হয়না। জিন পর্যায়ের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়েও কিছু বৈচিত্র আসে। যেমন ক্রোমোজোমের কিছু ব্যতিক্রমী বৈচিত্র ডাউন সিন্‌ড্রোম, টার্নার সিন্‌ড্রোম, কোন কোন ক্যানসার ইত্যাদির কারণ হয়। নানা জেনোমে জিন মিউট্যাশন কীরকম বিভিন্ন ভাবে আছে তা চট্ করে জানার জন্য আজকাল সর্বাধুনিক ওই মাইক্রো অ্যারে বা জিন-চিপ ব্যবহার করা হয়। এ জন্য কাচের চিপে সারিবদ্ধ হাজার ক্ষুদ্র ফোটার প্রত্যেকটিতে সম্ভাব্য নানা জিন-মিউট্যাশন রাখা থাকে। দ্রুত স্বয়ংক্রিয় ভাবে দেখা হয় কোন্ জেনোমের থেকে নেয়া আরএনএ টোপ্ কোন্ মিউট্যাশনের সঙ্গে আবদ্ধ হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো দেখা যাবে প্রায় সবই এক অথবা সদৃশ মিউট্যাশনেই আবদ্ধ হচ্ছে– মানুষের জিন-বৈচিত্র কম বলেই এমন হয়।

যতই এভাবে নানা গোষ্ঠির বেশি বেশি মানুষের ব্যক্তিগত জেনোম উদ্ঘাটন করা হয়েছে, ততই দেখা গেছে সাধারণ ভাবে যে কোন মানুষের সঙ্গে অন্যের যেটুকু জিন-অমিল দেখা যায় বিভিন্ন গোষ্ঠির মধ্যে তার চেয়ে বেশি দেখা যায়না। বোঝা যাচ্ছে যে মানুষে মানুষে জিন-পার্থক্যটি অনেকটাই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে, এক গোষ্ঠি থেকে অন্য গোষ্ঠিতে গেলে পার্থক্য কোন বড় লাফ দেয়না। একই গোষ্ঠির সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে পার্থক্য লক্ষ্য করে

দেখা গেছে যে ওই যে মানুষে মানুষে জিন পার্থক্য তার ৮৫% ভাগ এখানে গোষ্ঠির ভেতরেই দেখা যায়। অন্য গোষ্ঠির সদস্যদের সাথে তুলনা করলে তাতে বাড়ে মাত্র আর ১৫%। কাজেই যে দেশে সবাই এক জাতিগোষ্ঠির মানুষ সেখানকার গড় জিন-পার্থক্য, বহু জাতিগোষ্ঠির দেশের (যেমন যুক্তরাষ্ট্রের) এ পার্থক্যের খুব কাছাকাছি। অ্যাংলো স্যাক্সন, আফ্রিকান আমেরিকান, আদিবাসী আমেরিকান, বা ল্যাটিনোর মত আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জাতিসত্ত্বা ওদেশে থাকলেও ব্যাপারটি একই হয়। এর অর্থ হলো খুবই অল্প কিছু প্রবণতায় বেশকম থাকলেও কোন গূঢ় মৌলিক অর্থে জাতিসত্ত্বাগুলোর পৃথক অস্থিত্ব নেই। বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি ইত্যাদি বিভাজনের জেনেটিক কোন যুক্তি নেই। এগুলো সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত বাহ্যিক শারীরিক গঠন ও চেহারার কিছু পার্থক্য এবং কালচার-পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে। অতীতে বিভিন্ন রকম চেহারার ও কালচারের মানুষের মধ্যে জন্মগত ভাবে বড়-ছোট বৈষম্য দেখানোর চেষ্টা হয়েছে, এখনো যে হচ্ছেনা তা বলা যাবেনা। সবার জেনোম উদ্ঘাটন এমন দাবীকে চূড়ান্তভাবে অসার প্রমাণ করেছে। তবে অতীতের বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলের মানুষ যারা সেখানে মানব ইতিহাসের একই অধ্যায়ে পরস্পর কাছাকাছি ছিল তাদের মধ্যে কোন কোন বিশেষ মিউট্যাশন বা জেনেটিক মার্কার বংশগত ভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং তাদের মধ্যেই অনন্য ভাবে থাকতে পারে। ফলে এই মানব গোষ্ঠিগুলোকে ওই জেনেটিক মার্কার দিয়ে আলাদা ভাবে চেনা এবং তাদের পূর্বপুরুষ কারা তা আন্দাজ করা সম্ভব। ওই মার্কারযুক্ত মানুষ অতীতে অন্যত্র অভিবাসী হয়ে থাকলে তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের জিন মিশ্রণে সেটি স্থানীয়দের মধ্যেও যেতে পারে বলে শুধু ওই মার্কার অনুসরণ করেই অভিবাসন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার মানুষের মধ্যে জিন মিশ্রণের খবরও পাওয়া যায়; তা এক একজন বিশেষ মানুষের বংশ পরিচয় পেতেও সহায়ক হয়।

যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতীতের একটি মাত্র জিন মিউট্যাশনের ফলে বাইরে থেকে স্পষ্ট দৃশ্যমান কোন বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে সেখানে ওই বৈশিষ্টই জেনোম বিশ্লেষণ ছাড়াই বংশ পরিচয়ের খানিকটা দিয়ে দিতে পারে। এমন একটি

উদাহরণ অতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনোম গবেষণায় ধরা পড়েছে যে ছয় থেকে দশ হাজার বছর আগের একজন মানুষের মধ্যে একটি মাত্র মিউট্যাশন সৃষ্টির ফলে নীল চোখের উদ্ভব হয়েছিলো। মিউট্যাশনটি একেবারেই অনন্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু শুধু ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যেই নীল চোখের ছড়াছড়ি দেখা যায়, বোঝা গেছে যে ওই মানুষটি ইউরোপীয় ছিল। এই আবিষ্কারের আগে অনেক দিন থেকেই গবেষকরা নীল চোখের জন্য দায়ী মিউট্যাশনটি খুঁজছিলেন OcA2 নামের জিনে, যেই জিন ইউরোপে সাধারণ ভাবে পাওয়া পিঙ্গল চোখের রঙ-বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করে ওখানে নীল চোখের জন্য কোন মিউট্যাশনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলনা। অবশেষে এই সাম্প্রতিক আবিষ্কারে দেখা গেছে যে মিউট্যাশন OcA2 তে নয়, বরং রয়েছে অন্য একটি জিন HERc2তে যা সাইলেন্সার হিসেবে কাজ করে OcA2 জিনের কাজকে কিছুটা অবদমিত করে। ওই মিউট্যাশন হওয়া HERc2 পিঙ্গল বর্ণের জিনকে এত বেশি অবদমিত করে যে ওই পিঙ্গল আর দেখাই যায়না, তার পটভূমিতে যে নীল আছে সেটিই বরং দেখা যায়। যেই মানুষটির মধ্যে এই মিউট্যাশন ঘটেছিল তার সন্তানদের মধ্য দিয়েই কালক্রমে এটি ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছে, কিছু কিছু ইউরোপের বাইরেও গেছে। আজকের দুনিয়ার সব নীলচক্ষু মানুষের একজন সাধারণ পূর্বপুরুষ হলো ওই ব্যক্তিটি– যাঁর এই মিউট্যাশন হওয়া জিন বংশের নানা শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে এদের সবার কাছে এসেছে।

নীল চোখ হয়তো কারো কারো কাম্যও হতে পারে, কিন্তু ওই একই পদ্ধতিতে এক এক ভৌগলিক গোষ্ঠিতে এমন কিছু জিন মিউট্যাশন বিস্তার পেয়েছে যা কারোই কাম্য নয়। এরকম কোন কোন গোষ্ঠিতে কোন কোন বংশগত অসুখের প্রবণতা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো আশকেনাজি ইহুদী জাতিসত্ত্বার মধ্যে BRC1 এ এবং BRC2 এই দুটি জিনের তিনটি বিশেষ মিউট্যাশন অধিক পরিমাণে বিস্তৃত হওয়াতে তাদের মধ্যে স্তন-ক্যানসারের প্রবণতাটি কিছুটা বেশি দেখা যাওয়। তবে এভাবে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে কোন প্রবণতায় পার্থক্য দেখার ঘটনাগুলো শুধু জিনের কারণে হয়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ রোগ বা বিশেষ কোন প্রবণতা যদি

কোন গোষ্ঠির মধ্যে তুলনামূলক ভাবে বেশি বা কম দেখা যায়, এবং সেগুলোর ওপর জেনেটিক প্রভাব যদি কম শতাংশ হয়– তা হলে পরিবেশ, সুযোগ সুবিধা, জীবন-ভঙ্গি ইত্যাদিই কারণ হতে দেখা যায়, জিন নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন অতি সহজে কোন্‌টি কী তার ফয়সালা করে দিতে সক্ষম।

মানুষে মানুষে জিনের পার্থক্যের প্রসঙ্গে থাকতেই অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের জিনের পার্থক্য কী তা দেখা যাক। সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের প্রাণীর সঙ্গেও মানুষের এই পার্থক্য যে খুব বেশি তা বলা যাবেনা। জিন খুব রক্ষণশীল জিনিস। চারশত কোটি বছরের প্রাণের ইতিহাসে আদিতম জীব থেকে শুরু করে জীবের পর জীব বিবর্তিত হয়েছে বটে, কিন্তু জিনগুলো অনেকটা অক্ষুণ্ন রয়ে গেছে। এর প্রমাণ এখন আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি যখন মানুষের জিন উদ্ঘাটন করতে গিয়ে একেবারে সরল সব জীবেরও জিনগুলো ব্যবহার করছি। মানব জেনোমের মত শিম্পাঞ্জির জেনোম পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হবার পর দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে জিন-পার্থক্য মাত্র ১.২% অর্থাৎ মানুষে মানুষে পার্থক্যের চেয়ে দশ গুণের মত। মাত্র ১.২% পার্থক্য নিয়ে মানুষ ও শিম্পাঞ্জি এত ভিন্ন রকমের প্রাণী যে হয়েছে তা সেই জিনগুলোর প্রকাশের ক্ষেত্রে উভয়ের বড় তারতম্যের কারণে। উভয়ের মধ্যে এপিজেনেটিক পরিবর্তনের ধারা অনেকটা ভিন্ন রকমের, তাই জিন-প্রকাশ ভিন্ন এবং তাতে পরিবেশও অনেক ভিন্নভাবে কাজ করে উভয়ের ক্ষেত্রে। অন্যদিকে মানুষে মানুষে এই এপিজেনেটিক পার্থক্যও খুবই সীমিত রকমের।

আজকের প্রাণীদের মধ্যে জেনোমের বিশেষ বিশেষ অংশের মিল-অমিল লক্ষ্য করে বেশ নির্দিষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে তাদের কোন্‌টির পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা কত আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল অর্থাৎ ওদের আর আমাদের একই পূর্বপুরুষরা কত আগে বিচরণ করছিলো। এর মূলনীতিটি হলো ওই যে জিনগুলো অন্য প্রাণীর মধ্যেও আছে আমাদের মধ্যেও আছে, সেগুলো কিন্তু হুবহু একই ভাবে নেই, যার যার মত করে মিউট্যাশন হয়ে এখন মানুষ ও অন্য প্রাণীর মধ্যে তাতে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। এ পার্থক্য যে প্রাণীর সঙ্গে

আমাদের যত বেশি তার ধারার থেকে আমাদের ধারা তত আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কী হারে ওই জিনে মিউট্যাশন ঘটেছে সেটি নির্ণয়ের কিছু কায়দা আছে। ওই হারটি ব্যবহার করে বিচ্ছিন্ন হবার সময়টিও বের করে ফেলা যায়।

তবে সমস্যা হচ্ছে যৌন প্রজনন হয় এমন প্রাণীতে প্রতি প্রজন্মে সন্তানের মধ্যে বাবার আর মা'র জিন এমন ইতস্তত অনিশ্চিত ভাবে ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়ে মেশে যে এতে কালক্রমে মিউট্যাশন জমার পরিমাণ বোঝার উপায় থাকে না। ওই হার থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় বের করাতে জটিলতা দেখা দেয়। ক্রোমোজোমের ডিএনএ ছাড়াও কোষের মধ্যে মাইটোকোন্ড্রিয়া নামের অংশে অল্প কিছু ডিএনএ প্রায় কাজবিহীন ভাবে থাকে। সেটিকে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। এর সুবিধা হলো এটি প্রত্যেক সন্তান শুধু মায়ের থেকে পায়, বাবার মাইটোকেন্ড্রিয়া-ডিএনএ সন্তানের মধ্যে যেতে পারে না। কাজেই নানী থেকে মা, মা থেকে মেয়ে এই ধারা অনুসরণ করে বিশুদ্ধ মাতৃধারায় ওই মিউট্যাশন জমাটি অবিমিশ্র ও অভগ্ন থাকে এবং এর থেকে নির্বিঘ্নে সময়ের হিসেবটি করা যায়। এভাবে বর্তমান মানুষ আর বর্তমান শিম্পাঞ্জির মাইটোকোন্ড্রিয়া-ডিএনএ'র তুলনা করে আমরা জানতে পেরেছি যে যে শিম্পাঞ্জির পূর্বপুরুষ থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে। আর এর আগে শিম্পাঞ্জি ও মানুষ উভয়ের মিলিত ধারাটি গরিলা ধারা থেকে হয়েছে আজ থেকে ৭০ লক্ষ বছর আগে।

অন্য প্রাণীর সঙ্গে সাধারণ পূর্বপুরুষ কত আগে বাস করেছে সেটি যেই পদ্ধতিতে জানলাম প্রায় একই পদ্ধতিতে দুনিয়ার বর্তমান সব মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ কত আগে বাস করেছে তাও জানা গেছে। এও সেই মাইটোকোন্ড্রিয়া- ডিএনএ বিশ্লেষণ করে। এটি করা হয়ে দুনিয়ার আজকের নানা জায়গার নানা গোষ্ঠির মানুষ থেকে ওই ডিএনএ নিয়ে। এভাবেই আমরা জানতে পেরেছি মাতৃধারায় আমাদের সবার সরাসরি পূর্বসূরি আদি-নারীর কাল ছিল প্রায় দেড় লক্ষ বছর আগে। নানা জায়গার মানুষের তুলনামূলক মাইটোকোন্ড্রিয়া ডিএনএ ভিত্তিক এ পার্থক্য মেপে দেখা গেছে এই আদি-নারীর বাসস্থান ছিল আফ্রিকায়। এটি নির্দিষ্ট করে একজন সত্যিকার মানুষকে

আদি মাতা হিসেবে চিহ্নিত করার ব্যাপার অবশ্য নয়, বরং তার মত সম্ভাব্য মানুষটির স্থান ও কাল নির্ধারণ করা। মাতৃধারার জন্য মাইট্রোকোন্ড্রিয়া-ডিএনএ যেমন ব্যবহার করা যায়, পিতৃধারার জন্য সে রকম ব্যবহার করা যায় Y সেক্স ক্রোমোজোমের ডিএনএ'কে; কারণ এটি শুধু বাবা থেকে আসতে পারে– তাই দাদা থেকে বাবা, তার থেকে ছেলে এভাবে পিতৃধারায় অমিশ্রিত থাকে। ঠিক একই ভাবে একে ব্যবহার করে সব মানুষের হিসেব কষা সরাসরি পূর্বসূরি পুরুষকেও সেই দেড় লক্ষ বছর আগের আফ্রিকাতে নির্ণয় করা হয়েছে। মানুষে মানুষে যেটুকু জিন-পার্থক্য তা এই সময়টুকুর মধ্যেই তৈরি হয়েছে।

জেনেটিক পার্থক্যগুলো, তা সে এক প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রাণীরই হোক অথবা মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষেরই হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জনের মধ্যে এক এক রকম জিন মিউট্যাশন জমার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। বিবর্তনও ঘটে এই মিউট্যাশনগুলোর কোন কোনটির প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে। কাজেই এর সবই জিনের মধ্যেকার ব্যাপার। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা বলছেন এপিজেনেটিক পরিবর্তনগুলোর কিছু কিছু জিনের মত প্রজন্মান্তরে চলে যায়– বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে। এগুলোও পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রাকৃতিক ভাবে নির্বাচিত হতে পারে, অর্থাৎ সেভাবে বিবর্তনে অবদান রাখতে পারে– যদিও এই অবদান অপেক্ষাকৃত গৌণ, এবং এই তত্ত্বটি এখনো ব্যাপক ভাবে সমর্থিত নয়। অনেক বিজ্ঞানী মান করছেন দীর্ঘমেয়াদী বিবর্তনে জিনের কাজটি একচেটিয়া হলেও, অল্প সময়ের মধ্যে যে বিবর্তন দেখা দেয় তাতে এই এপিজেনেটিক পরিবর্তনের একটি ভূমিকা থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বয়স্কদের দুধ হজমে অপারগতার বিষয়টি আবার আনতে পারি। বয়স্ক হয়েও দুধ হজমের ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছিলো কৃষি শুরুর মাধ্যমে পশু পোষ মানাবার পর থেকে, ওভাবে পশুর দুধ পাওয়ার সুবিধা হয়ে যাওয়ার পর। সেটি ওরকম জিন-মিউট্যাশন থেকে স্বাভাবিক বিবর্তনেই ঘটেছে।

কিন্তু আরো পরে কোন কোন অঞ্চলে মানুষ পশু চারণের ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ওই দুধকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ ও নানা স্বাদের করার

স্বার্থে দই, পনির, ছানা ইত্যাদি তৈরি উদ্ভাবন করে। ওসব দুগ্ধজাত খাবারে ল্যাকটোজ থাকেনা বলে দুধ হজম করার মিউট্যাশনটি প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা ওই মানুষগুলোর মধ্যে ক্রমে কমে গেছে। দেখা গেছে এই যে ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্রকোপটি জেনেটিক নয় বরং এপিজেনেটিক পরিবর্তনে স্বল্পকালের মধ্যে ঘটেছে। যদিও সব জনগোষ্ঠিতে এটি আছে তবে মোট জনসংখ্যায় তাদের অনুপাতের দিক থেকে এটি সেই গোষ্ঠিগুলোতে সব চেয়ে বেশি যেখানে সরাসরি খাওয়া দুধের চেয়ে ওই ফারমেন্ট করা দই, পনির, ছানার চাহিদা বেশি ছিল। তাই মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এসব জায়গার বংশোদ্ভূতদের জনসংখ্যার ৭৫-৯০% মানুষ ল্যাকটোজ ইনটলারেন্সে ভোগে, অথচ উত্তর ও মধ্য ইউরোপীয় বংশোদ্ভূতদের মধ্যে এই হার ৫-১০% এর বেশি নয়। যার যার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অভ্যাস এপিজেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অল্প সময়ে এটি ঘটিয়েছে।

নিজের ব্যক্তিগত জেনোম জানার লাভ

প্রথম দিকে মানব জেনোম উদ্ঘাটন করা হয়েছিলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন বহু সংখ্যক মানুষ ব্যক্তিগত কৌতুহল ও প্রয়োজনের কারণে নিজ নিজ জেনোমকে পারদর্শী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিয়ে উদ্ঘাটন করিয়ে নিচ্ছেন। ভবিষ্যতে হয়তো এই চাহিদাটি সব মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হবে। এখন যাঁরা এটি করছেন তাঁদের মূল প্রেরণটি আসছে নানা অসুখ-বিসুখের কতখানি ঝুঁকি তাঁদের রয়েছে সেটি যথাসম্ভব নির্ণয় করা। যথেষ্ট আগে জানতে পারলে এগুলোর প্রকট প্রকাশের বিরুদ্ধে আগাম ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো নেয়া যাবে– এটিই আশা। তাছাড়া অসুখের জিন-চিকিৎসার সুযোগও এখন একটু একটু করে বাড়ছে। নিজের অন্যান্য দিক সম্পর্কে কৌতুহলও অবশ্য জেনোম জানার একটি বড় কারণ।

জেনোম উদ্ঘাটন যতই সহজ হয়েছে সবাইকে ব্যক্তিগত জেনোম জানার সুযোগ দেবার জন্য ততই নানা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। উন্নত দেশগুলোতে নিজের সামান্য রক্ত অথবা মুখের ভেতরে গালের ঝিল্লি থেকে

ঘষে নেয়া সামান্য নমুনা পাঠিয়ে দিলে সেখান থেকে ডিএনএ নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান অল্প দিনের মধ্যে যে কারো জেনোম-তথ্য জানিয়ে দিতে পারে। এটি বিভিন্ন পর্যায়ে করা যায়। যাঁরা সম্পূর্ণ ডিএনএ'র পুরাপুরি উদ্ঘাটন চান তাঁরা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ সে কাজটি করাতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে এবং কম ব্যয়ে শুধু কোডিং করা জিনগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারেন। আরো কম ব্যয়ে শুধু যেসব প্রাসঙ্গিক মিউট্যাশন থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে (যেমন যে ক'টা অসুখের সম্ভাবনা সন্দেহ করা হচ্ছে) শুধু সেগুলোরই পাঠোদ্ধার করা হয়। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাগুলোর কারণে আজকাল অনেক মানুষ নিজের জেনোমের খবর নিতে পারছেন। তবে ভবিষ্যতে একেবারে সম্পূর্ণ ডিএনএ'র পাঠোদ্ধার করার ব্যয় দ্রুত কমে আসবে বলে মনে হচ্ছে, এবং তখন সবাই নিজের জেনোমের সম্পূর্ণ চিত্র নিয়ে বিশাল সংখ্যক তথ্যকে ঘন-সংবদ্ধ কোন ব্যবস্থায় (অনেকটা আজকের স্মার্ট কার্ডের মত) নিজের কাছে রাখবেন ও নানা কাজে ব্যবহার করবেন বলে আশা করা যায়।

একটি জিন দিয়ে নির্ধারিত এবং অত্যন্ত বেশি বংশগত, এরকম কিছু অসুখের ঝুঁকি সম্পর্কে এখনই জেনোম থেকে ভাল ভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব– সিস্টিক ফাইব্রোসিস, হান্টিংটন অসুখ, সিক্‌ল্‌ সেল এনিমিয়া, হোমোফিলিয়া ইত্যাদি গুরুতর কিন্তু অপেক্ষাকৃত বিরল অসুখ এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সচরাচর যে সব অসুখ নিয়ে অধিকাংশ মানুষ চিন্তিত সেগুলো সাধারণত একাধিক জিনের সৃষ্ট, এবং শুধু অংশত বংশগত (বাকিটা পরিবেশ, অভ্যাস ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল), সে সব ক্ষেত্রে ঝুঁকি নির্ণয়টি খুব ভাল ভাবে করা যায়না। এর সবগুলোর ক্ষেত্রে দায়ী সব জিন-মিউট্যাশন এখনো আবিষ্কৃতও হয়নি। তবুও ঝুঁকি কমবেশি হবার যেটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাও বেশ উপকারে আসে। নানা রকম ক্যানসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, আলজাইমার সহ অনেকগুলো ব্যাপক ভাবে দেখা যাওয়া রোগের ক্ষেত্রে জেনেটিক ঝুঁকির খবর কিছুমাত্রও পেলে অন্যান্য ঝুঁকির সঙ্গে মিলিয়ে নিজের সম্ভাব্য অবস্থাটি অনুধাবন করা সম্ভব। শারীরিক অসুখ ছাড়াও বেশির ভাগ মানসিক অসুখের ক্ষেত্রেও একথা খাটে।

জেনোম থেকে ঝুঁকি নির্ণয়ের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করছে ওই অসুখটা বা ওই বৈশিষ্টটির বংশগতির অনুপাত কত তার থেকে– অর্থাৎ সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে এর শতকরা কত ভাগকে বংশগত বলা যায় তার থেকে। বংশগতির অনুপাত কীভাবে মাপা হয় তা আমরা আগে দেখেছি। বিভিন্ন অসুখের বংশগতির অনুপাত এমনি সব পরিমাপ থেকে জানা গেছে। যেই ডায়াবেটিস অল্প বয়স্কদের হয় সেই ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে বংশগতির অনুপাত খুব বেশি – ৮৮%। অন্যান্য ক্ষেত্রে স্খিজোফ্রেনিয়া মনোরোগে এটি ৮১%, আলজাইমারে ৭৯%, স্থূলতার প্রবণতায় ৭০%, চেষ্টা করেও ধূম পান না ছাড়তে পারার প্রবণতায় পুরুষের ক্ষেত্রে ৫৯% ও মহিলার ক্ষেত্রে ৪৬%, গেঁটে বাতে ৬০%, প্রোস্টেট ক্যানসারে ৪২%, তীব্র মাথা ধরা মাইগ্রিনে ৪৫%, হৃদরোগে পুরুষের ৩৮% ও মহিলার ৫৭%, বক্ষ ক্যানসারে ২৬%, এবং বেশি বয়সে সাধারণত দেখা দেয়া ডায়াবেটিস টাইপ টু'তে ২৬%। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ছোটবেলায় কারো জেনোমে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিসের জন্য দায়ী কোন জিন মিউট্যাশন পাওয়া গেলে রোগটির ঝুঁকি খুব বেশি বলে বিবেচনা করতে হবে। অন্যদিকে একই ভাবে টাইপ টু'র মিউট্যাশন পাওয়া গেলে সাধারণ যে কারো থেকে তার বাড়তি ঝুঁকি ১৫-২০% এর বেশি হবেনা। কাজেই সেক্ষেত্রে রোগের ঝুঁকির ভবিষ্যদ্বাণী করতে গেলে শুধু জেনোমের নয় অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতা ও জীবন-অভ্যাসগুলোরও খোঁজ নিতে হবে। অন্যান্য অসুখের ক্ষেত্রেও বংশগতির অনুপাত অনুযায়ী ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে জেনোমের ক্ষমতা কমবেশি হবে। তাছাড়া এ সম্পর্কে বর্তমানে জেনোম কতখানি বলতে পারছে তা নির্ভর করে অসুখটি কতগুলো জিন মিউট্যাশন ও তাদের প্রকাশের কত বেশি এপিজেনেটিক পরিবর্তনের মিলিত ফলশ্রুতি তার ওপর। এরকম জিন-সম্পর্কিত নিয়ামকের সংখ্যা যে অসুখে যত বেশি হবে জেনোমের ভবিষ্যদ্বাণী সেক্ষেত্রে তত দুর্বল হবে। ভবিষ্যতে এসব নিয়ামকের পারস্পরিক প্রক্রিয়া যত ভালভাবে উদ্ঘাটিত হবে আর বায়ো-ইনফরম্যাটেক্সের কম্পিউটার শক্তি যত বাড়বে এ বিষয়ে তত উন্নতি ঘটবে।

যত সীমিত আকারেই জেনোমের ভবিষ্যৎদ্বাণী আসুক না কেন এর অনেক উপকার এখনই হচ্ছে, সামনে আরো হতে পারে। ক্যানসার, হৃদরোগ ইত্যাদির প্রকোপ কমাবার জন্য সব মানুষের মধ্যে এগুলোর আগাম লক্ষণ জানাটি খুব প্রয়োজন। এমন লক্ষণ খোঁজার জন্য একটি বিশেষ বয়সের পর সব মানুষের নিয়মিত পরীক্ষা অবশ্যকরণীয়– যাকে স্ক্রীনিং করা বলা হয়। এটি বিশাল কর্মযজ্ঞ– বিশাল জনসংখ্যার সবার ক্ষেত্রে সমান খুঁটিনাটিতে করা খুবই দুরূহ। যদি বেশি ঝুঁকিসম্পন্ন মানুষদেরকে আগে থেকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে তাদেরকেই স্ক্রীনিং করার জন্য বিশেষ ভাবে সতর্ক করা যায়। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নেয়া যাক। দেখা গেছে ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মানুষের মধ্যে ৮% ক্ষেত্রে এমন একটি জিন-মিউট্যাশন থাকে যা তাদেরকে হঠাৎ রক্ত-নালীর নাজুক কোন স্থানে রক্ত জমাট বেঁধে গুরুতর অসুস্থ করে তুলতে পারে। এই গোষ্ঠির মানুষরা এজন্য কিছু সহজ সতর্কতা নিতে পারেন; জেনোম উদ্ঘাটনে মিউট্যাশনটি আছে জানলে অবশ্য-কর্তব্য হিসেবে তা করতে পারেন। সতর্কতার মধ্যে রয়েছে মহিলারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে খাওয়ার বড়ি ব্যবহার না করা, সবাই শরীরকে কখনো দীর্ঘ সময় ধরে একেবারে নিশ্চল না রাখা, ইত্যাদি– কারণ এগুলো ওই রক্ত জমাটের ঝুঁকি বাড়ায়। ইরাক যুদ্ধের সময় জনৈক ইউরোপীয় সাংবাদিক এই রোগে হঠাৎ করে মারা গেলেন। দেখা গেল তিনি মৃত্যুর আগে দিন-রাত বহু ঘন্টা সৈন্যদের ট্যাংকের ভেতর আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে কাটিয়েছেন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায়। জেনোম থেকে ঝুঁকির কথাটি জানা থাকলে তিনি কখনোই ট্যাংকের ভেতর ওভাবে কাটাতেন না।

অসুখ-বিসুখে ঝুঁকি জানার একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে নিজের মধ্যে এবং আপনজনের মধ্যে এর প্রতিরোধে ইচ্ছাশক্তি ও প্রেরণা জাগিয়ে তোলা। পরিবেশগত ও অভ্যাসগত অন্য যে সব কারণ ওই অসুখের জেনেটিক প্রবণতাকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে সেগুলোর প্রতি জীবনভর সতর্ক থাকতে এরকম প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ণ জেনোমের বিশ্লেষণ এখন যে কাউকে এমন সব অসুখের বা নেতিবাচক বৈশিষ্টের ঝুঁকির কথা জানিয়ে দিচ্ছে যা আগে কখনো তাঁর ভাবনায় আসেনি। তাছাড়া আরো একটি

ঝুঁকি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এরকম অনেক অসুখ বা বৈশিষ্ট জিনের গৌণ কপির কারণে ঘটে, মুখ্য কপির কারণে নয়। সেক্ষেত্রে এটি প্রকাশিত হতে বাবা ও মা উভয়ের কাছ থেকে ওই মিউট্যাশন হওয়া জিনের এক কপি করে পাওয়া দরকার। বাবা বা মা নিজের কাছে মিউট্যাশনটির এক কপি থাকাতে তাঁরা আক্রান্ত হননি, রোগের বাহক হিসেবে কাজ করেছেন। এভাবে জনসংখ্যায় অনেক বাহক আছেন যাঁরা জানেন না যে তাঁরা ওই রোগের জিন বহন করছেন। এরকম দু'জনের মধ্যে বিয়ে হলে সন্তানের রোগ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। নিজেদের জেনোম উদ্ঘাটন করা থাকলে সম্ভাব্য এরকম বাহক স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে বিয়ে না করে, অথবা করলেও নিজেদের জৈবিক সন্তান না নিয়ে, গুরুতর অসুস্থ সন্তান জন্ম দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং রোগটির বিস্তারও কমাতে পারেন।

রোগের সাবধানবাণী না হয় পাওয়া গেলো, রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জেনোমের জ্ঞান কী কাজে আসবে? আজ যে চিকিৎসা চালু আছে সেখানেই অনেক পরিবর্তন আনতে পারে এটি। আর জিন-চিকিৎসা যদি নিয়মিত ভিত্তিতে চালু হয় তখন তো এই জ্ঞান অপরিহার্য হবে। বর্তমানে সাধারণত কোন রোগের জন্য প্রায় সব রকম রোগীকে একই ধরনের চিকিৎসা ও একই ধরনের ওষুধ দিয়ে সারানোর চেষ্টা শুরু করা হয়। সেটি কাজ না করলে তা বদলিয়ে বদলিয়ে দেখা হয় কোন্‌টি ভাল কাজ করে। এতে রোগ সারতে দেরী হয়, অনেক কিছু অপচয় হয়। যদি যেই রোগীর জন্য ঠিক যে রকম চিকিৎসা দরকার তা ব্যক্তিভেদে আলাদা আলাদা ভাবে গোড়া থেকেই দেয়া যেতো তা হলে এমনটি হতো না। দেখা গেছে যে জিন মিউট্যাশনের সূক্ষ্মতর পর্যায়ে বিভিন্ন জিনের সম্মিলিত কাজে যে ভাবে অসুখটি সৃষ্টি ও অগ্রসর হয় তাতে এক রোগীর সঙ্গে অন্য রোগীর তফাত থাকে। একই রকম চিকিৎসা বা একই ওষুধ যে সবার ক্ষেত্রে সমান কাজ করেনা এটিই তার একটি বড় কারণ। তাই ব্যক্তিগত জেনোমের জ্ঞান থেকে ওই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো জেনে নিয়ে ব্যক্তিভেদে কিছুটা ভিন্ন চিকিৎসা ও ভিন্ন ওষুধের ব্যবস্থা করলে সেগুলো বেশি ফলপ্রসু হবে। এরকম ব্যক্তিভেদে চিকিৎসা ইতোমধ্যেই চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের আভাস দিচ্ছে। এখন ওষুধ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন

জেনোম-প্রকৃতির রোগীর জন্য ভিন্ন ওষুধ পাওয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, এমনকি জেনোম অনুযায়ী ব্যক্তিভেদে এক একটি ওষুধের ভোজও ভিন্ন করা হচ্ছে।

ব্যক্তিভেদে চিকিৎসা সব চেয়ে বেশি চালু হয়েছে ক্যানসার-চিকিৎসায়। যেমন ফুসফুসের ক্যানসারের ক্ষেত্রে দেখা যার একটি বিশেষ ধরনের টিউমারের জন্য তাতে এমন কিছু মার্কার জিন যা প্রোটিন পাওয়া যায় যার উপস্থিতি থাকলে সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত ওষুধে টিউমারের বৃদ্ধি থামেনা। কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির আরেকটি ওষুধে টিউমার দিব্যি হ্রাস পায়। এখন বিভিন্ন রকম টিউমারের জন্য ক্যানসার কোষকে টার্গেট করার বিভিন্ন রকম ওষুধ উদ্ভাবিত হচ্ছে; জেনোমে মার্কার দেখে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কোনটি ব্যবহার করা উচিত। এদিক থেকে ক্যানসারের পরেই এগিয়ে আছে কোন কোন হৃদরোগ, রিউমেটোয়েড আরথ্রাইটিস, এবং মালটিপল স্কেলোরোসিস। এগুলোর চিকিৎসায় রোগীর সম্পর্কে জেনোম-জ্ঞান বেশ কাজে আসছে। শিগ্গির অন্যান্য অনেক অসুখে রোগীর জেনোম-প্রোফাইল চিকিৎসককে রোগ সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করে ব্যক্তিভেদে ভিন্ন চিকিৎসা দিতে সাহায্য করবে। হয়তো তিনি নিয়মিত ভিত্তিতে রোগীর জেনোম স্মার্ট কার্ড চাইবেন তাঁর কম্পিউটারে সেটি ঢুকিয়ে তারপর রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করবেন।

জিন-চিকিৎসা অবশ্য আরো বড় ব্যাপার– এটি নিয়মিত ভিত্তিতে চালু হতে আরো সময় লাগবে, যদিও কিছু কিছু এক জিনের মিউট্যাশনে সৃষ্ট অসুখের ক্ষেত্রে এটি সফল হয়েছে, পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু কিছু ক্যানসারের চিকিৎসাতেও। এতে মিউট্যাশনযুক্ত জিনকে সুস্থ মানুষ থেকে নিয়ে স্বাভাবিক জিন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। আধুনিক জিন কারিগরিতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীতে একের নির্দিষ্ট জিন তার ডিএনএ থেকে এক রকম এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে বাহক হিসেবে একটি ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের জেনোমের সঠিক জায়গায় জুড়ে দেয়া যাচ্ছে অন্য রকম এনজাইমের সাহায্যে। ওই বাহক এই কাম্য জিনটিকে রোগীর শরীরে নিয়ে গিয়ে কোষে তা প্রতিস্থাপিত করতে পারে। তাছাড়া সরাসরি কোষেও তা মাইক্রো-

ইনজেকশনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেয়া যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত ও নিরাপদ করতে এটি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে।

অসুখের কথাগুলো অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলার কারণ গবেষণার অগ্রধিকার এখানে থাকায় সাফল্যগুলোও এখানেই বেশি এসেছে। কিন্তু ঠিক একই ভাবে ব্যক্তিগত জেনোমের তথ্য থেকে ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করা, এমনকি পরিবর্তন করাও সম্ভব– অন্তত তাত্ত্বিক ভাবে সে সম্ভাবনা বাদ দেয়া যায়না। এসব বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে বাড়তি সীমাবদ্ধতা হলো এগুলোর কোনটারই বংশগতির অনুপাত খুব বেশি নয়– সবই প্রায় ৫০% এর কোঠায়। অর্থাৎ এগুলো সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে দেখলে অর্ধেকের বেশি বংশগত নয়, বাকি অংশ জটিল এপিজেনেটিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি যাতে বিশেষ পরিবেশের প্রভাব থাকে। কাজেই কিছু কিছু পরিচিত অসুখের হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে যতটুকু আগাম বলা যায়, এসব ক্ষেত্রে বলা যায় তার চেয়েও কম। কিন্তু তারপরও বিশেষ করে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব-বৈকল্য, বা শিশুর শিক্ষণ-দুর্বলতা বা স্মৃতি-দুর্বলতা ইত্যাদি সমস্যার কোন জেনেটিক উৎস থাকলে তা জানার ক্ষেত্রে জেনোমের তথ্য যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। এগুলো জানলে এ নিয়ে সতর্ক হওয়া যায়, উপযুক্ত প্রতিবিধান গ্রহণের প্রেরণা পাওয়া যায়। তবে প্রতিবিধানের মাধ্যমে উন্নয়নের চেষ্টা না করে এই তথ্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বৈষম্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। এই ব্যাপারে সতর্কতা খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি জেনেটিক তথ্য বাস্তবের কিছুটা সম্ভাবনা মাত্র বলতে পারে, এটি বাস্তবতার কোন নিশ্চয়তা নয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলো মানসিক বিষয় হলেও শারীরিক এবং শরীর ও মনের সম্মিলিত কিছু কিছু বিষয় কোন্ দিকে অগ্রসর হবে তার বেশ ভাল আন্দাজ জেনোম থেকে পাওয়া সম্ভব। এর মধ্যে শারীরিক শক্তি, পেশি সমূহের শক্ত গড়ন, চেহারার নানা উপাদান, মদ বা ড্রাগে আসক্তি, ইত্যাদি অন্যতম। এসবের জেনেটিক ঝোঁকগুলো জানতে পারলে কোন ব্যক্তি তার চর্চা ও জীবন-অভ্যাসগুলো বদলিয়ে এগুলোকে কাম্য দিকে নেয়ার চেষ্টা করতে পারে। এই সবকিছুতে এমন সব উপাদান আছে নিজের সম্বন্ধে তা জানার

জন্য মানুষের দারুণ কৌতুহল থাকে। জেনোম উদ্ঘাটন সে কৌতুহল অনেকটা মেটাতে পারে।

ব্যক্তিগত জেনোম তথ্য থেকে অসুখ-বিসুখের জেনেটিক উৎস চিহ্নিত করতে পারলে সেই জিনে পরিবর্তন এনে জিন-চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। একই ভাবে মনের মত ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, এমন কি শারীরিক গঠন বা চেহারা নেই এমন কথা ভাবলে এবং তার জেনেটিক কারণ জানতে পারলে সেই জিনে পরিবর্তন এনে এসবের উন্নয়ন কি সম্ভব? তত্ত্বগতভাবে সম্ভব না হওয়ার কোন কারণ নেই। ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম পরিবর্তন অনেকটা সম্ভব হয়েছে– স্মৃতি, শেখার সক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বৃদ্ধি ইত্যাদি সবগুলো দিকে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নে দুরকমের বড় সমস্যা রয়েছে আজকের পরিপ্রেক্ষিতে। এর একটি হলো প্রযুক্তিগত সমস্যা। মানুষের জিনের প্রতিস্থাপন এখনো একটি দুরূহ কাজ যাতে দৈবাৎ জেনোমের অন্যত্র ক্ষতিকর প্রভাবের ঝুঁকি থাকে। খুব গুরুতর অসুখের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এই ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য হলেও বুদ্ধিমত্তার বা ব্যক্তিত্বে কিছুটা উন্নতির আশায় এই ঝুঁকি এখনো গ্রহণযোগ্য নয়। আর অন্য রকম সমস্যা হলো নৈতিকতার দিক থেকে। বিশেষ করে নেহাত প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার জন্য এভাবে জিনে হস্তক্ষেপ করে শারীরিক-মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকে সাধারণত নৈতিক বলে মনে করা হয়না। এ সবের অপব্যবহার নানা জনের হাতে আরো বড় নৈতিকতার সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তবে সব সময় আমরা দেখেছি প্রযুক্তি, ঝুঁকি, নৈতিকতা-বোধ এর সবই পরিবর্তনশীল। ভবিষ্যতে এর কোনটিই বর্তমানের অবস্থায় থাকবে একথা বলা যায়না। তখন হয়তো নিজের জেনেটিক সম্ভারের উন্নয়ন ঘটাবার জন্য জিনের ওপর হস্তক্ষেপ কোন ব্যতিক্রমী ব্যাপার থাকবেনা, বরং নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপারে পরিণত হবে। কিন্তু নিজের জেনোম সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখার আরো অনেক জরুরী কারণ এ মুহূর্তেই রয়েছে।

একটি কারণ অবশ্য শুধু নিজের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কৌতুহল নিবৃত্তি করা– বৈজ্ঞানিকভাবে বংশ-লতিকার সন্ধান করা। সাধারণ মানুষ আত্মীয়স্বজনের কাছে শুনে, অতীত আত্মীয়দের লিখে যাওয়া বিবরণ পড়ে নিজের বংশ-

লতিকার কিছু সন্ধান পেয়ে থাকে। এদিক থেকে প্রাচীন চার্চের মত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কারণে অনেকে বহু পুরুষ পর্যন্ত তাঁদের বংশ-পরিচিতি পেতে পারেন। যেমন ইংল্যান্ডে এবং আরো অনেক ইউরোপীয় দেশে কিছুকাল আগে পর্যন্তও নবজাতকের ব্যাপটিজমের সময় তার বাবা-মার পরিচিতি ইত্যাদি দিয়ে তার নাম স্থানীয় খৃষ্টান চার্চের মোটা খাতায় লিখে রাখা হতো। মানুষ নিজেদের গ্রাম, শহর, বা চার্চ খুব একটা বদলাতোনা বলে ওখানেই মিলতো শত শত বছর ধরে যে কোন মানুষের বংশ পরিচয়। আজকাল এসব সুযোগ অনেক কমে গেছে। তবে তার বদলে এসেছে বংশ-লতিকা পাওয়ার অন্যান্য সব উপায়– যার মধ্যে জেনোম বিশ্লেষণ একটি।

এখন এ কাজে বিশেষজ্ঞ অনেক কোম্পানী গড়ে ওঠেছে যাদের কাছে নিজের শরীরের কিছু কোষ-নমুনা পাঠিয়ে দিলে (যেমন গালের ভেতরের ঝিল্লি থেকে ঘষে নিয়ে) সামান্য অর্থের বিনিময়ে এক ধরনের বংশ-পরিচিতি পাওয়া যায়– যদিও সেটি খুব মোটা দাগের। এ জন্য কোম্পানীকে সেই গ্রাহক ব্যক্তির পুরো জেনোম উদ্ঘাটন করতে হয়না। সাধারণত যেটি করা হয় তা হলো ডিএনএ'র বিশেষ বিশেষ স্থানে বিভিন্ন ভৌগলিক গোষ্ঠির জন্য জানা জিন-মার্কারগুলো কতখানি আছে দেখে ওসব গোষ্ঠির কোনটির ধারা ওই ব্যক্তির বংশে আছে কিনা তা দেখা। এভাবে একাধিক ধারা থাকলে তারও কোন্টি কত শতাংশ আছে তা বলা সম্ভব। যেমন আজকে বাংলাদেশী হলেও তার মধ্যে উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয়, মধ্যপ্র্যাচ্যীয় বা অন্য কোন সাম্প্রতিক বা আদিবাসী বংশধারার কোনটি আছে কিনা তা বোঝা যায়। অবশ্য আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে সেই মাইটোকোন্ড্রিয়া-ডিএনএ থেকে মাতৃধারায়, Y ক্রোমোজোম থেকে পিতৃধারায়, বা সাধারণ ক্রোমোজোম থেকে উভয় ধারায় আরো সুনির্দিষ্ট তথ্য লাভ সম্ভব।

এই বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে একটি কাজ খুব চমৎকার ভাবে করা যাচ্ছে। দু'জন মানুষের জেনোম তথ্য জানা থাকলে তাদের জেনোমে বিশেষ কিছু কিছু মিউট্যাশনের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে বলে দেয়া যায় তারা পরস্পরের কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়– যদিও তারা পরস্পরকে চেনেনা, এমনকি কালের ব্যবধানেও বেশ বিচ্ছিন্ন। রাশিয়ান বিপ্লবের সময় সপরিবারে নিহত

জার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে অচিহ্নিত গণকবরে পাওয়া হাড়ের ডিএনএ নিয়ে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে মৃত্যুর প্রায় ৭০ বছর পর। এটি পাওয়া গেছে ইংল্যান্ডের ও ডেনমার্কের রাজপরিবারের কয়েকজন জীবিত সদস্যের সঙ্গে প্রাপ্ত হাড়ের মাইটোকোন্ড্রিয়া-ডিএনএ'র মিউট্যাশন-সাদৃশ্য থেকে এবং মাতৃধারায় জার ও জার-পত্নীর সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকায়। আরেকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ নেয়া যাক্ । ১৯৯১ সালে ইতালী ও অষ্ট্রিয়ার সীমান্ত অঞ্চলের আল্পস পর্বতের ঢালে বরফের নীচে প্রায় অবিকৃত একজন প্রাচীন মানুষের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রায় ৫ হাজার বছর আগের এই মানুষটির পোষাক, সঙ্গে থাকা তীর-ধনুক, খড়ের স্যান্ডেল এসবও অবিকৃত পাওয়া গেছে। তাঁর নাম দেয়া হয় ওৎসী। তাঁর ডিএনএ বিশ্লেষণ করা হয়েছে ২০১২ সালে। তার থেকে দেখা গেছে মানুষটি দক্ষিণ-ইউরোপীয় নৃ-গোষ্ঠির অন্তর্গত। আর ওই সীমান্ত এলাকার আজকের ৩৭০০ জন পুরুষ মানুষের জেনোম তথ্য উদ্ঘাটন করে জানা গেছে তাঁদের মধ্যে ১৯ জন পুরুষ ৫ হাজার বছর আগের মানুষ ওই ওৎসীর সাক্ষাৎ বংশধর।

আমি কে?

আমাদের এই বইটির একেবারে শেষ ভাগে এসে আমরা সেই মূল প্রশ্নটির দিকে আবার ফিরে তাকাতে পারি– আমি কে? বইটির মূল সুর থেকেই এ প্রশ্নের এক রকমের উত্তর আমরা হয়তো পেয়ে গেছি। তাই বলে কেউ যদি তড়িঘড়ি করে বলেন যে আমার জেনোমই আমি, তবে সে উত্তর ভুল হবে। কারণ এখানেই আমরা বিস্তারিত ভাবে জেনেছি শুধু কারো জিন-সম্ভার তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেনা। সে সব জিনের সত্যিকার প্রকাশ এক একজন ব্যক্তির মধ্যে ঘটে জিন-প্রকাশের জটিল প্রক্রিয়ায়– যার মধ্যে তার মাতৃগর্ভে থাকাকালীন ও শৈশবের পরিবেশ-পরিস্থিতিও বেশ কিছু ভূমিকা পালন করে। এমনকি তারও পরের কিছু কিছু পরিস্থিতি এবং তার কালচারের ছাপও আত্ম-পরিচয়ের ওপর পড়ে; যদিও সবই তার সেই জিন-প্রকাশের গোলক ধাঁধাঁর মধ্য দিয়ে। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের জিনই তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছে সেই কগ্নিশনের সক্ষমতা– অর্থাৎ অন্যের মন বোঝা সহ পরিস্থিতি

বিশ্লেষণের ক্ষমতা। তাই তার জিন-নির্ধারিত আচরণগুলো কগ্‌নিশনের বিবেচনায় কিছুটা পরিশীলিত হয়েই দেখা দেয়– ওটি মানুষের একটি অনন্যতা।

হ্যাঁ, পরিবেশের সঙ্গে বিক্রিয়ায় জিনের প্রকাশ-তারতম্য ঘটে, কগ্‌নিশনের মাধ্যমে বাস্তবক্ষেত্রে তার ফলাফলকে পরিশীলিত করা যায়, কালচারের আবরণে সেই ফলাফলকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেয়া যায়– কিন্তু কোথাও জিনকে অগ্রাহ্য করা যায়না। আমার পরিচয়ের যতগুলো মাত্রা আছে তার কোনটিই আমার ব্যক্তিগত জেনোমের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ভাবে নেই। যাকে আমরা কালচার বলছি, ঐতিহ্য বলছি, মূল্যবোধ বলছি তার সবই স্থান ও কালের বিভিন্নতা মেনে পরিবেশের সঙ্গে জিনের সম্মিলিত ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় সৃষ্ট। জিন সহজে পরিবর্তিত হয়না তাই তার অতীত খুবই সুগভীর অতীত– আমাদের মানুষ-পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে আরো আগের পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রোথিত তার শেকড়। ওতে যেটুকু পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ লক্ষ বছরে অল্প অল্প করে এসেছে, অন্তত বহু হাজার বছরে। কিন্তু কালচার, মূল্যবোধ ইত্যাদি দ্রুত বদলিয়েছে। তার মধ্যেও যে কিছু জিনিস অক্ষয় হয়ে রয়েছে তা অক্ষয় জিনের বদৌলতে। চিরকালই আমাদের পূর্বপুরুষরা ভরা বই ছিল– ওই জিনের লেখা দিয়ে ভরা; আমরাও তাই। আমাদের সম্মিলিত জিন কালচারকে লিখেছে এক একটি বিশেষ স্থান-কালে, কালচার সাদা খাতার মত পেয়ে আমাদের ওপর লেখেনি।

বিবর্তনের রচিত এ ভরা বইয়ের গুরুত্ব এখন আরো অনেক ভাল বুঝতে পারছি যেহেতু বইটির পাঠোদ্ধার আমরা প্রায় করে ফেলেছি। এর পাঠ থেকে যা বোঝা যাচ্ছে তার কোন কোন দিকের উপলব্ধি নিজেকে নতুন ভাবে চিনতে সহায়ক হচ্ছে। যেমন জন্মের কালে আমরা যে অসহায় সম্বলহীন ভাবে এসে হাজির হইনি, বরং কোটি কোটি বছরের তিলে তিলে সৃষ্ট অক্ষয় সম্ভার নিয়ে এসেছি– এই উপলব্ধিটিও একটি বিশাল ব্যাপার। আমি স্বল্পদিন স্থায়ী বিচ্ছিন্ন কেউ নই, বরং একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতার অংশ। যে উপলব্ধি থেকে জীবনানন্দ দাশ বলতে পেরেছিলেন– 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, সেখানে ছিলেম আমি', সে রকম উপলব্ধি নিয়েই আমি আরো সুদূর

অতীতে হোমো ইরেকটাস মানুষের দাবানল থেকে সংগ্রহ করা আগুনকে জিইয়ে রাখা আর ব্যবহার করার দৃশ্যকল্পের কথায় বলতে পারি– সেখানেও ছিলেম আমি। ওই আগুন জ্বালাবার কৌশলের জিনটি তো এখন আমারও দেহকোষে। এই রকম অতীতের গর্ভ থেকে আসা জিনগুলোই আমার আত্ম-পরিচয়ের ভিত্তিমূল। আমার ব্যক্তিগত জেনোমে আমার জন্য স্বকীয় ভাবে এটি আছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে পূর্বপুরুষের মধ্যে একটু একটু মিউট্যাশন হতে হতে আমার মধ্যে যা এসে দাঁড়িয়েছে। এরা নিশ্চিত ভাবে আমাকে গড়েছে, অবশ্য তার ফলশ্রুতি একেবারেই আমাঘভাবে আমার জন্য নির্ধারিত কিছু ছিলনা– তার বিকাশে মাতৃগর্ভের আমি, এবং শৈশবের আমি যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে তার ছাপও যথেষ্ট। কিছুটা বড় হয়ে আমার কগ্নিশন ক্ষমতা ব্যবহার করে চর্চা ও জীবন-অভাসগুলো যেমন গড়েছি জিনের চূড়ান্ত রূপায়নে তারও অবদান আছে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ওই সময়ে মায়ের ন্যূনতম স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দ জীবন, এবং এর পরের লালন পালনে ন্যূনতম পরিবেশ আমাকে আমি করে তুলতে কতটা জরুরী ছিল। সারা দুনিয়ার মানুষের তাই বড় কর্তব্য হওয়া উচিত সব মায়ের এবং সব শিশুর জন্য সেই ন্যূনতম পরিবেশের ঘাটতি যেন না হয় সেই দিকটি নিশ্চিত করা।

নিজের জেনোমের কিছুটা স্বকীয়তা সত্ত্বেও এও আমরা দেখেছি যে মানুষে মানুষে জেনেটিক পার্থক্য অত্যন্ত কম। এর কারণ জিন সহজে বদলায়না আর আজকের সব মানুষের সাধারণ পূর্বপুরুষ অপেক্ষাকৃত খুবই সাম্প্রতিক কালে বাস করেছে। এখন বোঝা যাচ্ছে মানুষের গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে আমরা বিভাজনের যে সব দেয়াল অতীত থেকে তুলে এসেছি তার পেছনে মৌলিক কোন প্রভেদের সমর্থন নেই– নেহাত গায়ের রঙ, শারীরিক গঠন, এবং কিছু কিছু অন্যান্য বৈশিষ্টের পার্থক্যকে এক্ষেত্রে আরো গুরুতর পার্থক্য হিসেবে ধরে নিয়ে মানুষকে নানা খোপে রাখার চেষ্টা হয়েছে। শুধু তাই নয় ওই অজুহাতে বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠি ইত্যাদি বিভাজন সৃষ্টি করে তার ভিত্তিতে মনগড়া বড়ত্ব, ছোটত্ব আরোপ করে ভয়াবহ বৈষম্য ও অবিচারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মানুষে মানুষের পার্থক্যের যে মৌলিক জেনেটিক ভিত্তি তা সব মানুষে একই রকম, মোটেই গোষ্ঠিনির্ভর নয়। গোষ্ঠি-পার্থক্যের এই অভাব

মানুষের মৌলিক বৈশিষ্টগুলোর ওপর ঠিকই প্রতিফলিত হয়– তাদের চিন্তা, আনন্দ-বেদনা সহ সকল আবেগ, স্পৃহা, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি সব কিছুতে। মানুষের একের জন্য যা সত্য যা ভাল, অন্যের জন্যও তাই সত্য তাই ভাল। হ্যাঁ জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে এবং কালচারের প্রকাশে নানা গোষ্ঠিতে বহু পার্থক্য থাকতে পারে– কিন্তু তা সেই অর্থে মৌলিক কিছু নয়।

যে বিবর্তনে আমাদের সবার সাধারণ পূর্বপুরুষদের জেনোম গড়েছিলো তার মূল লক্ষ্য ছিল পারিবেশিক সংকটের মধ্যে বাঁচা এবং বংশ বৃদ্ধি। তবে মানুষ শেষ পর্যন্ত শুধু বাঁচাকেই লক্ষ্য করেনি, করেছে বাঁচার মত বাঁচাকে– যেটি কালচারের একটি সংজ্ঞা। আমরা দেখেছি কী ভাবে সেটিই ছিল তার বিবর্তনের বিলম্বিত রাগ। আরো দেখেছি এই কালচারের একটি বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত– তাই তার উপস্থিতি খুব সর্বজনীন। সেজন্য দুনিয়ার সবাই যার যার মত করে নান্দনিকতা, সঙ্গীত, গল্প, হাস্যরস, খেলাধূলা ইত্যাদিকে জীবনের অংশ করে নিয়ে থাকে। সবার সেই জিন, সেই জিন-প্রকাশ যে মস্তিষ্ক সৃষ্টি করেছে তা এ সবে পুলকিত হয় এবং সাড়া দেয় বলেই এমনটি হয়েছে। কিন্তু কালচারের অন্য অংশটি স্থানে ও কালে ক্রমেই পরিবর্তিত হয়েছে– সাময়িক ও স্থানীয় নানা পরিবেশে নানা কার্য-কারণে এগুলো নানা রূপ নিয়েছে। এই নানা রূপের সুযোগ নিয়েই মানুষে মানুষে যে দেয়াল তোলার চেষ্টা হয়, সেটি নায্য ব্যাপার নয়। বাঁচার মত বাঁচতে গিয়ে কালচারের নিজ নিজ রূপে যা যখন গ্রহণযোগ্য তার সংরক্ষণ চেষ্টা প্রশংসনীয়। কারণ এই রূপগুলোর সামষ্টিকতা নিয়েই তো বিশ্ব মানবের বাঁচার মত বাঁচা। এগুলোকে হারিয়ে যেতে দিলে সেই সামষ্টিকতায় দৈন্য দেখা দেবে। এর মধ্যে ভাষা, উপভাষা, লোকজ ও ধ্রুপদী সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ইত্যাদি অনেক কিছুই পড়ে। কিন্তু এই রূপগুলোকে অমোঘ ও চিরন্তন মনে করে কালচারভুক্ত সবার ওপর এ নিয়ে জবরদস্তি করাটি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় নয়। আত্ম-পরিচয়ের জন্য সেটি মৌলিক নয়, জরুরিও নয়।

স্বাভাবিক ভাবেই এক একটি কালচারে সব কিছু টেকসই হয়না, অনেক কিছুর হওয়া উচিতও নয়। উদাহরণ হিসেবে এর অসংখ্য দিক থেকে শুধু

ব্যক্তিগত অঙ্গ-সজ্জার মত একটি প্রান্তিক দিক বেছে নিয়েই দেখাতে পারি তা গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠিতে কেমন হতে পারে। শৈশব থেকে মেয়েদের পা বেঁধে দিয়ে পা'কে ক্ষীণ করে রাখাটি দীর্ঘকাল চীনা কালচারের অংশ ছিল– এতে যতই যন্ত্রণা হোক, আর নারীরা যতই পঙ্গুত্ব বরণ করুক না কেন। ব্যাপক বিপ্লবই চীনের কালচার থেকে একে বিতাড়িত করতে পেরেছিলো। এখনো দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠিতে প্রকটভাবে গালে, নাকে বড় বড় গর্ত করে, ছিদ্র করে, নীচের ওষ্ঠকে ফ্রেইমে আটকিয়ে বিরাট থালার মত আকৃতি দিয়ে রাখাকে কালচারের অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। ভিনদেশী অনেক কালচার-সংরক্ষণবাদীরা এসব বিচিত্র অভ্যাস টিকিয়ে রাখার জন্য আন্দোলনও করেন। কিন্তু এই আদিবাসী মানুষরাই অনেকে নিজের কালচার থেকে এটি বাদ দিয়েছেন, অন্যরাও হয়তো শিগ্‌গির দেবেন। বাদ দিতে পারবেন কারণ এগুলো ওদের জিনের মধ্যে নেই, ওখানকার মানুষরা এক সময় নিজেদের মধ্যে তৈরি করে নিয়েছিলো মাত্র। এগুলো খুবই দৃশ্যমান নাটকীয় ব্যাপার বটে, কিন্তু তেমন দৃশ্যমান না হয়েও নানা কালচারে অনেক বর্জনীয় জিনিস ঢুকে যায়, অনেকদিন টিকেও থাকে, তবে চিরকাল নয়।

'আমি কে' এই প্রশ্নের প্রাথমিক এবং টেকসই উত্তরটি আসে আমার জেনোমের দিক থেকে– তার সকল সবলতা দুর্বলতা নিয়ে। তারপর যে কালচারে আমি জন্মেছি, তার যে অংশকে আমি ভালবেসেছি, যা আমার মস্তিষ্কে সাড়া জাগায় সেটিও আমার আত্ম-পারিচয়ের একটি অংশ। তবে তা জেনোমের মত টেকসই নয়, যদি তা কোনদিন সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়, তখন তাকে আমি আর আমার মধ্যে অনুভব করবোনা। আমার কালচার বা অন্য কোন কিছু আমাকে কখনো এমন সাদা খাতা হিসেবে পায়নি যে তার ইচ্ছেমত ওখানে স্থায়ীভাবে কিছু লিখে দেবে– কারণ আমি এদিক থেকে সব সময়ই আমার জেনোমের লেখায় ভরা বইই ছিলাম। কালচার আমি জন্মের পর তখনকার পারিপার্শ্বিকতা থেকে আহরণ করেছি বটে, কিন্তু আরো পরে আরো অনেক কিছু থেকে আহরণ করে গেছি।

আমরা দেখেছি সব মানুষের প্রায়-অভিন্ন জেনোমে স্বজনপ্রীতি, সংঘাত ইত্যাদির প্রবণতা যেমন আছে তেমনি পরোপকারের প্রেরণাও আছে। আমাদের অতীত ইতিহাসে এর সবই প্রচুর প্রতিফলিত হয়েছে। তবে মানুষের অনন্য কগ্‌নিশন ক্ষমতা তাকে প্রায়শ শান্তি এবং সব মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আশা করতে পারি এটি ভবিষ্যতে এতই ব্যাপক ও তীব্র প্রেরণা হবে যে অবশেষে স্থায়ী শান্তি, সম্পূর্ণ বৈষম্যহীন বিশ্ব মানবতা, এবং সর্বব্যপ্ত মানব কল্যাণে সবাই একমত হয়ে হাত লাগাতে পারবো; প্রত্যেকের জেনোমের এই অংশ এতে স্পষ্ট অবদান রাখবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের জেনোম তাকে আরো একটি বৃহত্তর ঐক্যের দিকে উদ্বুদ্ধ সব সময় করে এসেছে– সেটি হলো সকল জীবের ঐক্য। আজকের সব জীবের জিন পরিবর্তিত অবস্থায় হলেও একই সুদূর পূর্বসূরিদের থেকে আসার ফলে আমাদের মধ্যে এই ঐক্যের অনুভূতিটি স্বাভাবিক। প্রকৃতিতে বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি তাই আমাদের মস্তিষ্কে উপভোগ্য সাড়া জাগায়– এই সাড়া ঐতিহাসিক। 'সর্বজীবে দয়ার' কথা যে মনিষীরা প্রাচীন কাল থেকে বলে গেছেন তাঁরা হয়তো এক ভাবে এই ঐক্যটি তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। আজ আধুনিক বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাবে দেখিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা মানুষ হিসেবে নিজকে যত অনন্য বলে মনে করতাম, এতটা অনন্য আমরা নই। বিজ্ঞান আমাদের নিজেদেরকে এখন এই বিশাল জীব জগতের একজন সদস্য হিসেবে চিনতে শিখিয়েছে। কগ্‌নিশন বা মননশীলতায় যে অনন্যতাটি আমাদের আছে সেটি বরং জীব-কল্যাণে ও জীব-বৈচিত্র রক্ষায় অভিভাবকত্বের দায়িত্বটি আমাদের ওপর অর্পণ করেছে। আর সে দায়িত্ব পালনের পূর্বশর্ত হলো আমার নিজের আত্ম-পরিচয়েও সেই বৃহত্তর সদস্যপদটির কথা স্মরণে রাখা।

আমাদের সৌভাগ্য যে 'আমি কে' এই প্রশ্নের আধুনিক বৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়ার চেষ্টা আমাদের প্রত্যেককে ক্রমাগত বড় করেছে, বিস্তৃত করেছে, একীভূত করেছে; ছোট করেনি, সংকুচিত করেনি, বিভাজিত করেনি।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সি এম ই এস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অফ লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান।